বেগম বাহার লেন

বারীন্দ্রনাথ দাশ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা বারো ॥

প্রথম মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৬২

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা :—
খালেদ চৌধুরী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—ওরিয়েন্ট বাইণ্ডার্স

সাড়ে তিন টাকা

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

কর্ণফুলি

রঙের বিবি

অনুরঞ্জিতা

পূর্বরাগের ইতিহাস (যন্ত্রস্থ)

এই উপন্যাসের চরিত্র, ঘটনা, প্রভৃতি নিতান্তই কাল্পনিক। কোথাও কোনো সাদৃশ্য সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত।

The characters, events, etc in this book are entirely fictitious. Any resemblance is purely accidental and unintended.

কলকাতা শহরের অসংখ্য অলি গলি লেন বাই-লেন'এর মধ্যে একটি—বেগম বাহার লেন।

সেখানে যা'রা থাকে তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহ এদেশের সামাজিক ইতিহাসের বড়ো রাস্তা এড়িয়ে আঁকা বাঁকা লেন ঘুরে অসবর্ণতার বাই-লেনের মধ্যে প্রায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

অরুণ কি করে সে পাড়ার খোঁজ পেলো সে এক বিচিত্র কাহিনী।

বলতে হলে অনেক পুরোনো কালের কথা পেড়ে সুরু করতে হয়।

জব চার্নক আড়িয়াদহের ঘোষাল বাড়ির এক সুন্দরী বিধবা বৌ'কে বিয়ে করেছিলো।

তখনো কলকাতার পত্তন হয় নি।

তার তিন মেয়ে।—ম্যারি, এলিজাবেথ আর ক্যাথারিন। সম্ভবত তারাই ইতিহাসের প্রথম ইঙ্গ-ভারতীয়। তাদের প্রত্যেকেরই বিয়ে হয়েছিলো অভিজাত ইংরেজ পরিবারে। তাদের বংশধরদের কেউ বর্তমান কালে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত কিনা কারো জানা নেই।

জব চার্নক কলকাতার পত্তন করেছিলো ১৬৯০র ২৪এ অগস্ট। প্রায় তিন বছর পরে, ১৬৯৩র ১০ই জানুয়ারি জব চার্নক দেহরক্ষা করলো। সে সময়কার গঙ্গার পাড়ে, আজকের দিনের চার্চ লেন আর হেস্টিংস্-স্ট্রীটের মোড়ে সেণ্ট-জন্‌স্ চার্চের কবরখানায় তাঁর দেহ সমাহিত করা হোলো। হেস্টিংস্'এর নাম তখনো ইতিহাসের অনাগত পাতায়, যেখানে চার্চ লেন সেখানে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, হেস্টিংস্ স্ট্রীট আর চার্চ লেনের মোড় তখনো অজানা ভবিষ্যতের ঠিকানা।

কলকাতায় ইংরেজদের পাকাপাকি বসবাসের ব্যবস্থা করলো স্তর জন গোল্ড্স্বারো।

জব চার্নক মারা যাওয়ার কিছুদিন পরের কথা। কলকাতায় কাজকর্মের তদারকে এসেছিলো স্তর জন্। এসে ঘুরে ফিরে দেখে লালদীঘি অঞ্চলটা পছন্দ করে ফেললো। লালদীঘির পাড়ে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারিটা ভাড়া করে ফেলা হোলো। ক্রমশ পরিকল্পনা করা হোলো একটি নতুন কেল্লার। আর কলকাতার ইংরেজ কুঠির এজেণ্ট হয়ে এলো জব চার্নকের বড়ো জামাই স্তর চার্লস্ আয়ার, যার বৌয়ের ধমনীতে ছিলো বাঙালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের নীল রক্ত।

তখন সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে। দীল্লিতে রাজত্ব করছেন বুড়ো বাদশা আওরংজেব, লণ্ডনে উইলিয়াম দি থার্ড।

তখনো এখানে গড়ে ওঠেনি কোনো ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজ। তবে আরেকটি দো-আঁশলা সমাজের পত্তন হয়ে গেছে। তাদের পূর্বপুরুষ পর্তুগীজ।

বাঙলাদেশে পর্তুগীজ এসেছিলো ইংরেজদের অনেক আগে, ১৫৩০এ। তাদের প্রথম বসতি ওদিকে চাটগাঁয়, ওদের কাছে যার নামকরণ হয়েছিলো পোর্তো গ্রাঁদ, আর এদিকে সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও, পর্তুগীজ মানচিত্রে যার নাম ছিলো পোর্তো পিকেনো। আদিগঙ্গা বেয়ে পর্তুগীজ জাহাজ বেশী দূর এগুতে পারতো না। স্নুতরাং নোঙ্গর করতো গার্ডেন রীচ-এ। বেচাকেনার হাট বসতো বেতরে।

প্রথম দিকে তাদের মধ্যে যারা এদেশী মেয়েদের ঘরণী করেছিলো, তাদের সন্তানেরা অনেকে এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গেল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে নদী যখন মজে গেল, শেষ হয়ে গেল সাতগাঁয়ের গুরুত্ব, পর্তুগীজেরা সম্রাট আকবরের আমন্ত্রণে উঠে এলো হুগলিতে। ১৫৯৯ তে তৈরী হোলো ব্যাণ্ডেলের গীর্জা। আস্তে আস্তে স্নুরু হোলো সুশৃঙ্খল সমাজজীবন। পর্তুগীজ বাপ আর এদেশী মায়েদের সন্তানেরা আস্তে আস্তে একটি আলাদা সমাজ গড়ে তুললো। তাদের বলা হোলো 'কিন্টাল।'

১৬৩২এ মোগল সেনার হাতে হুগলি বিধ্বস্ত হোলো। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ওদের বংশধরেরা ব্যাণ্ডেলের গীর্জাকে অবলম্বন করে সম্প্রদায় হিসেবে টিঁকে রইলো কোনো রকমে। তবে নাবিক পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া সামাজিক অনৈতিকতা নিয়ে তারা তাদের উপনিবেশ অন্যান্য ইউরোপীয়দের কাছে এমন আকর্ষণময় করে তুললো যে ব্যাণ্ডেলের জনপ্রিয়তা টিকে ছিলো কলকাতা গড়ে উঠবার পরও বেশ কিছুদিন। তখনকার ইংরেজদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় ছড়া ছিলো ব্যাণ্ডেল সম্বন্ধে :

> Each other place is hot as hell,
> When breezes fan you at Bandel,
> Had I ten houses, all I'd sell,
> And live entirely at Bandel.

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে কলকাতার পত্তন হওয়ার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অনেক কিন্‌টাল চলে এলো কলকাতায়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাদের এক টুকরো জমি দিলো ফোর্টের কাছে। সেণ্ট অগাস্টিন অর্ডারের খৃস্টান সন্ন্যাসীরা খড় আর দরমা দিয়ে একটি সাময়িক উপাসনা মন্দির বানিয়ে নিলো সেখানে, যেখানে আজ দাঁড়িয়ে আছে পর্তুগীজ চার্চ।

তারই আশে পাশে বসতি স্থাপন করলো পর্তুগীজ বংশাবতংশ কিন্‌টালেরা।

তারা প্রচুর মুরগী রাখতো, প্রচুর মুরগী কেনাবেচা হোতো এখানে, তাই এ অঞ্চলটির নাম হোলো মুর্গীহাটা।

তখন কিন্তু তাদের মধ্যে পর্তুগীজত্ব কিছু নেই। তারা তখন গড় গড় করে "ছি-ছি-ইংলিশ" বলে। ভাষার সে নাম ইংরেজদেরই দেওয়া, কারণ তার এমন একটি বিশেষ উচ্চারণের ভঙ্গী, যা শুনলে ইংরেজরা নাক সিঁটকোয়, যার থেকে বর্তমান কালের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যারা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত তাদের ইংরেজি বলার ঢঙটি এসেছে। তখন আর কারো মনে নেই যে জব চার্নক আসবার বহু আগে পর্তুগীজ ভাষাই ছিলো কলকাতার

আশেপাশের অঞ্চলের বিদেশী উপনিবেশগুলির সার্বজনীন ভাষা, যার সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন ১৭২৭ এ তাঁর New Account of East Indies বইটিতে লিখে গেছে, "it is the language the Europeans must learn to qualify themselves for general conversation with one another, as well as the different inhabitants of India."

এসব কিন্‌টালেরা প্রথম দিকে কেরাণীগিরি ও অন্যান্য ছোটোখাটো কাজ করতো ইংরেজ দপ্তরে। কিন্তু তারা ছিলো অত্যন্ত অলস, আয়েসী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। ব্যক্তিগত জীবনে তাদের নৈতিক শৈথিল্যও ছিলো পূর্বপুরুষ নাবিক ও জলদস্যুদের মতোই। এসব নানা কারণে কলকাতার ইংরেজ কুঠির কোর্ট অফ ডিরেক্টারস্ তাদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। তখন থেকে তাদের অধঃপতন স্বরু। প্রয়োজনের তাগিদে ক্রীতদাসবৃত্তি থেকে স্বরু করে স্বন্দরবনে দস্যুবৃত্তি পর্যন্ত অনেক কিছুই তাদের অনেককে করতে হয়েছে।

এদিকে দেখতে দেখতে সপ্তদশ শতাব্দী কেটে গিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী আরম্ভ হোলো। গড়ে উঠলো ফোর্ট উইলিয়াম আর সংখ্যাবৃদ্ধি হোলো ক্ষুদ্র বৃহৎ ইংরেজ কর্মচারীর।

সে এমন একটা সময় যখন বিলেত থেকে মেম-বৌ আমদানি করা যেতো না এদেশে। স্বতরাং আস্তে আস্তে গড়ে উঠলো আরেকটি নতুন দো-আঁশলা সমাজ, ইংরেজ আর এদেশী রক্ত মিশে। ইংরেজ স্বামীরা দেশে ফিরবার সময় নিয়ে যেতো না এদেশী বৌদের, অনেক সময় এরাই ফিরে যেতে চাইতো না সেখানে। আর কখনো বা ইংরেজ স্বামীরাই, যাদের আর্থিক অবস্থা দেশে ফিরে গিয়ে বসবাস করবার অনুকূল নয়, কিম্বা যাদের পক্ষে সম্ভব হোতো না এদেশী সংসারের মায়া কাটানো, তারাও স্থায়ীভাবে বসবাস করতো এখানে। তাদের আর তাদের বংশধরদের নিয়ে বেড়ে উঠলো এই নতুন সম্প্রদায়, যাদের তখন বলা হোতো ঈস্ট ইণ্ডিয়ান।

সম্প্রদায় হিসেবে এদের প্রথম উদ্ভব এই কলকাতায়, এই বাংলা দেশের

মাটিতে। পাটনায় নয়, লক্ষ্ণৌএ নয়, রাজস্থানে নয়, দীল্লিতে নয়,—শুধু মাত্র কলকাতায়। গোয়া, দিউ, দামনের দো-আঁশলা সমাজ তখনো এই সম্প্রদায়ের বাইরে। বোম্বের ইংরেজ তখনো তার নিজের দেশের সঙ্গে যে যোগাযোগ রয়েছে, তা'তে কোনো নতুন দো-আঁশলা সম্প্রদায় গড়ে উঠবার সুযোগ অত্যন্ত কম। মাদ্রাজের দেশী খৃস্টানেরা তখনো খাঁটি মাদ্রাজী, ইংরেজ তাদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কের বীজ বুনতে যায় নি। দেশের এখানে সেখানে দু' চারজন ইংরেজের এদেশী স্ত্রীর ঔরসজাত সন্তান সামান্য কয়েকজন যারা ছিলো তারা এদিক ওদিক ছড়ানো ব্যক্তিবিশেষ, সমষ্টিগতভাবে কোনো সম্প্রদায় নয়।

মুর্গীহাটার কিন্‌টালেরা ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে, ইংরেজি আচার ব্যবহার গ্রহণ করে ক্রমশ মিশে যেতে লাগলো ঈস্ট ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে। আবার অনেক কিন্‌টাল মেয়ে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের চীনে জুতোওয়ালা ও ছুতোরদের বিয়ে করে তাদের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এক শতাব্দীর মধ্যে কিন্‌টাল বলে আর কিছু রইলো না। সে নামে তারা নিজেদের পরিচয়ই দিতো না। তখন ঈস্ট-ইণ্ডিয়ান নাম বদলে এই নতুন মিশ্র সম্প্রদায়ের নতুন নামকরণ হয়েছে ইউরেশিয়ান।

তারপর এক শতাব্দীর মধ্যে খাঁটি কিন্‌টাল আর দেখাই যেতো না বড়ো একটা। শুধু ক্ষীণ পরিচয় থেকে গেল ডি'সুজা, ডি'ক্রুজ, ডি'সিলভা, প্রভৃতি পদবীতে, ইংরেজি ভাষার caste, topee, towel, ayah, almirah প্রভৃতি শব্দে, তাদের ধর্মে, আর বিন্দালু, ফুগাথ, প্লান্টিক্রিথ, বলকোমার্ডো, মেল ডি'রোজ প্রভৃতি তাদের কয়েকটি প্রিয় খাবারের নামে।

ফিরিঙ্গীদের মধ্যে কিন্‌টাল রক্তের অনুপাত যেখানে বেশী, সেখানে আজ সাধারণতঃ দেখা যায় রোমান ক্যাথলিক ধর্ম, কালো গায়ের রং এবং বেশ নীচু জীবনযাত্রার মান। যেখানে অনুপাত বেশী ইংরেজ রক্তের, সেখানে দেখা যায় সাধারণতঃ প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম, অনেকটা ফরসা রং, কখনো বা নীল চোখ আর কটা চুল, এবং চলাফেরার মধ্যে খানিকটা পরিচ্ছন্ন সম্ভ্রমবোধ।

এমনি করে নতুন সম্প্রদায় যেটি গড়ে উঠলো, প্রথম দিকে সে ছিলো শুধু বাংলার পলিমাটিরই ফসল।

এদের প্রথম বসতি মুর্গীহাটা অঞ্চলে। তারপর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়লো আরো দক্ষিণে। বৌবাজার, ওয়েলিংটন, ধর্মতলা,, ওয়েলেস্‌লি, ইন্টালি, নোনাপুকুর হয়ে ছড়িয়ে পড়লো পার্ক স্ট্রীট কড়েয়ার দিকে। ভুলে যেতে আরম্ভ করলো এদের কয়েক পুরুষ আগেকার উঞ্ছবৃত্তির গ্লানি। কিছু লেখাপড়া শিখে কাজ পেলো ইংরেজ দপ্তরে, পুলিশে, সেনাবিভাগে।

তারপর আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে থেকে বেরুলো ডিরোজিওর মতো মনীষী।

এ সময় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলতে বোঝাতো শুধু এদেশের অভ্যাগত ইংরেজদের। ইউরেশীয়ানদের মধ্যে আস্তে আস্তে আস্তে মেকী-সম্ভ্রমবোধ জেগে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও আর নিজেদের ইউরেশীয়ান বলতো না, নিজেদের বলতে সুরু করলো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। তখন এদেশের খাঁটি ইংরেজরা নিজেদের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলা ছেড়ে দিলো।

কিন্তু বাংলা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে বসবাস করেও বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের ভাগীদার হতে পারলো না এই ফিরিঙ্গীরা, পড়ে রইলো একপাশে। ভিড়তে পারলো না ইংরেজদের মধ্যে, মিশতে পারলো না বাঙালীদের মধ্যে।—ঈস্ট ইণ্ডিয়ান, তারপরে ইউরেশীয়ান, পরে শুধু এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, এই পরিচয় নিয়েই আত্মলীন হয়ে রইলো নিজেদের মধ্যে নিজেরা বিয়ে থা করে।

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে, বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের পর রেললাইন বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করলো বৃটিশ ভারতে। কলকাতা থেকে ডিগবয় ডিব্রুগড়, কলকাতা থেকে বর্ধমান আসানসোল, কলকাতা থেকে মাদ্রাজ বম্বে, কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ দীল্লি।

আর এদের মধ্যে আস্তে আস্তে মিশে গেল কিছু কিছু দেশী খৃস্টান—বিশেষ করে যাদের খৃস্টান করেছিলো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্তুগীজ ধর্মযাজকেরা এবং পর্তুগীজ পদবী গ্রহণ করিয়েছিলো তাদের। দেশী খৃস্টানদের

মধ্যে অনেকে যেমনি ভারতীয় হয়েই থেকে গেল, তেমনি অনেকে ইংরেজ পদবী নিয়ে দেশী পোষাক ছেড়ে স্যুট গাউন পরে এদের মধ্যে মিশে গেল। এককালে কলকাতার আর্মানীরা পোষাক পরিচ্ছদ আচার ব্যবহারে নিজেদের একটা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতো। তারাও কোর্ট প্যাণ্ট ধরে সাহেব বনে গেল শেষ পর্যন্ত। তাদেরও আজকাল আর আলাদা করে চেনা যায় না।

আর তেমনি ভাবে দু'চারজন ছুটকো ছাটকা বাঙালী এ সমাজের মেয়ে বিয়ে করে এদের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল—যেমনি করে নিখোঁজ হয়ে গেছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েরা।

আজ বড়ো রাস্তার এপার থেকে রাস্তার ওপারের লেন বাই-লেনের মধ্যে তাদের দেখে মনে হয় তারা যেন কয়েকজন পথভ্রান্ত বিদেশীর বিস্মৃত অতীতের ঝাপসা হয়ে আসা স্মৃতিভার। সময়ের অচলায়তনে নিরুপায় অন্তরীণ হয়ে আছে, তাল সামলে চলতে পারে নি ইতিহাসের প্রগতির সঙ্গে। অত্যন্ত কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্যে টিঁকে থাকবার চেষ্টা করছে কোনো রকমে।

অরুণ আর আর্থার কলিন্স এক সঙ্গে পড়তো স্কুলে। তারপর দু'জনে পড়তে গেল দুটো আলাদা কলেজে। তারপর অনেকদিন দেখা নেই।

একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল নিউ মার্কেটে।

অরুণ কিনতে গিয়েছিলো একটি ঘড়ির ব্যাণ্ড। ফেরবার সময় দেখে একজন টুব্যাকোনিস্টের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একবাক্স চুরুট নেড়ে চেড়ে দেখছে কলিন্স।

"আর্থার!"

"অরুণ? হাল্—লো—! হালো, হালো, হালো, কী খবর। কি রকম আছো?"

একবাক্স চুরুট কিনে আর্থার আর অরুণ বেরিয়ে এলো নিউমার্কেট থেকে।

"আমার জীপ পার্ক করে রেখেছি লাইট হাউসের সামনে। চলো, কোথাও গিয়ে চা খাওয়া যাক," আর্থার বললো।

অরুণ শার্টের আস্তিনটা সরিয়ে ঘড়ি দেখলো।

দুটো প্রায় বাজে।

বললো, "এসো, তার আগে লাইটহাউসে দুটো টিকিট করে নি।"

"সিনেমায় যাবে?" আর্থার তাকালো অরুণের দিকে, "কিন্তু আমার তো সময় হবে না।"

"কেন? কারো সঙ্গে date আছে নাকি?" হেসে জিজ্ঞেস করলো অরুণ।

"না ভাই, অফিসের কাজ—।"

"শনিবার দুটোর পর অফিসের কাজ?"

"হ্যাঁ, আমার চাকরিটাই ওরকম। চলো, কোনো টী-রুমে বসা যাক কিছুক্ষণ। তিনটে নাগাদ ওঠা যাবে, তুমি সিনেমায় ঢুকবে, আমি যাবো আমার কাজে।—কিম্বা, এক কাজ করা যাক। তুমিও চলো আমার সঙ্গে।"

"তোমার অফিসে?"

"না, অফিসে নয়, বাবলাপোতায়।"

"সে আবার কোথায়?"

"অনেক দক্ষিণে, যাদবপুর গড়িয়া ছাড়িয়ে। জীপে যাবো, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসবো।"

"বাবলাপোতা? নাইকে শুনিনি—।"

"খুব ছোটো একটা গ্রাম, আমিও আগে জানতাম না।"

"কিন্তু তুমি বললে অফিসের কাজ!"

"হ্যাঁ, অফিসের কাজেই তো যাচ্ছি। চলোই না। সময়টা বেশ কাটবে। সিনেমায় তো প্রত্যেক শনিবার যাচ্ছোই। ফিরে এসে কোথাও বসে ডিনার খাওয়া যাবে, তারপর আরো ভালো কিছু করবার যদি না থাকে আমাদের, একটা সিনেমা দেখা যাবে।"

লাইটহাউসের পেছন দিকে লিণ্ডসে স্ট্রীটে একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত টী-রুম, সেখানে গিয়ে বসলো অরুণ আর আর্থার।

একটি প্যাটিস তুলে নিয়ে অরুণ জিজ্ঞেস করলো, "কী করছো আজকাল তা'তো আমায় বলো নি।"

"আর দশজনে যা করে থাকে— সাধাসিধে একটি চাকরি। আমি কলকাতার করেস্‌পণ্ডেট, কাদের জানো ?—," আর্থার বম্বের একটি বিখ্যাত দৈনিকের নাম করলো।

"আচ্ছা !—তার মানে বাবলাপোতায় যাচ্ছো কোনো খবর স্কুপ করতে ?"

আর্থার হাসলো। বললো, "যাচ্ছি এক বুড়োর সঙ্গে দেখা করতে। এই চুরুটগুলো তারই জন্যে কিনলাম। ওর সঙ্গে বসে গল্প-সল্প করবো। যা শুনবো তা' হয়তো আমার লেখার গুণে একটি সরেস খবরে দাঁড়াতে পারে।"

"খুব ইণ্টারেস্‌টিং মনে হচ্ছে !"

"খুউ—ব। তুমি আর আমি আর আমাদের মতো কতো ছেলে জীবনের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে শুধু যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের অভাবে জীবনটাকে ঠিকমতো উপভোগ করতে পারছে না, আর এক ব্যাটা বুড়ো, মরতে বসেছে, সে কিনা আচমকা কয়েক কোটি ডলার সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়ে বসেছে !"

"ডলার ?"

"হ্যাঁ, তার এক আমেরিকান আত্মীয়ের সম্পত্তি।"

"লোকটা বাঙালী ?"

"না। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—।"

"এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বুড়ো বাবলাপোতায় বসে কি করছে ?"

"সে সবই তো আমায় গিয়ে জানতে হবে। যদ্দূর শুনেছি একশো কি দেড়শো বছর আগে ওর ঠাকুর্দা না কে গিয়ে সেখানে আস্তানা গেড়েছিলো। এখন সে একাই আছে। আর কেউ নেই। হয় তো ওর নিজের বলতেও কেউ নেই। আর ভেবে দেখ, ওর মতো একটি ব্লোক্‌ মাল্টি-মিলিওনেয়ার হতে বসেছে।"

"দু' একটি মেয়েও নেই বুড়োর ?"

আর্থার হাসলো, "সে খবরও নিতে হবে বৈ কি।"

জীপে যেতে যেতে ব্যাপারটা মোটামুটি শোনা গেল আর্থারের কাছ থেকে।

আমেরিকার বিখ্যাত তেলের খনির মালিক, অয়ল-কিং পীট বাওয়ার। পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত যতো রকম ব্যবসা হতে পারে, তার এক বিরাট শৃঙ্খলের প্রধান অংশীদার। মাস দুয়েক আগে পীট বাওয়ার মারা গেছে।

সে তো আন্তর্জাতিক খবর। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বেরিয়েছিল। পীট বাওয়ার জুনিয়ারের বাপ পীট বাওয়ার সিনিয়ার নানা কাজে বহু টাকা দান করে বিশ্ববিখ্যাত, বাওয়ার ফাউণ্ডেশান স্কলারশিপ নিয়ে কতো বিদেশী ছাত্র আমেরিকায় পড়তে যায়।

পীট বাওয়ারের পূর্বপুরুষ ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় যায় পৌনে দুশো বছর আগে। নাম আলেকজাণ্ডার বাওয়ার। আলেকজাণ্ডারের এক ভাই ছিলো। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে সে আসে ভারতবর্ষে। নাম স্টুয়ার্ট বাওয়ার। সাধারণ সৈন্য হিসেবে যোগ দিয়ে পরে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল হয়েছিলো। তারপর কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুণার এক পেশোয়ার অধীনে চাকরি নেয়। তার দুই ছেলে, এক মেয়ে। এক ছেলে দীল্লিতে ব্যবসা করতো। মেয়েটির সম্বন্ধে কোনো খবরই জোগাড় করতে পারা যায় না। এক ছেলে ফ্রান্সিস বাওয়ার কলকাতায় ফোর্টে চাকরি করতো। সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে জমিদারী কিনে বাবলাপোতায় এসে ফলের বাগান শাক শবজির চাষ, ডেইরি-ফার্মিং এসব সুরু করেছিলো। তার বংশধরেরাও বসতি স্থাপন করেছিলো বাবলাপোতায়।

স্টুয়ার্ট বাওয়ারের অন্য ছেলেমেয়েদের খবর আর্থার যোগাড় করতে পারে নি। বললে, "পুরোনো কলকাতার কাগজপত্রে নাম পাচ্ছি এক মিসেস ম্যারি বাওয়ার্সের। ১৭৮০তে হিকির গেজেটে এক টুকরো খবর পাচ্ছি : Mrs. Bowers was a young woman and inhabitant

of **Calcutta, when it was taken by the Moors in the year —where upwards of—British subjects were confined in the dungeon; she concealed herself until after night in one of the warehouses in the factory, from whence she made her escape on board a small vessel lying in the river opposite the old Fort.** এই মিসেস বাওয়ার্স নাকি অন্ধকূপের অন্যতম বন্দী ছিলো। সত্যি হোক মিথ্যে হোক, পরে যারা সামান্য কিছু কিছু করে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলো এবং যাদের নাম "list of sufferers"এ বেরোয়, তাদের মধ্যে এর নামও আছে। পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণ দিকের কবরখানায় নাকি এর সমাধি আছে, যদিও আজ আর কেউ সে কবর কোথায় বলতে পারে না। আমার একবার সন্দেহ হয়েছিলো এই ম্যারি সেই লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল বাওয়ারের ছেলের বৌ কিনা, কারণ বাওয়ার আর বাওয়ার্সের মধ্যে তফাৎটা খুব বেশী নয়, শুধু একটি "s" এর তফাৎ। এরকম ভুল চুক অনেক হয়—যেমন, লাউডন স্ট্রীট যাঁর নামে তিনি **L-O-U-D-O-N** নন্‌, তাঁর অন্যতম উপাধি ছিলো **L-O-U-D-O-U-N**। এখন "U" টা উঠে গেছে। কিন্তু অনেক খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম মিসেস ম্যারি বাওয়ার্সের সঙ্গে লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট বাওয়ারের কোনো সম্পর্ক নেই।"

এদিকে আমেরিকায় আলেকজাণ্ডার বাওয়ার ঘোড়ার ব্যবসা করতে করতে হঠাৎ টেক্সাসে গিয়ে প্রচুর জমিজমা কিনে ফেললো। কিছুদিন পর তেল পাওয়া গেল সেখানে। তারপর এক পুরুষের মধ্যেই ওরা কোটিপতি।

মাস কয়েক আগে একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে বাওয়ার ফাউণ্ডেশান স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় পড়তে যায়। সে এদেশের বাওয়ারদের সম্বন্ধে কিছু কিছু বোধ হয় শুনেছিলো। তার কাছ থেকে পীট বাওয়ার জুনিয়ার জানতে পারে যে ওর জ্ঞাতিরা এদেশে বিয়ে থা করে এখানেই বসবাস করছে এবং এখন খুব দুরবস্থার মধ্যেই আছে। পীট বাওয়ার স্থির করেছিলো যে সে এসের খোঁজখবর করে এদের সাহায্য করবে। কিন্তু কিছু করে উঠবার আগেই

সে লিভারের কি একটা অসুখে মারা যায়। তার নিজের ছেলে মেয়ে ছিলো না। সম্পত্তির ওয়ারিশ তার ভাগ্নে-ভাগ্নীরা। সে মারা যাওয়ার আগে উইল করে গেল যে তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে তার বোনের ছেলে মেয়েরা, আর বাকী অর্ধেক পাবে লেফটেনেণ্ট কর্ণেল স্টুয়ার্ট বাওয়ারের ছেলেদের বংশধরেরা। তিন বছরের মধ্যে যদি কারো খোঁজ পাওয়া না যায় বা কেউ দাবী না করে তা' হলে সে টাকার ওয়ারিশ হবে বাওয়ার ফাউণ্ডেশান।

দিন পোনেরো আগে নিউ ইয়র্কে বাওয়ারের সম্পত্তির ট্রাস্টিরা চিঠি পেলো কলকাতার এক এটর্নির কাছ থেকে। স্টুয়ার্ট বাওয়ারের একমাত্র জীবিত বংশধর বাবলাপোতার বুড়ো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান উইলিয়াম বাওয়ার, সে পীট বাওয়ারের উইল অনুযায়ী তার সম্পত্তির উপর দাবী জানাচ্ছে।

"এখন এই বুড়ো বিল বাওয়ারের খোঁজেই আমাদের বাবলাপোতা অভিযান," আর্থার কলিন্স বললো, "ভেবে দেখ সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখলে কী চমৎকার একটি খবর হবে।"

গড়িয়াহাট রোড ধরে এগিয়ে গিয়ে ঢাকুরে, যাদবপুর, গোড়ে পেরিয়ে মাইলখানেক গিয়ে বাঁয়ে একটি কাঁচা আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে আরো খানিকটা গিয়ে একটি দীর্ঘ বাঁশবন পেরিয়ে জীপ এসে থামলো ধানক্ষেতের পাশে।

আর্থার বললে, জীপ আর যাবে না। হেঁটে যেতে হবে এখানে থেকে।

"কতোটা ?"

"আরো মাইল খানেক—। কিন্তু একজন লোক আসবার কথা আছে। সেই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমি তো চিনি না। তাই বুড়ো বিলকে আগেই চিঠি দিয়ে জানিয়েছি।"

একপাশে একটি বট গাছের নিচে বসে গল্প করছিলো তিন চারজন লোক। তাদের মধ্যে একজন হুঁকো রেখে উঠে দাঁড়ালো।

কাছে এসে সেলাম করে বললে, "আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন ?"

ঘাড় নাড়লো অরুণ আর আর্থার।

"বুড়ো সায়েব আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

তার পেছন পেছন এগুলো এরা দুজন। আল ভেঙে ধান ক্ষেত পেরিয়ে আরেকটি মেঠো রাস্তায় উঠে একটি আমবাগান বাঁয়ে রেখে, একটি ভাঙা শিব মন্দির পেছনে ফেলে, জুতোর মশমশ শব্দে গাছের পাখিদের চমকে দিয়ে দু'চার পাঁচজন গ্রাম্য ছেলে মেয়ের অবাক চাউনি অতিক্রম করে বাঁশবনের ছায়ায় ছায়ায় এসে ঢুকলো একটি খুব ছোটো গাঁয়ে, যেখান থেকে মনে হয় কলকাতা অনেক দূর। বাঁয়ের দিগন্ত-ছোঁয়া ফাঁকা ধানক্ষেতের ওপারে একটি ম্লান সূর্য তখন দূরান্ত পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

আটদশ ঘর গেরস্ত চাষীদের মাটির কোঠা বাড়ি পেরিয়ে আরেকটুখানি এগিয়েই একটি জীর্ণ বাংলো। চারদিকের পাচিল অনেক জায়গায় ধ্বসে পড়েছে। বাড়ির চারপাশে এককালে হয়তো বাগান ছিলো, জঙ্গল হয়ে গেছে এখন। দেখেই বোঝা যায় বেশ শৌখিন বাড়ি ছিলো এক কালে। এখন হয়তো ভেঙে পড়বে আর দু'চার বছরের মধ্যেই।

খাকি ঢলঢলে প্যাণ্ট আর লংক্লথের হাফশার্ট পরা এক বুড়ো দাঁড়িয়েছিলো গেটে। এরা কাছে আসতেই লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে এগিয়ে এসে সে হাত বাড়িয়ে দিলো। করমর্দন করে আর্থার অরুণের পরিচয় দিলো। তার সঙ্গেও করমর্দন করলো বুড়ো বিল বাওয়ার।

বললো, "এসো, ভিতরে এসো। হয়তো তোমাদের আরো ভালো ভাবে অভ্যর্থনা করতে পারতাম। কিন্তু তোমরা তিরিশ বছর দেরী করে এসেছো। ওই যে দেখছো আমবাগান, তার ওপাশে যে জঙ্গলটা দেখছো সেখানে থাকতো আমার খুড়তুতো ভাই এডোয়ার্ড বাওয়ার। ওদিকের ওই গড়ের ওপারে থাকতো আমার ভাই জেমস্ বাওয়ার। আমরা তিন ঘর বাওয়ার থাকতাম এখানে, বছর তিরিশ আগে ছেলে বুড়ো সবাইকে নিয়ে প্রায় চল্লিশজন লোক।

আঃ, কী দিন ছিলো তখন। সে সময়কার ক্রীস্‌মাস ইভ্‌ বা ঈস্টারের সময় যদি আসতে তো দেখতে বাওয়ারদের আগের অবস্থা। ওই যে দেখছো ধান ক্ষেত, এদিক থেকে ঠিক ওই ওদিক পর্যন্ত, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবটাই, ওই দিগন্তরেখা পর্যন্ত, সবই ছিলো আমাদের। মাইল দেড়েক পুবে গেলে পাবে দেড়শো বিঘের একটি ঝিল, আজো তার নাম ফ্রাঞ্চিসায়েবের ঝিল—হাঃ হাঃ, এরা আমার ঠাকুর্দা ফ্রান্সিস বাওয়ারকে ডাকতো ফ্রাঞ্চি সায়েব। ওই বাঁশবনের ওপারে শ'খানেক বিঘে জমির উপর এক ফলের বাগান আছে। সেও ছিলো আমাদের। বুঝলে, একশো গরু ছিলো আমার ঠাকুর্দার, আর কতো যে মুরগী ছিলো, হাঁস ছিলো, ছাগল ছিলো গুণে শেষ করা যায় না। এমন দিন ছিলো যখন আমাদের এখান থেকে চালান না গেলে নিউমার্কেটের দোকানীরা দরজা বন্ধ করে ফেলতো। কমতে কমতে কমতে কমতে একটা গরুতে এসে ঠেকেছিলো। সেটাকে কিছুতেই প্রাণে ধরে বেচতে পারি নি। তার মা, ঠাকুর মা, ঠাকুর মায়ের মা, সবাই আমাদের গোয়ালেই জন্মেছে। মাস কয়েক আগে সেও মরে গেল। আমার আর কেউ নেই, জানো? আমার ছেলে-মেয়ের দুটি অনেক দিন আগে চলে গেছে, বুড়ো বাপের কোনো খবরই নেয় না। গরুটা ছিলো। সেও গেল।"

গলা ভিজে এলো বুড়ো বিল বাওয়ারের।

"এখন শুধু এই ভাঙা বাড়িটা আছে। আর কিছু নেই। জমিজমা সোনারপুরের মুখার্জীরা কিনে নিয়েছে, ঝিলটা কিনে নিয়েছে রাণাঘাটের সাহারা। ওসব বাপ-খুড়োদের আমল থেকেই যেতে আরম্ভ করেছিলো। ফলের বাগানের মালিক এখন গোড়ের দত্তেরা। সম্পত্তি ভাগ হতে হতে, বেচতে বেচতে, বাঁধা পড়ে ডিক্রি হতে হতে এখন শুধু আমিই আছি।"

বুড়োর পেছন পেছন বারান্দার ওপর গিয়ে উঠলো অরুণ আর আর্থার।

সামনে একটি নেওয়ারের খাটিয়া।

"এখানেই বোসো," বললো বুড়ো বিল, "ভেতরে বড্ড ধুলো আর বড্ড অন্ধকার।"

নিজে বসলো একটি মোড়ার উপর।

তারপর ভেতরের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বাংলায় ডাকলো, "নেপোর মা—, নেপোর মা—!"

বেরিয়ে এলো একজন মাঝবয়েসী স্ত্রীলোক।

"এনারা এসেছেন। চা দিতে হবে—।"

স্ত্রীলোকটি চলে যেতে আবার ইংরেজি সুরু করলো। বললে, "এর স্বামী কাছেই থাকে, চাষ বাস করে। এ আমায় দেখাশুনো করে, লাঞ্চ সাপার ব্রেকফাস্ট তৈরী করে দেয়। তবে সে খুব সহজ ব্যাপার। ব্রেকফাস্ট আর কি, এক কাপ চা আর একটি দেশী বিস্কুট। লাঞ্চ আর সাপারে এখানকার লোকের মতো, ভাত, ডাল, কারিই খাই। এর বেশী কিছু আর পাবোই বা কি করে, আর করে দেবেই বা কে। আমি একেবারে নেটিভ বনে গেছি। এখানকার লোকজন সবাই এত ভালো! আমায় এত ভালোবাসে! এরা না থাকলে আমি পাগল হয়ে যেতাম এদ্দিনে। বাড়ির পেছনে একটুখানি ধান জমি আছে। সামান্য কিছু ধান পাই। আমার চলে যায়।"

"তবে এখন থেকে নিশ্চয়ই আর কোনো অসুবিধে হবে না," আর্থার বললো।

বুড়ো একটু হাসলো। খুব বিষণ্ণ হাসি।

"না, আশা করছি অসুবিধে হবে না। তবে ওরা সবাই যদি কাছে থাকতো আরো খুশী হতাম। ওরা তা'হলে আমায় বাবা বলে ভালোই বাসতো।"

ওরা বলতে বুড়ো বিল কাদের কথা ভাবছে বুঝতে অসুবিধে হোলো না এদের।

আর্থার জিজ্ঞেস করলো, "ওরা এখন কোথায়?"

মাথা নাড়লো বিল বাওয়ার। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, "জানি না, আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। ওদের কলকাতায় পড়তে দিলাম, তারপর দেখি এখানে আর আমার কাছে থাকতে চায় না। এখন বোধ হয়

কলকাতায়ই আছে। রেজি একবার টাকা চেয়েছিলো তিনশো। কোত্থেকে দেবো! সেদিন থেকে আর চিঠি লেখে না। ডোরা বোধ হয় বিয়ে করেছে। জানি না। চিঠি তো দেয় না। ভালোই আছে নিশ্চয়ই। খারাপ খবর থাকলে নিশ্চয়ই পেতাম। তবে অনেকদিন হয়ে গেল। মাঝে মাঝে মনে পড়ে। মন খারাপ হয়। আজকাল বেশী করে মনে পড়ে। বুড়ো হয়ে গেছি তো! ওদের খবর শেষবার পাই কবে?" একটুখানি ভাবলো বুড়ো বিল—"হ্যাঁ, উনিশ শো চল্লিশে—। সে বছর ঝড়ে ওদিকের একটি আমগাছ পড়ে গিয়েছিলো।"

অরুণ আর আর্থার দুজন দুজনের দিকে তাকালো। উনিশ শো চল্লিশ! প্রায় পোনেরো ষোলো বছর হয়ে এলো।

"এবার নিশ্চয়ই ওরা আপনার খবর নেবে।"

"তাই তো আশা করছি," হাসলো বুড়ো বিল বাওয়ার। "তবে এখনো নিশ্চয়ই খবর পায় নি। পেলে ছুটে আসতো। তবে এসেও লাভ নেই। ওদের এক পয়সাও দেবো না। আমার আশে পাশে যারা থাকে, এরা বড় গরীব। এদের স্কুল করে দেবো, ডিসপেনসারি করে দেবো, এদের একটি টেম্পল ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, সেটি ঠিক করে দেবো। তারপর, কলকাতায় গরীব বুড়োবুড়িদের একটি হোম্ আছে, কী যেন তার নাম? হ্যাঁ, মরিসন্স্ হোম্ ফর দি ওল্ড এ্যাণ্ড ইনফার্ম্, সব টাকা সেখানে দিয়ে দেবো। আমি এখান থেকে আর কোথাও যাবো না। আমার বাবার কবর এখানে, আমার মায়ের কবর এখানে, আমার ঠাকুরদার কবর এখানে, আমার ঠাকুরমার কবর এখানে—আমিও এখানে ওদের পাশেই একটুখানি জায়গা করে নেবো।"

"আপনার অন্য আত্মীয়স্বজনেরা কোথায়?"

বুড়ো বিল আঙুল দিয়ে উপর দিকে দেখিয়ে দিলো। "আত্মীয় বলতে ছিলো আমার খুড়তুতো ভাই এডওয়ার্ড আর আমার ভাই জেমস্। জেমস্এর ছেলে ছিলো না। তিন মেয়ে। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। দু'জন

কলকাতায় ছিলো আর একজন বাঙ্গালোরে। এখন কোথায় আছে জানিনা। এডওয়ার্ডের চার ছেলে —এণ্টনি, ফ্রেডারিক, রবার্ট আর চার্লস্। টনি ছিলো রেলের গার্ড। ১৯৩৮ এ যে মাদ্রাজ মেল একসিডেণ্ট হয়, তাতে সে খুব জখম হয়ে মারা যায়। ফ্রেডি মারা যায় খুব ছেলে বেলায়। বার্টি নেভিতে যোগ দিয়েছিলো। সে মারা যায় যুদ্ধে। আর চার্লি ভীষণ মদ খেতো। সে গেল লিভারের না কিডনির অসুখে, ঠিক মনে নেই। ওরা এখানে কেউ থাকতোও না। এখানে লাইফ কোথায় ? কলকাতায় থাকতো, এখানে মাঝে মাঝে আসতো।”

“আপনার পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন ?” আর্থার জিজ্ঞেস করলো।

“আমার পূর্বপুরুষ ?” বুড়ো বিল বাওয়ারের উদাস চাউনি ভেসে গেল দূরান্ত তালগাছগুলোর ওপারে। সেদিক থেকে উড়ে আসছে, বাড়ি ফিরছে এক ঝাঁক পাখি।

আস্তে আস্তে স্থরু করলো উইলিয়াম বাওয়ার।

খুব পুরু দিশী পোর্সিলেনের কাপে করে চা এনে দিলো নেপোর মা। সিগারেট ধরিয়ে শুনতে বসলো আর্থার আর অরুণ।

“আমার পূর্বপুরুষের দেশ নরফোক অঞ্চলে। আমার ঠাকুরদার বাবা স্টুয়ার্ট বাওয়ারই প্রথম এদেশে আসেন। সে মিউটিনির অনেক আগে। তারিখ আমার মনে নেই। শুনেছি স্টুয়ার্ট বাওয়ার লর্ড ব্যাবিংটনের ভাগ্নে। স্টুয়ার্টের একটি ভাই ছিলো, আলেকজাণ্ডার। সে চলে যায় স্টেট্স্এ। সে তো তোমরা জানো।

স্টুয়ার্ট এদেশে এসেছিলো ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে সাধারণ এক সৈনিকের চাকরি নিয়ে। পরে সে যুদ্ধে নাম করে উঠতে উঠতে একেবারে লেফ্টেনাণ্ট কর্নেল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কোম্পানির চাকরি করেনি সে। টাকাকড়ির ব্যাপারে না কিসে যেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোলমাল হতে সে চাকরি ছেড়ে দেয়। তারপর চাকরি নেয় শক্তিগড়ের মহারাজার অধীনে।

সে চাকরি কিছুদিন করে তারপর চলে যায় পুণায় পেশোয়ার কাছে। পুণ্যতেই মারা যায় সে।

তার দুই ছেলে, এক মেয়ে। ছোটো ছেলে ফ্রান্সিস বাওয়ারই আমার পিতামহ। আমার বাবার নাম হেনরি বাওয়ার। ফ্রান্সিস বাওয়ার খুব পয়সাওয়ালা লোক ছিলো। স্টুয়ার্ট বাওয়ার মারা যাওয়ার পর সে পুণা থেকে কলকাতায় এসে কিছুদিন কোর্টে চাকরি করে, তারপর ব্যবসায় লেগে যায়। তারপর এ অঞ্চলে জমিদারী কিনে এদিকে সরে এসে এখানে ডেয়ারী, অর্চার্ড, পোল্ট্রি ইত্যাদি করেছিলো। ও একটু অন্য রকম প্রকৃতির লোক ছিলো; ওর সঙ্গে কলকাতার সায়েবদের সঙ্গে বনতো না। ওর বাপের মতো সেও বিয়ে করেছিলো মারাঠি মেয়ে, কিন্তু ওর মা খৃস্টান হলেও, ওর বৌ খৃস্টান হয় নি। সে মারাঠি ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলো। বিয়ের পরও পূজো টুজো করতো। আমার বাবা হেনরি বিয়ে করেছিলো আসানসোলের এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে। ছেলে পুলে হওয়ার আগে সে মারা যায়। তারপর বিয়ে করেন আমার মা'কে। আমার মা'ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। দেশ হাওড়ায়।

এই তো। আর তো কিছু বলবার নেই।"

আর্থার জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, কর্নেল স্টুয়ার্ট বাওয়ারের আরো দু'টি ছেলে মেয়ে ছিলো না?"

"হ্যাঁ, রিচার্ড বাওয়ার আর ফ্লোরেন্স বাওয়ার।"

"ওদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?"

"হ্যাঁ—, পারি," একটু ইতস্তত করলো বুড়ো বিল, "তবে ওদের কথা আমরা সাধারণত কাউকে বলি না। অন্তত আমি বলি না। আমার মতো লোক যে ওদের বংশধর এটা ভাবতেই খারাপ লাগে।"

একটু চুপ করে থেকে বললো, "আচ্ছা, তুমি নিউস্‌পেপার-ম্যান, তোমায় বলছি। স্টুয়ার্ট বাওয়ার শক্তিগড়ের মহারাজার অধীনে চাকরি করতো বলেছি না? সেই মহারাজার ছেলে, যে মহারাজা হয়েছিলো ওর

পরে, তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো ফ্লোরেন্স বাওয়ারের সঙ্গে। ফ্লোরেন্সের ছেলেই মহারাজা হয়েছিলো তার বাপ মারা যাওয়ার পর। সে অবশ্যি বিয়ে করেছিলো যোধপুরের এক রাজকন্যাকে। ওদের ছেলেমেয়েরা সব এখন ভারতীয় নীল রক্ত। কে একজন শুনেছি ফরাসী মেয়ে বিয়ে করেছে।"

"আর রিচার্ড বাওয়ার?"

"ও একটি ডেয়ার ডেভিল ছেলে। দীল্লির রেসিডেন্সিতে চাকরি করতো। এমনিতে সেনাবিভাগের লোক, পদমর্যাদায় ছিলো ক্যাপ্টেন। লোকে বলে খুব সুন্দর ছিলো নাকি দেখতে। সে বিয়ে করেছিলো এক অভিজাত মুসলমান ওমরাওএর মেয়েকে। মেয়েটির মা ছিলো দীল্লির বাদশা শাহ্ আলমের সম্পর্কে ভাইঝি। মিউটিনির কিছু আগে ওরা কলকাতায় চলে আসে। ওদের ছেলেমেয়ে হয় নি।"

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো ওরা দু'জন।

ততক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

আর্থার বললো, "মিষ্টার বাওয়ার, এবার যেতে হবে আমাদের। আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। উইলের প্রোবেট যখন পাবেন তখন নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাতে আসবো।"

"এখনই উঠবে?" জিজ্ঞেস করলো বুড়ো বিল বাওয়ার, "আরো কিছুক্ষণ বসে যাও। ওরা সবাই আসবে। ওদের দেখে যাও।"

"কারা আসবে?"

"আমার প্রতিবেশীরা। আমার এখানে হরির লুঠ হবে, কীর্তন হবে।"

"কি হবে?" চোখ কপালে তুললো আর্থার কলিন্স।

"ও মিস্টার কলিন্স, তুমি তো বুঝবে না। তুমি কলকাতার সায়েব। তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করো। ও বাঙালী হিন্দু। ও বলতে পারবে।"

আর্থার হেসে বললো, "অরুণ বাঙালী, কিন্তু হিন্দু নয়, ক্রিশ্চিয়ান।"

"তা' হলেও হরির লুট আর কীর্তন কাকে বলে আমি জানি," অরুণ বললো। "কিন্তু আপনি এসব করছেন? আশ্চর্য ব্যাপার!"

"কিছুই আশ্চর্য ব্যাপার নয়," উত্তর দিলো বুড়ো বিল। "আমি এদের মধ্যে থেকে থেকে এদেরই মতো হয়ে গেছি। আমি টাকা পেয়েছি বলে হরির লুঠ দিয়ে যদি এরা খুশী হয়, সে আনন্দ থেকে আমি কেন এদের বঞ্চিত করবো? আর এদের কীর্তন শুনতে আমার বেশ লাগে। এত সহজ, এত মিষ্টি। তোমরা শোনোনি, তোমাদের কাছে একঘেয়ে লাগবে। কিন্তু শুনতে শুনতে শেষ পর্যন্ত একদিন ভালো লেগে যায়।"

"আরো কিছুক্ষণ থাকতে পারলে খুব খুশী হতাম মিস্টার বাওয়ার। কিন্তু আমাদের যেতে হবে। টাউনে অন্য কাজ আছে।"

"বেশ, যাবেই যদি, আশা করা যাক যে আবার দেখা হবে।"

ওদের সঙ্গে করমর্দন করলো বুড়ো উইলিয়াম বাওয়ার। গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলো।

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। অনেক দূরে দূরে শাঁখ শোনা যাচ্ছে। বাঁশ বনে হাওয়া বইছে ঝির ঝির করে।

বাইরে এসে আর্থার বললে, "একটি আশ্চর্য ভালো লেখা হবে বুড়োকে নিয়ে। দেখে নিয়ো, আমার এবারের নিউস-লেটারটি সেনসেশানেল হবে।"

জীপে চেপে বড়ো রাস্তা ধরে ফেরবার সময় অরুণ জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বুড়ো যা' যা' সব বললো সত্যি?"

"সত্যি না হওয়ার কোনো কারণ নেই—। সত্যি হওয়া খুবই সম্ভব।"

"ওর এক পূর্বপুরুষ বিয়ে করেছে মোগল রাজবংশে, আরেকজন বিয়ে করেছে শক্তিগড়ের মহারাজাকে?"

"কিছুই অসম্ভব নয়। এই কিছুদিন আগে খবরের কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছো বিলেতের এক ব্যারনের বংশধর উত্তরপ্রদেশের এক এ্যাংলা ইণ্ডিয়ান পরিবারের কথা। ওদের বংশেও তো একজন বিয়ে করেছে এক মোগল রাজকন্যাকে। আরো দু'জনও তো কোথাকার কোথাকার রাজকন্যাকে

বিয়ে করেছিলো। আর ওই পরিবারটি এখন কায়ক্লেশে বেঁচে আছে। জীবনে ভাই সবই হয়।"

"কিন্তু মুসলমান অভিজাত বংশের মেয়ে এক সাধারণ ইংরেজকে বিয়ে করবে কেন?" অরুণ জিজ্ঞেস করলো।

"ভালোবেসে বিয়ে করবে, তা ছাড়া আবার কি? ইতিহাসেই ওরকম কতো হয়েছে। ওয়ল্টার রেইনহার্টকে বিয়ে করেছিলো বেগম সমরু। রেইন-হার্টের গায়ের রঙের জন্তে ওর নাম দেওয়া হয়েছিলো Sombre, তাই থেকে সমরু। বেগম সমরু ছিলো অভিজাত মুসলমান পরিবারের মেয়ে। বেগম খয়রুন্নিসার বিয়ের ব্যাপারটাই ধরো না। শুনেছো ওর নাম?"

"না।"

"শোনো তাহ'লে, টিপু সুলতানের আমল তখন শেষ হয়ে আসছে, ফ্রান্সে শুরু হয়েছে নেপোলিয়ানের দিন। সে সময়ে হায়দ্রাবাদে রেসিডেন্ট ছিলো কর্নেল জেমস আকিলিস কার্কপ্যাট্রিক। সে রেসিডেণ্ট ছিলো ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫ পর্যন্ত। খয়রুন্নিসা ছিলো নিজামের বক্সীর নাতনী। তাদের বাড়িতে এক জলসায় পর্দার আড়াল থেকে জেমস্‌কে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেল খয়রুন্নিসা। সে প্রথমে এক বয়স্কা মহিলাকে পাঠালো তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু জেম্‌স্ তার কথা কানেই তুললো না। তখন নিজেই পাল্কি চেপে উপস্থিত হোলো জেম্‌স্ কার্কপ্যাট্রিকের বাড়ি। তাকে দেখে মুগ্ধ হোলো কার্কপ্যাট্রিক। তারপর নিজামের কাছে গিয়ে খয়রুন্নিসার পাণিপ্রার্থনা করলো। নিজাম ডেকে পাঠালো খয়রুন্নিসার ঠাকুর্দাকে। সে তো কিছুতেই রাজী নয়। পরে নিজামের কথায় রাজী হোলো এই সর্তে যে বিয়েটা হবে মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী। কার্কপ্যাট্রিক তাইতেই রাজী হোলো। কিন্তু হৈ চৈ পড়ে গেল কলকাতার ইংরেজ মহলে। সবাই যা' তা' বলতে লাগলো তাকে, গালাগাল দিতে লাগলো, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে লাগলো। তখন লর্ড ওয়েলেস্‌লি গভর্নর জেনারেল। কার্কপ্যাট্রিক মুসলমান হয়ে যাচ্ছে মনে করে খুব কড়া করে

একটি চিঠি লিখলেন। পরে অবশ্যি সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরে খুশী হয়ে বললেন যে তিনি তাকে ব্যারনেট উপাধি পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। বিয়েটা জাঁকজমক করে বেশ ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল। বেশ সুখেই কেটেছিলো ওদের জীবন। ওদের একটি মেয়ে হয়েছিলো, নাম ক্যাথারিন অরোরা, যে কিটি কার্কপ্যাট্রিক নামে বেশী পরিচিত ছিলো। তার কথা কার্লাইল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন। কার্কপ্যাট্রিক হায়দ্রাবাদকে ইংরেজের আওতায় এনে ইতিহাসে নাম রেখে গেছে। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাকে হাশমত জঙ্ উপাধি দিয়েছিলেন। কার্কপাট্রিক তার বৌকে একটি সুন্দর প্রাসাদ তৈরী করে দিয়েছিলো। তার নাম রংমহল। সার জর্জ য়ূল যখন রেসিডেন্ট ছিলো হায়দ্রাবাদে তখন তারই আদেশে প্রাসাদটি ভেঙে দেওয়া হয়। খয়রুন্নিসার স্মৃতি হিসেবে এখন পড়ে আছে শুধু রংমহলের বাগান।”

সেদিন রাত্তিরে আর বুড়ো বিল বাওয়ারের কথা মনে রইলো না অরুণ আর আর্থারের। ওরা একটি চীনে হোটেলে নৈশভোজন করলো, চৌরঙ্গির এক বার্-এ মদ্যপান করলো, তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু বাবলাপোতায় তাদের কথা মনে পড়লো বুড়ো বিল বাওয়ারের।

বাংলোর সামনের এক ফালি ফাঁকা জায়গায় তখন সংকীর্তনের আসর বসেছে। প্রতিবেশীরা খুব খুশী। তাদের বুড়ো সায়েব টাকা পাচ্ছে অনেক।

কিন্তু বুড়ো সায়েব বারান্দায় বেশীক্ষণ বসতে পারলো না। শরীর ভালো লাগছে না তার। বড়ো বেশী-মনে পড়লো রেজি আর ডোরার কথা, আর মনে পড়লো স্বর্গীয় স্ত্রী সারা-র কথা।

সে চিঠির প্যাড বার করে, কলম খুলে চিঠি লিখতে বসে গেল আর্থার কলিন্সের কাছে।

চিঠি শেষ করে বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

বাইরে সংকীর্তনের আসর তখনো ভাঙে নি। বাবলাপোতার দু' মাইল

পশ্চিমে ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। সে পথ বেয়ে গম গম করে চলে গেল মাঝরাতের মালগাড়ি।

অরুণ—পুরো নাম ভিক্টর অরুণ বোস—চাকরি করতো এক বিলিতী মার্কেন্টাইল ফার্মে। মাইনে খুব সাধারণ, তার একলার চলে যেতো। থাকতো পার্ক সার্কাসের এক গলির ভেতর পুরোনো বাড়ির দোতলায় একলা একটি ঘর নিয়ে।

ওরা বাবলাপোতা থেকে ঘুরে আসবার দিন দুই পর একদিন সকাল বেলা আর্থার কলিন্স এসে উপস্থিত হোলো তার ঘরে।

এসে একটি চিঠি দিলো তার হাতে।

বললে, "পড়ে দেখ।"

চিঠি খুলে অরুণ দেখে, লিখেছে বিল বাওয়ার।

"মাই ডিয়ার আর্থার আর অরুণ।—তোমরা যাওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকে কিরকম একটা অসোয়াস্তি বোধ করছি। শরীরটা ভালো নেই। খুব সকাল করেই ঘুমুতে যাচ্ছি। আমায় একটি অনুগ্রহ করবে? আমার ছেলে রেজি আর মেয়ে ডোরা থাকতো বেগম বাহার লেন্‌এ। ঠিকানা আমার মনে নেই। তবে সে রাস্তায় পেণ্ডেলবারি ম্যানশান্‌স্‌এ থাকে আমার বন্ধু বুড়ো জেঙ্কিন্‌স্। তার কাছে খোঁজ কোরো। সে বলতে পারবে।

আশা করি তোমরা শিগ্‌গিরই আবার আসবে।—উইলিয়াম বাওয়ার।"

অরুণ চিঠি পড়ে আর্থারকে ফিরিয়ে দিলো।

আর্থার আস্তে আস্তে বললো, "বুড়ো বিল বাওয়ার আর নেই।"

"কি?"

"হ্যাঁ। চিঠি লিখে রেখে সেই যে ঘুমিয়ে পড়লো, আর জাগে নি, মারা গেছে সেই ঘুমের মধ্যেই। রাত্তিরে কেউ জানতে পারে নি। সকাল বেলা সবাই দেখে সে নিথর হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। বাবলাপোতা থেকে একটি লোক এসে কাল এটি দিয়ে গেছে।"

অরুণ চুপ করে রইলো।

"চলো, বেগম বাহার লেন থেকে ঘুরে আসি।"

"সেটি কোথায়?"

"এলিয়াট রোডের ওদিকে—।"

এলিয়াট রোডের মোড় ফিরে খানিকটা এগিয়ে গেলে 'প্রিমরোজ বার্ এ্যাণ্ড রেস্তর্ঁা।' তার পাশ দিয়ে ওয়েলেসলি অঞ্চলের দরিদ্র ফিরিঙ্গী-বস্তির ভিতর ঢুকে গেছে বেগম বাহার লেন। সে পথ ধরে এঁকে বেঁকে খানিকটা এগিয়ে, ফেং-শি-চিয়েনের লণ্ড্রি ডাইনে রেখে, মহীউদ্দীন দরজির দোকান পেছনে ফেলে, সরয়ূনন্দন পাঁড়ের পানের গুমটি পেরিয়ে এলেই সামনে পড়ে বহুদিনকার পুরোণো দেওয়াল-থেকে-প্লাস্টার-খসে-পড়া জীর্ণ তেতলা বাড়ি, নোংরা দেওয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা—পেণ্ডেলবারি ম্যানশানস্। সামনে পড়ে আধো অন্ধকার সিঁড়ি। সিঁড়ির এপাশে ওপাশে একতলা দোতলা তেতলায় দেড়খানা দু'খানা রুমের ছোটো ছোটো ফ্ল্যাট।

সে বাড়িতে থাকে বুড়ো জ্যাসপার আর তার বৌ, দু'জনেই ঝড়ের রাত না ঘুমিয়ে কাটানো বিশীর্ণ পাখির মতো দেখতে। আর থাকে জ্যাসপারের ঝলমলো মেয়ে ন্যান্সি। ন্যান্সির চাইতেও দেখতে ভালো সেই মেয়েটি যার নাম জুডি, সেও থাকে সেখানে। আর থাকে লিলি, পলিন, হেন্‌রি, জীন, ডিক, মিলড্রেড আর জর্জ, ববি, আর্থার আর অলগা আর রোজমারী আর জুলিয়া। কখনো সখনো দেখা যায় দু'একজন ফিরিঙ্গী বনে যাওয়া বাঙালী বা পাঞ্জাবীকে, যার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে কোনো না কোনো এক ফিরিঙ্গী মেয়ে।

ট্রাম লাইন থেকে এ অঞ্চলটা বেশ খানিকটা দূরে। এ পথে নেই যানবাহনের হর্ন-আর-বেল্ মুখর আসা-যাওয়া। সকাল বেলায় মাঝবয়েসীরা খাকি হাফপ্যাণ্ট আর হাতকাটা গেঞ্জি পরে পোষা কুকুর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। হানিফ শেখের চায়ের দোকানের সামনের লম্বা বেঞ্চিতে বসে আধখানা

নান্-রুটি দিয়ে এক মগ চা খেতে খেতে বুড়ো বিল বাওয়ারের ছেলেবেলার বন্ধু বুড়ো জেঙ্কিন্স্ নন্নুখলিফাকে শোনায় বিলেতের কেণ্ট না সারে কোথায় যেন তার লর্ড-বংশাবতংশ জ্ঞাতিরা আছে, তাদের কাহিনী। তেতলার পর্দা ঝোলানো জানলার ভেতর থেকে মেয়েলী গলার ডাক ভেসে আসে—জনি ডার্লিং, আটটা বাজলো, তোমার ব্রেকফাস্ট রেডি।.........

আটটা বাজে, সাড়ে আটটা বাজে,—শেয়ালদার লরেটার বাস এসে হর্ণ বাজায়, হৈ চৈ করে এবাড়ি ওবাড়ি থেকে ছুটে আসে সাদা জিনের ফ্রকের উপর লাল টাই আঁটা, লাল বেল্ট-বাঁধা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেমেয়েরা, এক ঝাঁক কলকণ্ঠ পায়রার মতো। ন'টা বাজে, সাড়ে ন'টা বাজে,—কোটবিহীন শার্টে টাই এঁটে মাথায় হ্যাট চাপিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ে ছেলেরা, আর বেরিয়ে পড়ে রংদার ফ্রক আর স্কার্ট-পরা, ঠোঁটে লিপস্টিক, গালে রুজ মাখা কাজল-চোখ পাণ্ডুর-মুখ মেয়েরা।

পেশার আভিজাত্য নেই এ পাড়ার কোনো লোকের। ছেলেরা হয় সেলস্ম্যান নয়তো বা রেলের কারখানার ফোরম্যান কিম্বা কাস্টমস্এর সামান্য কর্মচারী। মেয়েরা সবাই টাইপিস্ট, টেলিফোন গার্ল, নয়তো বা শপ-এসিস্ট্যাণ্ট। কাজ করে যতো জনা, তার চেয়ে অনেক বেশী আছে কাজ-চলে-যাওয়া কাজ-না-পাওয়া বেকার। তারাও বেরিয়ে পড়ে কাজের খোঁজে, নয়তো বা অলস দুপুর বাড়ি বসে কাটিয়ে দেয় অলস নিদ্রায়, কিম্বা গ্রামোফোন বাজিয়ে অথবা আমেরিকান ছবির গানের কলি গুনগুনিয়ে বা শীষ দিয়ে।

অলস দুপুর গড়িয়ে আসে মলিন অপরাহ্ণে। অপরাহ্ণ মিলিয়ে যায় ধূসর সন্ধ্যায়। পাণ্ডুর মুখ আরো পাণ্ডুর করে একে একে বাড়ি ফিরে আসে টেলিফোন গার্ল, টাইপিস্ট, রিসেপশানিস্ট, ফোরম্যান, সেলস্ম্যান আর শপ-এসিস্ট্যাণ্টের দল। তিন-পুরুষের পুরোনো প্র্যাম ঠেলে পথে ঘুরে বেড়ায় জীর্ণ ফ্রক পরা রোগা রোগা মায়েরা আর দূরের এক ফালি আকাশে সার বেঁধে উড়ে চলে যায় বকের পাঁতি।

বুড়ো জেঙ্কিন্‌স্‌কে খুঁজে বার করতে কোনো অস্থবিধে হোলো না আর্থার আর অরুণের।

সে তখন হানিফ শেখের চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসে আছে। একজনকে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দিলো।

ওর কাছে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিলো আর্থার আর অরুণ।

বললো, "উইলিয়াম বাওয়ার আমাদের পাঠিয়েছে তোমার কাছে।"

"উইলিয়াম বাওয়ার?" ভুরু কুঁচকালো বুড়ো জেঙ্কিন্‌স্।

"বাবলাপোতার উইলিয়াম বাওয়ার।"

"ও—। বিল! বিল বাওয়ার! বোসো, বোসো।"

বুড়ো জেঙ্কিন্‌স্ বেঞ্চির পাশে জায়গা করে দিলো।

"কি রকম আছে সে? কদ্দিন খবর পাইনি তার! ভালো আছে তো?"

"ভালো ছিলো। এখন আর নেই।"

"কি রকম।"

"সে মারা গেছে।"

"মারা গেছে!" চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো জেঙ্কিন্‌স্। গলার আওয়াজ এক স্বরগ্রাম নেমে এলো।

"কবে?"

"পরশু।"

"খুব দুঃখিত হ'লাম শুনে। খুব বন্ধু ছিলাম আমরা। একই মেয়ের সঙ্গে একই সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলাম। সারা' কিন্তু ভালোবাসলো ওকেই। আমি খুব খুশী হয়ে ওর বিয়েতে বেস্ট-ম্যান হয়েছিলাম। ওদের বিবাহিত জীবনটা খুব সুখের হয়েছিলো। আমি আর বিয়ে করি নি। বড়ো ভালো মেয়ে ছিলো সারা'। ওর ছেলেমেয়েরা কি এসেছে?"

"না। ওদের খবর তো কেউ জানে না। তুমি যদি বলতে পারো, সে জন্তেই তোমার কাছে এলাম," আর্থার বললো।

"ওদের খবর তো আমি জানি না। ওর ছেলে রেজি এ পাড়া থেকে

উঠে গেছে আজ প্রায় সাত আট বছর হোলো। অনেকদিন আগে কার কাছে যেন শুনেছিলাম সে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। কে বলেছিলো আর মনে নেই।"

"আর মেয়েটি?"

"ডোরা? সে তো রেঙ্গুন চলে গিয়েছিলো ১৯৪১এ। তারপর যুদ্ধের সময় আটকে যায়, আর আসতে পারেনি। শুনেছি সেও যেন কোন এক বার্মিজকে বিয়ে করেছে। তার বর নাকি এখন একজন খুব নামজাদা লোক। তবে সে কে, কোথায় থাকে, ওসব কিছুই জানি না।"

চুপ করে রইলে আর্থার আর অরুণ।

বুড়ো জেঙ্কিন্স্ আস্তে আস্তে বললো, "তা'হলে অতো বড়ো একটি পরিবারের কেউ আর রইলো না দেখছি। ওই পরিবারের কোনো স্মৃতিই রইলো না এ রাস্তার নামটি ছাড়া।"

"এ রাস্তার নাম? সে কি রকম?"

"ও, জানো না বুঝি? এ রাস্তা তো ওদের পরিবারেরই একজনের নামে। অনেকদিন আগে এর নাম ছিলো আয়েশা বাইজীর গলি। এদিকে সাউথ কলিঙ্গা স্ট্রীট, তারপর আনিস্ বার্বার্'স্ লেন, ওদিকে জোড়াতালাও লেন আর মিসির খানসামার লেন। মাঝখানে আয়েশা বাইজীর গলি। ওসব নাম আর আজকাল নেই। এখন নাম বদলে হয়েছে রিপন ষ্ট্রীট, রিপন লেন, মারকুইস্ ষ্ট্রীট, মারকুইস্ লেন।—আর এই আয়েশা বাইজীর গলিতে থাকতো ক্যাপ্টেন রিচার্ড বাওয়ার আর তার বৌ মেহেরুন্নিসা বেগম। মিউটিনির কিছু আগে ওরা দীল্লি থেকে এখানে চলে আসে। ওই যে ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ'র হস্টেলটি দেখছো ওটাই ছিলো ওদের বাড়ি। মিউটিনির সময় রিচার্ড হঠাৎ দীল্লি চলে যায়। তারপর থেকে ওর আর কোনো খোজ খবর পাওয়া যায় নি। কেউ বলে সিপাইরা ওকে পথে মেরে ফেলেছে। কেউ বলে সে দীল্লির বাদশা বাহাদুর শা'র ছেলে মীর্জা জাফরের খুব বিশ্বাসভাজন ছিলো বলে ইংরেজেরা সন্দেহ করে তাকে গুলি করে মেরেছে।—যাই

হোক, মেহেরুন্নিসা বেগম একলাই থাকতো ও বাড়িতে। যদ্দিন বেঁচে ছিলো সেখান থেকে নড়ে নি, কেউ তাকে কোথাও যেতে দেখেনি। মেহেরুন্নিসাকে লোকে বেগম বাওয়ার বলেই জানতো। তাই এ রাস্তার নাম হয়ে গেল বেগম বাওয়ার লেন, লোকের মুখে মুখে যে নাম পরে বেগম বাহার লেন হয়ে দাঁড়ালো।"

"বাওয়ার থেকে বাহার?"

"কলকাতায় এ রকম কতো হয়েছে। রবিসন ষ্ট্রীট থেকে রবিনসন স্ট্রীট, ফাঁসি লেন থেকে ফ্যান্সি লেন, মীরজাফর স্ট্রীট থেকে মীর্জাপুর স্ট্রীট,—সে কি একটা দুটো?"

"যাই হোক, এ নামটি অনেক ভালো—বেগম বাহার লেন।"

কিছুক্ষণ পরে বুড়ো জেঙ্কিন্‌স্ উঠে গেল সেখান থেকে। অরুণ আর আর্থারও উঠে দাঁড়ালো।

"বাওয়ারের পরিচ্ছেদ শেষ হোলো তবে?"

"হ্যাঁ, শেষ হোলো। অন্তত আমাদের কাজ শেষ। এখন দু'পক্ষের এটর্নিরা ট্রাস্টিরা যেখানে যার খোঁজ করবে করুক, আমার আর কোনো আগ্রহ নেই। এবার বাড়ি ফিরে প্রবন্ধটা শেষ করে বোম্বে পাঠিয়ে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত।...ও হাল্লো—। তুমি এখানে?"

অরুণ ফিরে তাকিয়ে দেখে ফুটফুটে একটি মেয়ে। বয়েস বড় জোর কুড়ি কি একুশ হবে। শাদা-জামার নীচে বড়ো-বড়ো-ফুলকাটা স্কার্ট। আর্থারের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

"আমি তো এ রাস্তায়ই থাকি। ওই হস্টেলে।"

"মা-বাবা কোথায়?"

"খড়গপুর।"

"চাকরি করছো?"

"হ্যাঁ—।"

"কোথায় ?"

মেয়েটি নাম করলো একটি বিলিতী মার্চেণ্ট অফিসের।

"আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি'।—অরুণ বোস—ঈভা বারওয়েল।"

অরুণ ঈভার দিকে তাকালো। ঈভা তাকালো অরুণের দিকে।

সেদিন থেকে অরুণের নতুন দিন সুরু।

বেগম বাহার লেন্'এর মতো নিরালা নিস্তব্ধ বহুপুরুষের অভাব অনটনে ঝিমিয়ে পড়া পাড়ায় একটুখানি চাঞ্চল্য জাগে শনিবার বিকেলে। ক্লেম ব্রাউনে নয়তো বা গ্রেল্ ক্লাবে মনসুন বল নয়তো বা ঈস্টার ডান্স কিম্বা অন্য কোনো একটা কিছুর উপলক্ষে নাচের আসর।

ছেলেরা তখন চুপচাপ তাদের স্যুট ইস্তিরি করে, জুতোয় বুরুশ ঘষে। মেয়েরা ছোটে মহীউদ্দীন দরজির দোকানে, ফ্রকটা অল্টার করানো হয়েছে কি না, স্কার্টের ঝুলটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কি না, গাউনের ফেঁসে যাওয়া অংশটি ঠিক মতো রিপু করা হয়েছে কি না দেখতে। বুড়িরা আড় চোখে এদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কুৎসা করে আর মনে মনে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে ভাবে নিজেদের পুরোনো দিনগুলোর কথা। বুড়োরা বসে চ্যাচায়—কী অন্যায় ছেলেটার, আজ রাত্তিরে দু'বোতল বীয়ার খেয়ে টাকা ওড়াতে ওর বাধবে না, যতো পয়সা বাঁচানোর হিসেব বুড়ো বাপের বেলায়, যেন দু'পয়সা দিয়ে দুটো ভাজিনিয়া নাম্বার টেন কিনে দিলে সে দেউলে হয়ে যাবে। চেন্-বাঁধা কুকুরগুলো চ্যাচাতে থাকে আর রাস্তায় বৃথা ডেকে ডেকে ফিরে যায় আইসক্রীম ভেণ্ডার।

তেমনিতরো এক প্রাণ-জেগে-ওঠা শনিবার বিকেলে অরুণ যখন বেরুচ্ছিলো ঈভাকে নিয়ে সিনেমার উদ্দেশে, একটি পুলিশ-ভ্যান এসে থামলো পেণ্ডেলবারি ম্যানশান্'এর সামনে।

গাড়ি থেকে নামলো সার্জেণ্ট পটার আর একজন বাঙালী এস-আই,

আরেকজন সাদা কাপড় পরা, আই-বির লোক হবে হয়তো, আর দু'জন কনস্টেবল।

ভ্যানটা এদের নামিয়ে দিয়ে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে একটি বাঁকের কাছে দাঁড়ালো। কনস্টেবল দু'জন গিয়ে বসলো হানিফ শেখের চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চিতে। সার্জেণ্ট পটার আর সাদা পোষাক পরা লোকটি উঠে এলো দোতলায়।

তেতলায় মিলড্রেডের ঘরে তখন ইংরেজী গানের রেকর্ড বাজছে, ঝুপঝুপ করে জল পড়ছে রোজমারীর বাথরুমে, সঙ্গিনীর অভাবে ফ্রেডির হাত ধরেই হেনরি পাশের ঘরে ওয়ল্‌জ্‌ প্র্যাকটিস্ করছে।

জেঙ্কিনস্ জানলায় দাঁড়িয়ে। বুড়ো জ্যাসপার তখনো তার নোংরা ক্যাম্প-খাটে শুয়ে, সবে মাত্র ঘুম ভেঙেছে তার। বুড়ি ডিকিনসন ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে গেছে কাঠি-কাবাব কিনতে, যা' দিয়ে ডিনার সারতে হবে রাত্তিরে।

এমন সময় ঠক ঠক করাঘাত শোনা গেল দোতলার একটি ঘরের দরজায়।

শুধু অন্তর্বাস পরা অবস্থাতেই রোজমারীর ঘরে ছুটে এলো ইসাবেল, দুমদাম করে করাঘাত হানলো বাথরুমের দরজায়।

"রোজমারী! কাম্ অন্ কুইক্। সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে।"

"একটু দাঁড়াও, চানটা সেরে নি—।"

"না, না, বেরিয়ে এসো, এক্ষুনি।"

শুধু বড়ো তোয়ালে জড়িয়েই বেরিয়ে এলো রোজমারী।

"হোয়াট্'স্ হ্যাপেণ্ড? কী হয়েছে?"

"ও মাই মাই—। শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না, রিয়্যালি।"

"কেন? হয়েছে কি?"

"পুলিশ এসেছে।"

"পুলিশ? কোথায়?"

"জুডির ঘরে।"

"জুডি? জুডি ফিশার? হোয়াট্ অন্ আর্থ কর্?"

"আমি তোমায় বলিনি? জুডি যেরকম মেয়ে, একদিন না একদিন সে—"

"কাম, লেট্‌স্ গো এ্যাণ্ড সী। চলো দেখে আসিগে' কী ব্যাপার।"

প্রায় বেরিয়ে পড়ছিলো রোজমারী, হঠাৎ খেয়াল হোলো যে তার গায়ে জড়ানো শুধু একটি বড়ো তোয়ালে।

একটি তীক্ষ্ণ কুহুধ্বনি ছেড়ে সে শোয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

একতলা থেকে মিসেস গাম্বার তরতর করে উঠে এলো জ্যাসপারের ঘরে।

এসেই হাঁক দিয়ে ডাকলো জ্যাসপারের বৌকে।

"জানো? জুডির ঘরে পুলিশ এসেছে।"

চায়ের জল চড়াচ্ছিলো জ্যাসপারের বৌ। কেটলি রেখে বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে।

"জুডির ঘরে পুলিশ? কেন?"

"জুডির ঘরে পুলিশ!" চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলো জ্যাসপারের সুন্দর দেখতে মেয়ে ন্যান্সি। অপেক্ষা করলো না আর, বেরিয়ে চলে গেল, ঢুকলো গিয়ে অলগার ঘরে।

বুড়ো জ্যাসপার শুয়েছিলো ওপাশ ফিরে। জ্যাসপারের বৌ এসে গুঁতো মারলো তাকে।

"শুনছো হানী! একটা হরিব্‌ল্ ব্যাপার হয়েছে—।"

"তাই নাকি?" এপাশ ফিরে হাই তুলে বুড়ো জ্যাসপার বললো।

"জুডির ঘরে পুলিশ এসেছে।"

"জুডির কাছে তো অনেকেই আসে," বললো নির্বিকার জ্যাসপার।

"ডোণ্ট্ বি সিলি। অন্য সবাই যে জন্যে আসে, পুলিশ সে জন্যে আসে না।"

"তাই নাকি? তা'হলে?"

"এরকম দুশ্চরিত্র মেয়ে," বললো জ্যাসপারের বৌ, "ও একদিন না একদিন যে বিপদে পড়বে আমি জানতাম। সব সময় আজ একজনের সঙ্গে, কাল একজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো—।"

"ঘুরে বেড়ালেই যদি দুশ্চরিত্র হয়, তা' হলে তো তোমার মেয়েকেও দুশ্চরিত্র বলতে হয়," বললো জ্যাসপার।

উত্তপ্ত হয়ে উঠলো জ্যাসপারের বৌ।

"আমার মেয়ে ঘুরে বেড়ায় আমাদের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের ছেলেদের সঙ্গে, যাদের প্রত্যেককে আমরা চিনি। ও আমায় না বলে কারো সঙ্গে বেরোয় না। ভালো ছেলে যে নয়, তার সঙ্গে মিশতে আমি সব সময় মানা করে দিই ন্যান্সিকে—।"

"একটু ঘুরে ফিরে না বেড়ালে বিয়ের বর জুটবে কোত্থেকে," বললো মিসেস গাম্বার।

"জুডিও যাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে," বললো জ্যাসপার, "তাদের মধ্যে থেকে বিয়ের বর জুটে যাবে বলে সে নিশ্চয়ই আশা করে —।"

"বিয়ের বর জোটাবে জুডি?" জ্যাসপারের বৌ বাঁকা হাসি হাসলো। "ওর বন্ধু তো আমেরিকান, ইংলিশম্যান, ফ্রেঞ্চ্ম্যান—ওদের ভেতর থেকে জুডির বর জুটলেই হয়েছে। জুডির যদি ইউরোপীয়ান বর জোটে তো আমার ন্যান্সির বর জুটবে জাপানের রয়্যাল ফ্যামিলি থেকে—।"

"কেন, তোমার ন্যান্সিকেও তো দেখলাম একজন আমেরিকানের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে কিছুদিন।"

"ভুল অনেকেই করে। ন্যান্সিও করেছে। ভাগ্যিস বেশীদিন ঘোরে নি। ওরা কী চীজ সে তো আমরা দু'দিনেই টের পেয়েছি।"

"ন্যান্সির সঙ্গে একদিন জুডিকে দেখে জুডিকেই যদি ওর পছন্দ না হয়ে যেতো তা' হলে তো ন্যান্সিই ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো শেষ পর্যন্ত।"

"কোনোদিন না। যে মুহূর্তে ন্যান্সি টের পেতো যে আমেরিকানটির মতলব ভালো নয় সে মুহূর্তেই সে সরে আসতো। ন্যান্সি জুডির মতো নয়। জুডি

তো ভেবেছিলো ওকে লোভ দেখিয়ে হাত করে বিয়ে করে ফেলে আমেরিকা চলে যাবে। দেখলে তো কী হোলো শেষ পর্যন্ত ?”

“সে আশা তোমার মেয়েও করেছিলো ডার্লিং,” জ্যাসপার বললো তার বৌকে। “নেহাৎ জুডি ওকে ন্যান্সির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বলেই তোমার এই আক্রোশ—।”

“কক্ষনো নয়—।”

পারিবারিক কলহ সুরু হোলো জ্যাসপারের ঘরে।

এক পা এক পা করে পেছন দিকে সরে এসে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মিসেস গাম্বার।

দরজায় করাঘাত শুনে দরজা খুলে দিয়েছিলো জুডি ফিশার।

সার্জেণ্ট পটারকে সে চিনতো।

হেসে বললো, “হালো, তুমি হঠাৎ কোত্থেকে ?”

তারপর পেছনে একজন অপরিচিতকে দেখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, “ও কে ? কি চায় ও ?”

“আমরা ভেতরে আসতে পারি ?” জিজ্ঞেস করলো সার্জেণ্ট পটার।

“এসো,” বললো জুডি, “কিন্তু ব্যাপার কি ?”

ভেতরে এসে দুটো চেয়ার টেনে বসলো ওরা দু'জন।

পটার বললো, “এ আমার বন্ধু, ঘোষ। ডি-ডি'র লোক।—এ হোলো জুডি।”

জুডি নড্ করলো।

“আচ্ছা, আঁদ্রে তেলিয়ের বলে কাউকে তুমি চেনো ?” জিজ্ঞেস করলো অফিসার ঘোষ।

“আঁদ্রে তেলিয়ের ?” ফ্যাকাশে হয়ে গেল জুডির মুখ। “হ্যাঁ, চিনি।”

“কিছু জানো তার সম্বন্ধে ? কে সে ?”

"কেন, সে আমার বন্ধু। একজন ফ্রেঞ্চম্যান—।"

"বটে!"

তেতলার একটি ঘরে ন্যান্সি কথা বলছিলো অলগার সঙ্গে।

"আমি তোমায় আগেই বলেছি," ন্যান্সি বললো, "জুডি একদিন বিপদে পড়বে তার এই সব ইউরোপীয়ান বন্ধুবান্ধবদের জন্যে।"

"ওদের সঙ্গে মেশে কেন?" অলগা বললো।

"ওরা একজন কেউ জুডিকে বিয়ে করবে, এ আশায়।"

"কেন, আমাদের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ছেলে নেই?"

"জুডি বিয়ে করবে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান? ওকে বলে দেখ! তোমার চুল উপড়ে নেবে। কি ভেবেছো তুমি? এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানেরা মানুষ? ওরা না ইণ্ডিয়ান না ইংলিশ—তাই বলে জুডি। জুডি বলে ওদের কোনো অতীত নেই, কোনো ভবিষ্যত নেই। জুডি বলে সে বিয়ে করবে ইউরোপীয়ান। জুডি বলে এখানে সে থাকবে না, চলে যাবে ইউরোপে। এসব নেটিভ দেশে ভদ্রলোক থাকতে পারে না বলেই জুডির ধারণা।"

"জুডি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে হয়ে এসব কথা বলে কোন মুখে?"

"জুডি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান? জুডিকে গিয়ে বলো, ও তোমার চোখ উপড়ে ফেলবে। জুডি বলে জুডি ইতালিয়ান।"

"ইতালিয়ান?"

"হ্যাঁ, ওর বাবা নাকি ইতালিয়ান। ওর মা অবশ্যি কড়েয়া রোডের কালো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান! কিন্তু তাতে কি? বাপের যা জাত, মেয়েরও তাই জাত। অন্তত জুডি তাই বলে। জুডি ফিশারের পুরো নাম জানো না? জুডি ফিশার মার্সিলেনি। ফিশার নাকি ওর মায়ের পদবী।

"ও, এই ব্যাপার? জুডি এ জন্যে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেদের সঙ্গে মেশে না?"

"হ্যাঁ। একটার পর একটা কত কি দেখলাম। মিশিগানের অ্যালেনবি,

সেই জুটমিলের স্কচ ম্যানেজার ম্যাকফেড্রন, ইতালিয়ান টুরিস্ট সিন্তর গু জর্জিও, এখন সায়গনের ফ্রেঞ্চ্ম্যান আঁদ্রে তেলিয়ের।"

"কিন্তু এত দেখে শুনেও জুডির ধারণা বদলায় নি?" অলগা বললো, "ড্যানিয়েলদের কথা জানো? ওরা সাউথ আফ্রিকা গিয়েছিলো সেখানে সেটেল ডাউন করবে বলে, সেদিন ফিরে এসেছে। মিসেস ড্যানিয়েল বললে ওখানকার ইংলিশম্যানেরা নাকি এদের সবাইকে ইণ্ডিয়ান বলে পাত্তা দিতো না, এদের সঙ্গে মিশতো না। এরা যখন বোঝাতে গেল যে এরা ইংরেজ পূর্বপুরুষদের বংশধর, তখন দেখে আরো ক্যাশাদ, ওরা এদের কালার্ড্ বলে অভিহিত করছে, হাফ-কাস্ট বলে নাক সিঁটকোচ্ছে। ওরা বেশীদিন টিকতেই পারলো না ও দেশে।"

"শুধু ওরা কেন, এই তো সেদিন উইকৃহ্যামরা আবার ফিরে এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। সলোমনরা চলে এসেছে ইসরায়েল থেকে। এমন কি মিসেস জনসনও ফিরে এসেছে বিলেত থেকে। সবাই বলছে কাজ নেই বাবা হাফ-ইউরোপীয়ান হয়ে ইউরোপে থেকে। তার চাইতে ইণ্ডিয়ান হয়ে ইণ্ডিয়ায় থাকা অনেক বেশী গৌরবের।"

"চলো গিয়ে দেখে আসি জুডির ঘরে কী হচ্ছে," অলগা বললো।

"না, কোনো দরকার নেই," বললো ন্যান্সি। "আবার আমাদের নিয়ে টানাটানি করবে। রাত্তিরে গ্রেল্ ক্লাবে যাচ্ছি। নার্ভটা নষ্ট হলে সারা সন্ধ্যেটাই মাটি হবে।"

ন্যান্সি চলে গেল।

রোজমারী আর ইসাবেল এসে উপস্থিত হোলো অলগার ঘরে।

"কি হয়েছে জানো?"

"হ্যাঁ, এই মাত্র শুনলাম। ন্যান্সি এসে বললো। সে বড্ড নিন্দে করলো জুডির। বড্ড হিংসুটে মেয়েটি।"

"হবেই তো," রোজমারী বললো, "জুডি ন্যান্সির চাইতে যে অনেক বেশী সুন্দর দেখতে সে ন্যান্সি সইতে পারে না।"

"আরো অনেক ব্যাপার আছে," ইসাবেল যোগ দিলো ওদের সঙ্গে, "ন্যান্সি প্রথম প্রেমে পড়লো সেই আমেরিকান এ্যালেনবির সঙ্গে। জুডির সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দিতে এ্যালেনবি জুডির প্রেমে পড়ে গেল। ন্যান্সি অনেক কষ্ট করে অর্ডিন্যান্স ক্লাবে ভাব করলো ম্যাকফেড্রনের সঙ্গে। জুডিকে দেখে সে জুডির সঙ্গে সেধে আলাপ করে এক রাউণ্ড নাচবার পর তার সঙ্গে এমন জমে গেল যে ন্যান্সি কোনো পাত্তাই পেলো না তার কাছে। তারপর যেই ট্র্যাভেল এজেণ্টের অফিসে ন্যান্সি কাজ করতো, সেখানে সে জুটিয়ে নিলো এক ইতালিয়ান টুরিস্টকে। কিছুদিন পর দেখা গেল ইতালিয়ানটি দেখা করতে আসছে জুডির সঙ্গে। আর তেতলার জানলায় বসে ন্যান্সি আঙুল কামড়াচ্ছে।"

"ন্যান্সি তো শুনি ইউরোপীয়ানদের দু'চোখে দেখতে পারে না," বললো রোজমারী, "ও বলে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেদের মতো ছেলে হয় না। এত ভদ্র, এত পত্নীবৎসল, এত বাধ্য—।"

"এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেরা অন্য কারো চাইতে বেশী ভালো নয়—।"

"ইংলিশম্যান কি আমেরিকান জোটাতে পারলে ন্যান্সির মতামত নিশ্চয়ই একটু অন্যরকম হোতো।"

"হ্যাঁ, ছেলেরা সবই সমান। সে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই হোক, ফ্রেঞ্চম্যানই হোক, বাঙালীই হোক আর চাইনীজই হোক।"

"ন্যান্সি তো ইউরোপীয়ান-হেটার হবেই। ও দেখতে সুন্দর হলে কী হবে, ওর গায়ের রঙ যে বাঙালী মেয়েদের মতো ময়লা, চোখ দুটি কালো, মাথার চুল কালো। শাড়ি পড়লে ওকে যে কী মিষ্টি দেখায় জানো না। ও জানে ওকে কোনো ইউরোপীয়ান বিয়ে করবে না। আর জুডিকে দেখ, ধপধপে ফরসা, অলিভ-স্কিন, সোনালী চুল, না বলে দিলে কে বুঝবে যে ও

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ওর ইংরেজিও কী সুন্দর, পরিষ্কার। ন্যান্সির ইংরেজি স্ল্যাং, এ্যাক্‌সেণ্টেড্‌—।"

"আর ন্যান্সি যাকে জোটায়, জুডি তাকে ছিনিয়ে নেয়—।"

অলগা, ইসাবেল, রোজমারী হেসে গড়িয়ে পড়লো।

"সাইগন থেকে আসা ওই ফ্রেঞ্চম্যানটিকেও কি জুডি ন্যান্সির কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছে না কি," জিজ্ঞেস করলো রোজমারী।

"জানি না। ওকে বোধ হয় জুডি নিজেই কোত্থেকে যেন জুটিয়েছে," অলগা বললো. "ন্যান্সি এখনো ফ্রেঞ্চম্যান পর্যন্ত এগোয় নি।"

সার্জেণ্ট পটার কি বলছিলো কানে ঢুকছিলো না জুডির।

সে ভাবছিলো আঁদ্রে তেলিয়েরের কথা।

মোটে মাসখানেকের পরিচয়, তবু মনে হয় যেন কতোদিনকার চেনা।

সেদিন এক শনিবার রাত্রি। প্রথম বর্ষা নেমেছে কলকাতায়। ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ'তে মনসুন-বল্‌। জুডিকে সেখানে নিয়ে গেল তেতলার হেনরি জার্ডিন।……

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেদের সঙ্গে জুডি যে মিশতে চাইতো না তা'নয়, কিন্তু মিশে ভালো লাগবার মতো ছেলে সে পেতো না একজনও। জুডি সিনিয়ার কেম্বি জ পাশ, এক বছর লরেটোতে পড়েছে, এস-সি'তে ফ্রেঞ্চ্‌ নিয়েছিলো, অল্প একআধটু বলতেও পারে। মেরিমি, ফ্লোবেয়ার, হুগো, মোপাসাঁ, মলিয়ের, তুর্গেনিভ, শেকভ প্রভৃতি বহু কন্টিনেণ্ট্যাল সাহিত্যিকের বই পড়েছে। গগ্যাঁ, মাতিস, পিকাসো, রেনোয়ারের নাম জানে। সার্ত্রে, আঁদ্রে জিদ সম্বন্ধে এখানে সেখানে দু'একটা প্রবন্ধ পড়েছে। ফাদেয়েভ, এরেনবুর্গ, কোপ্লাইয়াভা প্রভৃতির লেখা সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়েছে সম্প্রতি।

তার একটুকুও ভালো লাগতো না, আশেপাশের যেসব ছেলেদের দেখা

যেতো, তাদের। হাল্কা ইংরেজিতে তাদের আলোচনার বিষয় শুধু হলি-উডের ছবি, অমুক মিউজিক্যাল পিকচারের অমুক স্টারের ল্যাস্যময় গান, শনিবারের রেসের ঘোড়ার টিপস্, পোশাকের নতুনতম আমেরিকান ফ্যাশান, ইংরেজি বলায় সাম্প্রতিকতম আমেরিকান উচ্চারণ ভঙ্গী, আর তাদের পঠিতব্য বিষয় পিটার চেইনী বা গার্ডিনারের ডিটেকটিভ উপন্যাস, ওয়েস্টার্ন গল্প নয়তো বা কমিক্‌স্। একটুকুও ভালো লাগতো না তাদের সঙ্গ। ডান্সে বা সোশিয়্যালে যে সব ভারতীয় বা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলে বা মেয়ে দেখা যেতো সবাই একই ধাঁজের। কখনো সখনো তু' একজন বিদেশীর সঙ্গে আলাপ হলে দেখতো ওদের মধ্যে হয়তো কিছু কৃষ্টি সংস্কৃতির ছাপ আছে। তাই ওদের সঙ্গে বন্ধুত্বও হোতো সহজেই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা যেতো ওদের স্বরূপ। ওদের কাছে জুডির আসল আকর্ষণ আর কিছু নয়, শুধু ওর অনিন্দ্য রূপ।

সেই আমেরিকান এ্যালেনবির সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো ন্যান্সি।

"লুক হিয়ার ম্যান, এ আমার বন্ধু জুডি," বলেছিলো ন্যান্সি, "ওর সঙ্গে তু'এক পাক নেচে নিতে পারো, আমি ততক্ষণে আরেকটি স্কচ খেয়ে নি। আই লাইক টু এন্‌জয়-লাইফ, ম্যান। তবে জুডির সঙ্গে প্রেম কোরো না যেন। শী ইজ এ ফায়ার বল্, সি—? পুড়ে মরবে। তোমার গার্ল হলাম আমি, বুঝেছো ম্যান? এটা নিউইয়র্ক নয় যে তুমি ঘণ্টায় ঘণ্টায় মেয়ে বদলাবে। দিস ইজ ক্যালকাটা। অফ কোর্স, তুমি আমায় যখন স্টেটস্ এ নিয়ে যাবে, তখন আমি তোমায় যতো খুশি মেয়ে পাল্টাতে দেবো, প্রোভাইডেড তুমি প্রত্যেকটির শেষে আমার কাছে একবার ফিরে আসো। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড, ম্যান? — লা, লা, লা, লা, লা, লা,···আই ওয়াণ্ট টু সিং—আণ্ডার এ মাইয়্যামি মূ-উ-উ-ন,······," গুনগুনিয়ে গান ধরেছিলো মাতাল হয়ে ওঠা ন্যান্সি।

ডান হাতে জুডির কোমর জড়িয়ে বাঁ হাতের পাতায় জুডির ডান হাতটি

ধরে ফক্সট্রটের তালে তালে নাচিয়েদের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিলো এ্যালেনবি।

"তুমি খুব ভালো নাচতে পারো," হেসে বলেছিলো জুডি।

"ভালো করে শেখার সময় পাইনি," উত্তর দিলো এ্যালেনবি। "হার্ভার্ডের ভালো ছাত্র ছিলাম আমি। পড়তে পড়তে যুদ্ধে চলে গিয়েছিলাম, যুদ্ধের পর এই চাকরিতে ঢুকেছি।"

"হার্ভার্ডে পড়তে তুমি? কি পড়তে?"

অবাক হয়েছিলো এ্যালেনবি। হার্ভার্ডের নাম শুনেছে এরকম এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে সে দেখেনি। একজন তো জিজ্ঞেস করে বসেছিল, "হার্ভার্ড বুঝি খুব নাম করা একটি নাইট-স্পট?"

"ইংরেজী সাহিত্য," আস্তে আস্তে উত্তর দিলো এ্যালেনবি।

হঠাৎ খুব ভাব জমে গেল জুডির সঙ্গে। সে প্রায়ই আসতো জুডির বাড়ি। ন্যান্সি বা অন্য কোনো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের ধারে কাছেও ঘেঁষতো না।

"তোমাদের সাহিত্য এত হাল্কা কেন," জুডি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো তাকে।

এ্যালেনবি যেন একটু অবাক হোলো।

"কি পড়েছো আমাদের সাহিত্যের?"

জুডি নাম করলো কয়েকটা বইয়ের। সবই আমেরিকার বেস্ট্ সেলার।

এ্যালেনবি হেসে বললো, "ওগুলো বেস্ট্ সেলার কিন্তু আমাদের সাহিত্যের মাপকাঠি নয়। হুইটম্যানের কবিতা পড়েছো? মার্ক টোয়েনের বই? ব্রেট-হার্ট, ও-হেনরির গল্প? হাওয়ার্ড ফাস্ট, হেমিংওয়ের উপন্যাস? ওগুলো পড়লে দেখবে আরেকটি আমেরিকার খোঁজ পেয়ে গেছ।"

"আমায় এনে দেবে ওদের বই?"

অ্যালেনবি বললো যে, এর পর যেদিন আসবে সেদিন এনে দেবে।

"অসুবিধে হবে না তো?"

কিচ্ছু না, বললো এ্যালেনবি। সে ইউ-এস-আই-এস-এ চাকরি করে। ওদের একটি ভালো লাইব্রেরি আছে। সেখান থেকে এনে দেবে।

কিন্তু এই যোগাযোগ বেশীদিন আর রইলো না।

এ্যালেনবি চলে গেল কোরিয়ায়। সেখানে তখন যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে।

কিছুদিন পর খবর এলো এ্যালেনবি মারা গেছে কোরিয়ায়।

সে কথা জুডি আর কাউকে বললো না।

"তোমার আমেরিকান ফ্রেণ্ডটি কোথায়," ন্যান্সি বাঁকা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করেছিলো একদিন, "আর দেখি না যে?"

"চলে গেছে," শুধু এইটুকু বলেছিলো জুডি।

"ভেগে গেছে? আরে সে তো আমি আগেই জানতাম। কোনো রকম ফ্যাশাদে ফেলে যায় নি তো— !"

কোনো উত্তর দেয়নি জুডি। শুধু একটি আগুন-কটাক্ষ হেনেছিলো ন্যান্সির দিকে।

ম্যাকফেড্রনের সঙ্গে আলাপ অর্ডিন্যান্স ক্লাবে। ন্যান্সি ম্যাকফেড্রনের চারদিকে মিন-মিন করে বেড়াচ্ছিলো। তাক্ত হয়ে তাকে এড়ানোর জন্যে ম্যাকফেড্রন স্থির করলো সামনে যাকে পাবে তার সঙ্গেই নাচবে।

সামনে পেলো জুডিকে।

"এ নাচটি পেতে পারি কি?"

জুডি মিষ্টি হাসলো।

দু'এক চক্কর নেচে ম্যাকফেড্রন জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান?

"হ্যাঁ। কেন?"

"তোমায় দেখে বা তোমার কথা শুনে মনে হয় না।"

"আমার বাবা ছিলেন ইতালিয়ান, মা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।"

"ও। দেখ, ওই যে রং-ময়লা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটি, কি যেন তার

নাম? হ্যাঁ, ন্যান্সি। এত 'ম্যান' 'ম্যান' করে কথা বলে যে গা ঘিন-ঘিন করে।"

"মেয়েটি কিন্তু ভালো," জুডি বললো।

"কি জানি, আমার সহ্য হয় না। আমি স্কচম্যান। দক্ষিণের ইংলিশ-ম্যানরা ওদের সইতে পারে, আমি পারি না।"

"ও। তুমি বুঝি ওয়ল্টার স্কটের দেশের লোক?"

"ওয়ল্টার স্কট? তুমি পড়েছো ওর বই?"

"হ্যাঁ।"

ম্যাকফেড্রনের আনন্দ আর ধরে না।

"আর কার বই পড়েছো?"

"সম্প্রতি ক্রনিন পড়ছি।"

ম্যাকফেড্রন খুব খুশী।

"তুমি যাবে আমাদের দেশে? আই শ্যাল টেক ইউ দেয়াড়ড়ড়।"

সেদিন থেকে বেশ কয়েকটি সন্ধ্যা কাটালো ম্যাকফেড্রনের সঙ্গে। ক্লাবের সব বিলই সই করতো ম্যাকফেড্রন।

কিন্তু মাসের শেষে ম্যাকফেড্রন যখন বিলের হিসেবটা পেলো, আঁতকে উঠে কপালে করাঘাত করে বলে উঠলো, "মাই গুড লড়্ড়্ড্।"

ব্যস, তারপর আর দেখা গেল না ম্যাকফেড্রনকে।

কঞ্জুষ স্কচম্যানদের সম্পর্কে অনেক চুটকি গল্প শুনেছিলো জুডি। ম্যাক-ফেড্রনের অন্তর্ধানে দুঃখিত হয়েছিলো, অবাক হয়নি।

ইতালিয়ান টুরিস্ট সিন্তর ভিত্তোরিও দ্য-জর্জিওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো ক্লেম-ব্রাউনে একটি নাচের আসরে। ইণ্ডিয়া দেখতে এসেছে, দেশে ফিরে গিয়ে একটি বই লিখবে এ দেশ সম্বন্ধে। কোন একটা কাগজের নাকি করেস্-পণ্ডেন্ট? জুডির সঙ্গে আলাপ করে উচ্ছ্বাসময় হয়ে উঠলো।

"তোমার বাবা ইতালিয়ান? দ্যাত ইজ ফাইন। কি পদবী বললে?

মার্সিলেনি ? হাও ইন্তারেস্‌তিং। নেপল্‌স্‌এর মার্সিলেনি ? আমি যে ওদের চিনি, সিন্যরিনা ফিশার। তুমি ইতালিয়ান জানো ? এ ওয়ার্দ অর তু ? ওয়ান্দারফুল ! অ াহ্‌—সিন্যরিনা ফিশার, দ্যাত ইজ হোয়াই তোমার চোখ দেখে আমার মনে পড়ছে নেপল্‌স্‌এর সমুদ্রের কথা, তোমার সোনালী চুলের ঢেউ দেখে মনে পড়ছে পো নদীর স্রোতের কথা ! তোমায় দেখে মনে হচ্ছে আমার দেশ দেহ ধারণ করে আমার সামনে এসে বসেছে, আর মনে হচ্ছে আমি একজন স্বদেশভক্ত পেত্রিয়ত হয়ে উঠেছি। সিন্যরিনা, হোয়েন আই এ্যাম ইন লাভ উইথ্‌ মাই কান্‌ত্রি, আই এ্যাম ইন লাভ উইথ ইউ…”

কথাটা সহজভাবে হেসে উড়িয়ে দিলো জুডি।

“সিন্যরিনা ফিশার, আমি কি তোমার সঙ্গে এসে দেখা করতে পারি ?”

“নিশ্চয়ই, যদি আসো তো আমি খুশীই হবো। এক কাজ করো, কাম এ্যাণ্ড হ্যাভ টি উইথ্‌ মি। কালই এসো কেমন ?”

“তি ? নত্‌ তি, সিন্যরিনা, মেক্‌ ইত্‌ দিনার।”

ডিনার ? চমকে উঠলো জুডি। ভদ্রতা করে না বলতে পারলোনা।

“আচ্ছা, এসো।”

সেদিন রাত্তিরে ন্যান্সি এসে ঝগড়া করলো জুডির সঙ্গে। বললে, “দেখ তোমার যদি অতো শখ তো অন্য বন্ধু খুঁজে বা'র করো। আমি যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করি তাকে নিয়েই টানাটানি কেন ? এ্যালেনবি হোলো, ম্যাকফেড্রন হোলো, এবার জর্জিওকে নিয়ে পড়েছো ?”

জুডি অবাক। সে জানতোই না যে ন্যান্সি ওকে চেনে।

বললো, “তোমার বন্ধু ? আমি তো জানতাম না !”

“হ্যাঁ। জানতে না, ন্যাকা। আমাদের ট্রাভেল-এজেন্টের অফিসে ওর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ওকে নিয়ে এলাম ক্লেমব্রাউনে আর এক ফাঁকে যখন আমি অন্য টেবিলে আরেকজনের সঙ্গে কথা বলতে গেছি, তখন তোমরা বেশ জমিয়ে নিয়েছো। আর আমি ফিরে এসে দেখি আমার টেবিল ফাঁকা, জর্জিও বসে আছে তোমার টেবিলে।”

জুডির মনে পড়লো যে সে একা বসেছিলো তার টেবিলে। তার সঙ্গী নাচতে নেমেছিলো আরেকজনের সঙ্গে।

এমন সময় এক পেলবদেহ বিদেশী এসে দাঁড়িয়েছিলো তার সামনে।

"সিন্যরিনা, আমি তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি?"

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলো জুডি, কারণ লোকটা কথাবার্তায় খুব ভদ্র।

জুডির পরিষ্কার মনে পড়লো যে ন্যান্সিকে সে ওর সঙ্গে দেখেনি।

একটু বিরক্ত হয়ে ন্যান্সিকে বললো, "দেখ, তুমি বরং তোমার চেনাশোনাদের একটা লিস্ট আমায় দিও। আমি তাদের এড়িয়ে চলবো। তা' হলেই হবে তো?"

ন্যান্সি বললো, "লিস্ট-ফিস্ট আমি বুঝি না, এর পর যদি দেখি তুমি আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে জমাতে চাইছো, তাহলে ওখানে সবার সামনেই চুলোচুলি হবে বলে দিচ্ছি।"

দ্য জর্জিও এসে হাজির হোলো তারপরদিন সন্ধ্যের পর। বগলে ছোটো একটা বাণ্ডিল। মুখ রাঙা। দেখেই বোঝা যায় যে মদ খেয়েছে।

বললো, "সিন্যরিনা, হাতে অনেক সময়। হোয়াত শ্যাল উই তক এবাউত? কি গল্প করবো বলো।"

জুডি হেসে বললো, "তোমাদের দেশের আর্টিস্টদের সম্বন্ধে কিছু বলো। এঞ্জেলো, দ্য ভিঞ্চি, বত্তিচেলি আর এখনকার নতুন আর্টিস্ট যারা যারা আছে—"

ভিত্তোরিও দ্য জর্জিওর মুখ দু' ইঞ্চি ফাঁক হোলো। মেয়েটা বলে কি? এই দীর্ঘ রাত, আর সে আলোচনা করবে ওদের সম্বন্ধে, যাদের নাম সে নিজে শুধু পাঠ্য পুস্তকের পাতায়ই পেয়েছে, আর কোনোদিন মাথা ঘামায় নি? এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে দু'চারজন সে যে দেখেনি তা' নয়, কিন্তু ওদের মুখের বুলি তো শুধু বাই মি এ ড্রিঙ্ক, আস্‌ক্‌ মি টু ডিনার, টেক্‌ মি টু দি ডান্স, মদ খাওয়াও, ডিনার খাওয়াও, নাচে নিয়ে চলো—। কিন্তু এ মেয়েটা বলে কি, যার বাপ তার বাপের জন্মে ইতালিয়ান নয় বলেই তার ধারণা।

ভিত্তোরিও এক গাল হাসলো।

তারপর বললো, "সিন্যরিনা, যাদের নাম করছো ওরা সব বাজে লোক। ওরা মারা গেছে কয়েকশো বছর আগে যখন তোমার ঠাকুর্দাও জন্মায় নি। আমি শুধু ইন্তারেস্তেদ্ ইন্ লাইফ্। সুতরাং লেত্ আস তক এবাউত আওয়ারসেলভ্স্। নিজেদের সম্বন্ধেই গল্প করা যাক।" এই বলে বাণ্ডিলটা খুললো।

বাণ্ডিল থেকে বেরুলো একটি ড্রেসিং গাউন আর একজোড়া সিল্কের পায়-জামা স্যুট—সে ছেলেদের সাইজ।

"এসব আবার কি?" জুডি সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

হেসে গড়িয়ে পড়লো ভিত্তোরিও।

"সিন্যরিনা, আমি একজন স্বদেশভক্ত পেত্রিয়ত। তুমি আমার ইতালি পার্সনিফাইড। তোমার ধমনীতে ইতালিয়ান রক্ত, তোমার চোখে নেপ্‌ল্‌স্‌এর নীল সমুদ্রের ছায়া, তোমার চুলে পো-নদীর সোনালী ঢেউ—।"

বেশীদূর আর এগুতে হোলো না সিন্যর ভিত্তোরিও দ্য জর্জিওর উচ্ছ্বাস।

জুডি শক্ত মেয়ে।

জুতো মেরে বার করে দিলো জর্জিওকে।

হৈ-হল্লা হোলো। লোকজন জমলো। কি হয়েছে, কি হয়েছে,—জিজ্ঞেস করলো সবাই।

জুডি কোনো উত্তর দিলো না।

ভিত্তোরিও ইতালিয়ান ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে একটি রিক্সা চেপে চলে গেল।

"কি হয়েছে জুডি," "উপর থেকে অলগা ডেকে জিজ্ঞেস করলো।

তাকে টেনে নিয়ে গেল স্যান্ডি।

চাপা গলায় বললে, "ওসব নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না, অলগা।

কি আর হবে? বুঝতেই পারছো। যাক এসব আর বোলো না কাউকে, জুডি হাজার হোক আমাদের বন্ধু তো!"

তারপর কেটে গেল বছর খানেক আর ক্ষণিক বন্ধুত্বের স্মরণ রেখে গেল অনেকেই। তরুণ বাঙালী অফিসার অমিয় সেনগুপ্ত, মারাঠী ছেলে বালাজী সানে, সুদূর দক্ষিণ দেশের কৃষ্ণমূর্তি আয়ার, পাঞ্জাবের প্রেমপ্রকাশ বর্মা আর আরো কতো কে!

ক্রমশ নিস্পৃহ হয়ে উঠলো জুডি, কাউকে আর ভালো লাগে না। দৈনন্দিন জীবনখানি অফিস আর বাড়ির মধ্যেই সঙ্কুচিত করে আনলো। শুধু কখনো যখন অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে উঠতো সরু গলির গ্যাসের-আলো-টিম-টিম সন্ধ্যা, সিনেমায় নয়তো বা ক্লাবে গিয়ে বসতো তেতলার হেনরি জার্ডিনের সঙ্গে,—যার চেহারা ভালো নয় আর চাকরিটি অত্যন্ত সামান্য বলে এ পাড়ার বা অন্য পাড়ার কোনো ফিরিঙ্গী মেয়ে তাকে আমল দিতে চাইতো না।

হেনরি জার্ডিন জুডির ছেলেবেলার বন্ধু, এক সময় একই স্কুলে পড়েছে একই সঙ্গে। অত্যন্ত সাদাসিধে ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে। কোনো রকম প্রত্যাশা রাখে না কারো কাছ থেকে। তাই তারই সঙ্গে বসে ছেলেবেলার গল্প করে আর নানারকম এলোমেলো কথা বলে সময় কাটাতে জুডির মন্দ লাগতো না।

সেদিন এক শনিবার রাত্রি।

প্রথম বর্ষা নেমেছে কলকাতায়। ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ'তে গ্র্যাণ্ড মনসুন বল্। জুডিকে সেখানে নিয়ে গেল হেনরি জার্ডিন।

সেখানেই প্রথম দেখা হোলো সাইগন থেকে আসা ফ্রেঞ্চম্যান আঁদ্রে তেলিয়েরের সঙ্গে।······

······কি যেন বলছিলো সার্জেন্ট পটার।

কথাগুলো এতক্ষণ কানে তোলে নি জুডি ফিশার। এবার একটি প্রশ্নে সচকিত হয়ে মুখ তুলে তাকালো।

"তেলিয়ের কি আজ এখানে আসবে?" সার্জেণ্ট পটার জিজ্ঞেস করলো।

ঘাড় নাড়লো জুডি ফিশার।

"কখন আসবে?"

তেতলায় হেনরি জার্ডিনের ঘরে বসে একটানা বকে যাচ্ছিলো ন্যান্সি। আলোচনার বিষয়বস্তু—জুডি ফিশার।

পুলিশ নাকি এসেছে আঁদ্রে তেলিয়েরের খোঁজে, ন্যান্সি বলছিলো।

হেনরি শুনছিলো না কিছুই।

সে ভাবছিলো আরেকদিনের কথা।······

······সেদিন এক শনিবার রাত্রি। প্রথম বর্ষা নেমেছে কলকাতায়!

ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ তে গ্র্যাণ্ড মনস্থন বল্।

হেনরি আর জুডি সেখানে পৌঁছুনোর পরই নামলো অঝোর বৃষ্টি। দমকা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠলো বন্ধ জানলাগুলো। দূর ময়দানে বাজ পড়ছে, বিজলী চমকাচ্ছে চৌরঙ্গির আকাশে, সুরেন ব্যানার্জী রোডে এক হাঁটু জল চিক চিক করছে সিনেমা হলের তীব্র নিয়ন আলোয়।

অনেকক্ষণ ভেবে অবশেষে ট্যাগের সময় হেনরি হঠাৎ স্থির করে ফেললো, জুডিকে জিজ্ঞেস করে বসবে তাকে বিয়ে করবে কিনা। তার একটি প্রমোশন হওয়ার কথা আছে, দুজনের একটি ছোটো সাদাসিধে সংসার বেশ চলে যাবে। জুডি রাজী হয়তো ভালো, রাজী না হয় তো আরো ভালো।

নাচের মাঝখানে কে এসে কাঁধে ট্যাপ করলো।

ফিরে তাকিয়ে হেনরি দেখে এক দীর্ঘ সুপুরুষ। রুপালী চুল, নীল চোখ। দেখেই বোঝা যায় সে বিদেশী।

"একস্কুজে মোয়া মঁসিয়ে,———।"

এ নাচে অনুরোধ এলেই পার্টনারকে ছেড়ে দেওয়াই ভদ্রতা। হেনরি কিছু বলতে পারলো না।

"সার্টেনলি," বললো হেনরি। জুডিকে বললো, "আমি দুটো ড্রিঙ্ক্স্ নিয়ে আসছি—।"

সেখানে ভীষণ ভিড়। কোনো রকমে দুটো ড্রিঙ্ক্স্ যোগাড় করে ফিরে এসে দেখে নাচিয়েদের জনতায় জুডি নেই, সেই লোকটিও নেই। খুঁজতে খুঁজতে দেখে ওরা এক কোণে বসে গল্প করছে।

হেনরি আর এগুলো না। দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে।

মনে হোলো কী যেন আটকে গেছে গলায়।

হঠাৎ পাশেই শুনলো একটি মেয়ের গলা।

"নষ্ট করে কি হবে। একটি গ্লাস আমায় দাও।"

ফিরে তাকিয়ে হেনরি দেখে ন্যান্সি।

"মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। চলো আমরা দুজনেই নাচি," বললো ন্যান্সি।

"ওই লোকটি কে?" হেনরি জিজ্ঞেস করলো।

"ওর নাম আঁদ্রে তেলিয়ের। সাইগনে ব্যবসা করতো। এখন চলে এসেছে।"

হেনরি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো।

ন্যান্সির উঁচু হীল তাল ফেলে ফেলে চললো হেনরির বাহুবন্ধনে।

তারপর হঠাৎ হেনরি বললো, "ন্যান্সি, আমি শিগ্গিরই একটি ভালো প্রমোশন পাচ্ছি। যে মাইনে পাবো তা'তে দুজনের চলে যাবে। তুমি আমায় বিয়ে করবে ন্যান্সি?"

ন্যান্সির বয়েস বেড়ে যাচ্ছিলো ক্রমশ, ইদানিং সে ব্যাকুল হয়ে উঠছিলো একটি নিরাপদ নীড়ের জন্যে।

রাজী হয়ে গেল।

হেনরি আর জুডির কাছে গেল না।

এখানে সেখানে দেখা হোতো, দেখা হলে সামান্য হেসে দু'একটি কথাও বলতো। ওই পর্যন্ত।

হেনরি জুডির খবর পেতো ন্যান্সির কাছে। আঁদ্রের নাকি পয়সাকড়ি আছে। ওদের মধ্যে এখন দারুণ প্রেম। আঁদ্রে নাকি বলেছে সে জুডিকে বিয়ে করে প্যারিসে নিয়ে যাবে। তাদের অন্তরঙ্গতা দেখে সবার মনে হোলো হয়তো এযাত্রা একজনকে আটকে ফেললো। প্যারিস হয়তো সে সত্যি সত্যিই যাবে শেষ পর্যন্ত। হিংসায় সবুজ হয়ে উঠলো বেগম বাহার লেন্-এর অন্যান্য এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরা, বিশেষ করে ন্যান্সি।......

চুপচাপ বসে ভাবছিলো হেনরি।

এমন সময় বাইরে থেকে অলগা ডাকলো ন্যান্সিকে। ন্যান্সি উঠে বেরিয়ে গেল।

তারপর ফিরে এলো একটু পরেই।

এসে বললে, "শুনেছো, আঁদ্রে তেলিয়েরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে জুডির ঘরে। আঁদ্রে এসেছিলো জুডিকে নিয়ে অর্ডিন্যান্স ক্লাবে যাবে বলে। চলো, জুডিকে দেখে আসি। সবাই গেছে সেখানে।"

"না, তোমরা যাও, আমি যাবো না," উত্তর দিলো হেনরি।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু ব্যাপারটা কি? আঁদ্রেকে পুলিশে গ্রেপ্তার করলো কেন?"

"সে অনেক গোলমেলে ব্যাপার," ন্যান্সি বললো, "আঁদ্রে আসলে ফ্রেঞ্চ-ম্যানই নয়। তোমার আমার মতোই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। শুধু আমাদের থেকে একটু বেশী ফরসা, চোখ দুটো নীল, এই যা। ওর আসল নামও আঁদ্রে নয়। বেচারী জুডি! ওর আর ইউরোপীয়ান বিয়ে করা হোলো না।"

বলে হাসতে লাগলো।

হেনরি চট করে সোজা হয়ে উঠে বসলো।

ন্যান্সি বলে চললো, "ওর আসল নাম হ্যারি মেসন। বছর দুয়েক আগে

ওর বোন কিটি মেসনকে নিয়ে কি একটা কেলেঙ্কারি হওয়ায় সে এক আমেরিকানকে খুন করে। তখন থেকে নানা ছদ্মনাম নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিলো সে। কিছুদিন আগে বম্বের পুলিশ জানতে পারে যে সে আঁদ্রে তেলিয়ের নাম নিয়ে বম্বের এক হোটেলে আছে। তাকে যখন ধরতে যায় সে পালায় সেখান থেকে। সম্প্রতি কলকাতার পুলিশ তার খবর পেয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে গ্রেপ্তার করেছে।"

সেদিনের ঘটনায় বেগম বাহার লেন্-এ যথেষ্ট উত্তেজনা হলেও শনিবার রাত্তিরের প্রোগ্রাম ব্যাহত হোলো না একটি লোকেরও। সন্ধ্যের পর যে যার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ক্লাব ইত্যাদির উদ্দেশে।

সামনের চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতে লাগলো বুড়ো জেঙ্কিন্‌স্। উপরের জানলার কাছে বসে উল বুনতে লাগলো মিসেস ডিকিনসন। দূরে বড়ো রাস্তায় ট্রাম চলে গেল রেল ঘড়ঘড়িয়ে, বাসের হর্নে চঞ্চল হয়ে উঠলো আকাশের উড়ন্ত কালো কালো বাদুড়গুলো।

হেনরিও বেরিয়েছিলো ন্যান্সি আর অন্যান্য সবার সঙ্গে। কিন্তু ফিরে এলো তাড়াতাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে একটু দাঁড়ালো জুডির ঘরের সামনে। তারপর টোকা দিলো দরজায়।

দরজা খুলে গেল। ঘরের ভিতর ঢুকলো হেনরি।

সে এমনি একটু মুখচোরা ছেলে। কিছু বলতে পারলো না। জুডি চুপচাপ বসে। চোখ দুটো জলে ভাসছে।

অনেকক্ষণ পর বললো, "কি হবে কিছুই বুঝতে পারছি না হেনরি। আঁদ্রে যে এরকম, ভাবতে পারি নি।"

একটু চুপ করে থেকে বললো, "কিন্তু বিশ্বাসও করতে পারছি না যে! আঁদ্রে, যাকে আমি নিজের চাইতেও ভালো করে চিনতাম— !"

অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো জুডি। অনেকক্ষণ পর এসে থামলো হেনরির সামনে।

জিজ্ঞেস করলো, "ওর কি হবে?"

"কি আর হবে," হেনরি বললো, "ফাঁসি হবে নয় তো বা যাবজ্জীবন কারাবাস হবে—।"

জুডি চেয়ারে বসে পড়ে ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললো। বললো, "শুধু ওই একজনকেই বড্ড ভালোবেসেছিলাম হেনরি।—"

হেনরি উঠে এসে তার চুলে আঙুল বুলিয়ে বললে, "ওর জন্যে ভেবে আর কী হবে। কিছু তো করা যাবে না। ও অপরাধ করেছে। প্রমাণ হলে শাস্তি ওকে নিতেই হবে।"

"কিন্তু ওর ছেলে তো কোনো অপরাধ করে নি," জুডি আস্তে আস্তে বললো।

"কোন ছেলে?"

চোখ নীচু করে খুব অস্ফুট গলায় জুডি বললো, "যে আমায় মা বলে ডাকবে কয়েক মাস পরে—।"

বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে গেল হেনরির শরীর বেয়ে। হঠাৎ মনে পড়লো, জুডি এখনো সেই আগের মতোই, যে স্কুলের টাস্ক করতে না পারলে ঠিক এমনি করে কাঁদতো, আর টাস্ক করে দিতো হেনরি।

আর মনে পড়লো অনেকদিন আগেকার সেই এক শনিবারের রাত। প্রথম বর্ষা নেমেছে। ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ'তে গ্র্যাণ্ড মনসুন বল্। হেনরি সেদিন স্থির করেছিলো তার যা' কিছু বলবার, চোখ বুজে বলে ফেলবে সেদিনই।

সেদিনের বার বার রিহার্স্যাল-দেওয়া কথাগুলো আজ আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে।

"জুডি, আমি একটি প্রমোশন নিয়ে খড়গপুর বদলি হয়েছি। যে মাইনে পাবো তা'তে আমাদের দুজনের চলে যাবে। তুমি আমায় বিয়ে করবে জুডি?"

•   •   •   •   •   •

রোববার পেঙ্গুলবারি ম্যানশানে সবারই ঘুম ভাঙে অনেক বেলায়।

প্রথম খবর আনলো রোজমারী। জুডি হেনরির সঙ্গে চলে গেছে এ বাড়ি ছেড়ে। দু'একদিনের মধ্যেই ওদের বিয়ে হয়ে যাবে।

সে খবর শুনে অলগার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে সুরু করলো ন্যান্সি।

হেনরির সঙ্গে যে বিয়ের কথা ছিলো তারই !

ন্যান্সি কী ক্ষতি করেছে জুডির যে শেষ পর্যন্ত একেও ছিনিয়ে নিয়ে যেতে হবে ?

কোনো সান্ত্বনাই মানলো না ন্যান্সি।

বছর ঘুরে এলো।

একদিন দেখা গেল, পেঙ্গুলবারি ম্যানশানের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে জুডি।

কলকাতায় তখন বসন্ত এসে গেছে গুলমোহর, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া আর জারুলের নানা রঙের বৈচিত্র্যে। কোকিল ডাকছে ট্রাম লাইনের ওপারে ঘনগাছগুলোর আড়াল থেকে, আর পড়ন্ত বিকেলের সোনালী রোদ্দুরে ঝলমল করছে বেগম বাহার-লেন্'এর সাদা চূণকাম করা বাড়িগুলো।

জুডি উঠে এলো অলগার ঘরে। এ বাড়িতে একমাত্র অলগাই ছিলো তার বন্ধু।

দরজা খুলে দিলো অলগা। জুডিকে দেখেই জড়িয়ে ধরলো।

"জুডি ! আমাদের কথা মনে পড়লো এদ্দিন পর? সেই যে গেলে, তারপর কোনো খোঁজ খবর নেই, চিঠিপত্তর নেই—। এসো, ভেতরে এসো। ভেতরে কে আছে বলো তো ? ন্যান্সি। সে সব সময় তোমার কথা বলে।"

জুডি ভিতরে এলো।

ন্যান্সি বসেছিলো একটি ইজিচেয়ারে। জুডিকে দেখে তার হাত ধরে বসালো।

"আমাদের কা করে ভুলেছিলে এদ্দিন," জিজ্ঞেস করলো সে।

জুডির চোখদুটো ছলছল করে উঠলো। দীর্ঘ দশ বারো বছরের সুখে-দুঃখে একই বাড়িতে এরা যে পাশাপাশি থেকে এসেছে, সবাই সবার বড়ো বেশী চেনা অত্যন্ত আপনজন হয়ে, তার মাধুর্যটুকুই আজ বড়ো হয়ে উঠলো তার কাছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কলহ, বিদ্বেষ ঈর্ষার তিক্ততা।

হেনরির খবর জিজ্ঞেস করলো ওরা।

হেনরি আরেকটি প্রমোশন নিয়ে বদলি হয়ে এসেছে কলকাতায়।

ছেলেটি কতো বড়ো হোলো?

সবে দাঁত উঠেছে। বড্ড দুরন্ত। সুন্দর হয়েছে দেখতে।

পেণ্ডেলবারি ম্যানশনের আর সবার খোঁজখবর নিলো জুডি। সেই আগের মতোই আছে সবাই। সকালে কাজে বেরোয়, বিকেলে ফেরে, শনিবার যায় ডান্সে, রোববার সিনেমায়।

তবে সব সময় পেরে ওঠে না। পয়সার বড়ো টান। বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। মাষ্টারী, নার্সিং, টেলিফোন, স্টেনোগ্রাফিতে দলে দলে ইণ্ডিয়ান মেয়ে, বাঙালী মেয়ে এসে পড়ছে। ছেলেদের অবস্থা আরো খারাপ। জর্জ আর তার বৌয়ের তো দু'বেলা খাওয়া জোটেনা। জুলিয়ার মেয়েটি বড়ো হয়ে উঠেছে, ওকে স্কুলে দিয়ে উঠতে পারেনি এখনো। লেখাপড়া শেখানোর খরচা এত বেড়ে গেছে আজকাল! মিলড্রেড পালিয়ে গেছে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের একটি ছেলের সঙ্গে। রোজমারী চলে গেছে কেনয়ায়। পলিন ডিক্‌কে বিয়ে করে এ বাড়িতেই আছে। হস্টেলের ওই মেয়েটি, ঈভা বারওয়েল যার নাম, অরুণ বোস নামে একটি ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব সম্ভব বিয়ে হবে ওদের।

আর হ্যাঁ, মিসেস গাম্বার এই বুড়ো বয়েসে এক ছোকরাকে বিয়ে করছে। জেঙ্কিন্‌স্? বুড়ো জেঙ্কিন্‌স্ মারা গেছে গত ডিসেম্বরে।

জুডি হেনরির গল্প করলো, তার ছেলের গল্প করলো। হাতে একটু পয়সা জমেছে। ঈস্টারের ছুটিতে গোপালপুর যাবে।

ন্যান্সি একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো।

"বেশ সুখেই আছো মনে হচ্ছে," বললো জুডিকে।

"হ্যাঁ, বেশ সুখেই আছি। হেনরি আমার কোনো কিছুরই অভাব রাখেনি," জুডি বললো আস্তে আস্তে।

ন্যান্সি চুপ করে রইলো একটুখানি। তারপর বললে, "সেদিন চট করে চলে না গিয়ে আর একটু ধৈর্য ধরে থাকলে আজ হয়তো আরো বেশী সুখী হতে।"

একটু অবাক হয়ে গেলো জুডি।

"কেন ?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"পুলিশ ভুল করেছিলো," অলগা বললো, "আসল অপরাধী হ্যারি মেসন নিজের নাম ভাঁড়িয়ে আঁদ্রে তেলিয়ের নাম নিয়ে বোম্বে থেকে গোয়ায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো যাতে এদেশ ছেড়ে একেবারে বিদেশে চলে যেতে পারে। হঠাৎ সে নামের আরেকজন লোক এসে পড়াতেই এই কেলেঙ্কারি। আঁদ্রের পাস্‌পোর্ট দেখে, ওদের দেশের কনসালের হস্তক্ষেপ ইত্যাদির পর ওকে পুলিশ ছেড়ে দেয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। শুনেছি হ্যারি মেসনকে পরে বম্বেতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো।"

জুডি সামনে ঝুঁকে বসলো।

"তার মানে আঁদ্রে আসলে—।"

"খাঁটি ফ্রেঞ্চম্যান," উত্তর দিলো ন্যান্সি।

জুডি নিথর হয়ে গেল।

ন্যান্সি বলে চললো, "ও ছাড়া পেয়েই এখানে চলে এসেছিলো। তারপর তোমার দরজায় তালা দেখে বসে পড়েছিলো সিঁড়ির উপর। ঘণ্টাখানেক চুপ করে বসেছিলো সে। তুমি যদি আরেকটি দিনও অপেক্ষা করতে জুডি—।"

জুডি আস্তে আস্তে বললো, "আমার কোনো আপসোস নেই। হেনরিকে বিয়ে করে আমি সুখীই হয়েছি।

ন্যান্সি ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইলো একটুখানি।

তারপর বললো, "হেনরির সঙ্গে বিয়ের ঠিক ছিলো আমারই। তুমি জানতে এ কথা। যাই হোক, আমার কোনো ক্ষতি হয়নি এতে।"

জুডি তাকালো ন্যান্সির দিকে।

ন্যান্সি আস্তে আস্তে বললো, "শেষ পর্যন্ত আমিই বিয়ে করেছি আঁদ্রেকে।"

"তুমি বিয়ে করেছো?" কেমন যেন একটু চমকে উঠলো জুডি।

ন্যান্সি হাসলো, কোনো উত্তর দিলো না।

একটু চুপ করে থেকে জুডি বললো, "আমার কোনো আক্ষেপ নেই আগের দিনগুলোর সম্বন্ধে। আমি খুব সুখে আছি। আশা করি, তুমিও সুখেই থাকবে।"

জুডি চলে গেল একটু পরে।

আস্তে আস্তে জলের ধারা নামলো ন্যান্সির দু'চোখ বেয়ে।

অলগা খুব মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো, "ওকে শেষটুকু বলোনি কেন?"

ঘাড় নাড়লো ন্যান্সি।

বললো, "না, ওকে আমি জানতে দিতে চাইনা যে শেষ পর্যন্ত হার হয়েছে আমারই, আর কারো নয়।"

অলগা চায়ের জল গরম করতে গেল রান্নাঘরে।

ন্যান্সি একা বসে রইলো জানলার পাশে।

রাস্তা দিয়ে পোস্টম্যান চলে গেল এ বাড়ি ও বাড়ির চিঠি বিলি করে।

আজো কোনো চিঠি নেই ন্যান্সির নামে।

ওর বুক টনটন করে উঠলো।

আঁদ্রে ন্যান্সিকে বিয়ে করেছিলো সত্যি, কিন্তু ওকে ফেলে চলে গিয়েছিলো মাস তিনচার পরই।

লোকে বলে সে ফিরে গেছে ফ্রান্সে। সেই যে গেল, আজ পর্যন্ত আর আর কোনো খবর নেয় নি ন্যান্সির।

শুধু ওইটুকুই জানানো হোলো না জুডিকে।

সন্ধ্যা নামলো বেগম বাহার লেন্-এ। সিঁড়ি ঘাড়ে করে একটি লোক এসে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল রাস্তার গ্যাসের বাতিগুলো।

অলগা ঈভা বারওয়েল্-এর বন্ধু।

সে বছর জুলাই মাসে অলগার সঙ্গে বিয়ে হোলো ফ্রেডি নেসবিটের সঙ্গে।

ফ্রেডি একটি মোটামুটি ভালো চাকরি করতো এক বিলিতী ফার্মে। সুতরাং পেণ্ডেলবারি ম্যানশান্স্-এর মতো এক-রুমের ফ্ল্যাটে আর থাকতে হোলো না অলগাকে। বেগম বাহার লেন্-এর ভিতর দিকে একটি ভালো বাড়ির দোতলায় একটি ভারি চমৎকার ফ্ল্যাট নিয়েছিলো ফ্রেডি আর অলগা।

সেখানে ফ্রেডি মাঝে মাঝে পার্টি দিতো অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদের। যে যার বোতল নিয়ে আসতো অভ্যাগতেরা, সে বীয়ারই হোক আর হুইস্কিই হোক। ফ্রেডি সরবরাহ করতো ওয়্যাফার্স, স্ন্যাক্স্ আর সোডা। অনেক রাত পর্যন্ত হৈ হৈ, নাচ, গান, গল্প। সময় কাটতো বেশ। কিছুক্ষণের মতো সবাই ভুলে থাকতো যে কলকাতায় জিনিসপত্রের দাম চড়ছে আস্তে আস্তে, কলে জল আসে না ঠিকমতো, বাড়ি ভাড়া পেতে খুব কষ্ট, আর যে কোনো দিন চাকরি যেতে পারে।

ঈভা বারওয়েল্-এর সঙ্গে সে বাড়িতে যাতায়াত অরুণেরও। তারপর অরুণের সঙ্গে আসতে সুরু করেছিলো আর্থার কলিন্স। আর্থার সেখানে এনে জমিয়ে দিলো দেশাইকে, যে দেশাই চাকরি করতো মিউজিয়ামে। হেনরি জার্ডিন কলকাতায় বদলি হয়ে আসবার পর জুডিও সেখানে আসতো মাঝে মাঝে।

জুডির সঙ্গে অরুণের আলাপ সেখানেই। আর জুডির গল্প অরুণ অলগা নেসবিটের কাছেই শুনেছিলো।

আরেকটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে অরুণ মাঝে মাঝে দেখতে পেতো অলগার বাড়িতে। নাম সিলভিয়া। বয়েসে সে অলগার চাইতে বেশ কিছু বড়ো,—হয়তো দেখে যা মনে হোতো তার চেয়ে অনেক বেশী বড়ো—, শ্যামলা রং, অভাব-তীক্ষ্ণ একদা-কাজল চোখ। তবে বাড়ির পার্টিতে ওকে কোনোদিনই দেখা যেতো না,—কারণ কেউ ডাকতো না ওকে, কিম্বা ডাকলেও বোধ হয় আসতো না।

তার সঙ্গে অরুণের প্রথম আলাপ একদিন বিকেলবেলা।

সেদিন নভেম্বরের রোদ-ঝিলমিল স্নিগ্ধ বিকেল। বাইরের পথে ছোটো ছোটো দুষ্টু ছেলেমেয়েদের কলকল্লোল। দূরান্ত রাজপথে মন্থর ট্রামের আধো-অস্ফুট চক্রনির্ঘোষ।

এধরণের ছুটির দিনে অরুণের অপরাহ্ণগুলি ফ্রেডি আর তার বৌ অলগা আর আর্থার আর দেশাই-এর সঙ্গে চমৎকার কাটতো কাপের পর কাপ চায়ে আর প্যাটিসে আর হাল্কা গল্পগুজবে।

কিন্তু সেদিন বসবার ঘরের আবহাওয়া অত্যন্ত গুমোট আর একঘেয়ে হয়ে উঠলো। কারণ সিলিভিয়াও এসেছিলো সেদিন। আর অফুরন্ত, অনর্গল, একটানা কথা বলে যাচ্ছিলো সিলভিয়া।

আর কারো মুখ খুলবার উপায় নেই। সিলভিয়া তখন কথা বলে চলেছে তো চলেছে তো চলেছেই। তার বিষয়বস্তু হুগলী নদীর পাড়ে জব চার্নকের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অবতরণ। মনে হোলো যেন এ বিষয়টিই সিলিভিয়ার একমাত্র স্পেশিয়েলিটি।

অন্য সবার যেন মাথা ধরে গেল প্রায়। কিন্তু অরুণের মনে হোলো মেয়েটির কথাবার্তা বেশ মজার। তার কথা বলবার ধরণ ওয়াকিবহাল সর্বজ্ঞ বিশেষজ্ঞের মতো। খুব-কম-লেখাপড়া-জানা অল্পশিক্ষিতের মতো তার ভাষা, কোনো সঙ্গতি নেই তার মুখের প্রসাধন, গায়ের বসন আর চেহারায়। ভালো করে দেখলেই মনে হয় যেন বয়েসটা তার বিচিত্র কেশবিন্যাসে যতো

কম দেখানোর প্রচেষ্টা তার চেয়ে অনেক বেশী। জামার ছিট যুদ্ধের আগের দিনেরও হতে পারে, সেলাইএর ছাঁটের পরিবর্তনটা নিশ্চয়ই যুদ্ধোত্তর এবং কাজে কাজেই জামার প্যাটার্নখানি বিভ্রান্তিকর ভাবে অতি-আধুনিক।

সিলভিয়া চোখ বড়ো বড়ো করে বলছিলো:

"যখন জব চার্নক জাহাজ থেকে নামলো, সে কি দেখলো জানো? দেখলো একদল মানুষখেকো ক্যানিবল আগুনের কুণ্ড জ্বেলে তার চারদিকে নাচছে আর গাইছে। কাছেই হাত-পা বাঁধা পড়ে আছে একটি বি-উ-টি-ফুল্ মেয়ে। তাকে ওরা সেই আগুনে ঝলসে রান্না করে খাবে। জব করলে কি, তার তলোয়ারটা না বা'র করে, ছু—ট্রে গিয়ে তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে প্রত্যেকটা yelling savage কে টুকরো টুকরো করে কাটতে সুরু করলো। আর ওরা করলে কি না, তীর ধনুক নিয়ে জব আর তার সঙ্গীদের আক্রমণ করলো। তখন, oh boy, oh boy, whatta fight সে ওদের দিলো। প্রত্যেককে মেরে ফেললো সে। বাঁচালো সেই মেয়েটিকে। সেই মেয়েটি, বুঝলে, ছিলো এক রাজকন্যা। সে তক্ষুনি জবের প্রেমে পড়ে গেল। ওদের বিয়ে হোলো তারপর। জব কলকাতা অঞ্চলটা বিয়ের যৌতুক পেলো। ভেরি ইণ্টারেস্টিং, তাই না?"

সিলভিয়ার গল্প শুনে অরুণের ঠোঁটের কোনে হাসি ঝিলমিল করে উঠলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে আর্থার তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে, দেশাই হাসি চাপছে কোনোরকমে, অলগা রুমালের নীচে হাই লুকোলো, ফ্রেডি সিগারেট ধরিয়ে নিলো আরেকটি।

জব চার্নকের বিয়ের কাহিনী কলকাতার শিক্ষিত সমাজে মোটামুটি জানা আছে সবারই। ··জাহাজ থেকে নেমে জব দেখলো নদীর পাড়ে শ্মশানঘাটে সতীদাহের আয়োজন চলছে। সুন্দরী সদ্যবিধবা মেয়ে। খুব কাঁদছে সে। স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে রাজি নয় মেয়েটি। তার চোখের জল দেখে জব চার্নক আর আত্মসংবরণ করতে পারলো না। তারপর—জোসেফ টাউনসেণ্ড্-এর এপিটাফ্‌এর ভাষায়:

Shoulder to shoulder, Joe, my boy, into the crowd
like a wedge !
Out with your hangers, messmates, but do not
strike with the edge !
Cries Charnock, "Scatter the faggots ! Double
that Brahmin in two !
The tall pale widow is mine, Joe—the little brown
girl's for you."······
······The morning gun ! Ho steady ! The arquebuse
to me,
I've sounded the Dutch Admiral's heart as my lead
doth sound the sea.
Sounding, sounding the Ganges, floating down
with the tide,
Moor me close by Charnock, next to my
nut brown bride······

এমনি করে জব চার্নক মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনলো তার আত্মীয়-স্বজনের হাত থেকে। তারপর বিয়ে করলো তাকে।

ইতিহাসের এই ছোট্টো আর মিষ্টি ঘটনাটি এ্যংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে সিলভিয়ার হাতে পড়ে যে এরকম একটি মজার রূপকথায় পরিণত হবে কে জানতো !

"সুতরাং, বুঝলে," সিলভিয়া বলে চললো, "কলকাতার গোড়াপত্তন হোলো এভাবেই। সেই মেয়েটির সঙ্গে যদি জব চার্নকের দেখা না হোতো তা'হলে সে কলকাতার জমিটা যৌতুক পেতো না, আর জবও এই বিরাট শহরটি গড়ে তুলতো না এই জলা-জঙলা জায়গায়—যেখানে সে সময় শুধু বাঘ, সিংহ, হাতি, গণ্ডার, গরিলা, কুমীর এরাই শুধু ঘুরে বেড়াতো। সিনেমায় টার্জনের ছবিতে যে রকম দেখা যায়, ঠিক সে রকম।"

অরুণ অতিকষ্টে হাসি চেপে রাখলো।

দেশাই একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা সিলভিয়া, জব চার্নকের সম্বন্ধে এত খবর তুমি কী করে জানলে?"

"কেন," সিলভিয়া উত্তর দিলো, "জব চার্নক আমার পূর্বপুরুষ।"

"হোয়াট? ডোণ্ট টেল মি ছাট—!" লাফিয়ে উঠলো আর্থার কলিন্স, বম্বের ইংরেজী দৈনিকের ক্যালকাটা করেসপণ্ডেন্ট্। সত্যি হলে যে তার ফিচারের আরেকটি সাংঘাতিক উপকরণ!

দেশাই-এর মুখ ততক্ষণে আধ ইঞ্চি ফাঁক। হাসি মিলিয়ে গেল অরুণের মুখেও।

"কিন্তু তোমার পদবীতো চার্নক নয়," বললো দেশাই।

"জব আমার পূর্বপুরুষ আমার মায়ের দিক থেকে।"

"ও, রিয়্যালি?"

আর্থারের চোখে ভেসে উঠলো কৌতূহলের ছায়া।

"তোমরা যদি একদিন সময় করে আমার বাড়ি আসো," সিলভিয়া বললো, "আমি একটি সোনার নেকলেস দেখাবো, যেটি এককালে ছিলো জব চার্নকের স্ত্রীর। তিনি সেটি দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মেয়েকে, তিনি তাঁর মেয়েকে, এই মেয়েটি তার মেয়েকে, এভাবে মায়ের থেকে মেয়ে, মেয়ের থেকে মেয়ের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে থেকে মেয়ের মেয়ের মেয়ে, মেয়ের মেয়ের মেয়ে থেকে মেয়ের মেয়ের মেয়ের—"

"ইয়েস, ইয়েস, আমরা বেশ বুঝতে পারছি," বললো অধৈর্য ফ্রেডি।

"—এভাবে বংশপরম্পরায় মায়ের হাত থেকে মেয়ের হাতে চলে আসতে আসতে শেষকালে আমি পেলাম আমার মায়ের কাছ থেকে।"

"জানো এভাবেই সিলভিয়া তার পূর্বপুরুষত্বের সন্ধান দেয়," বললো ফ্রেডির বৌ অলগা।

এ ঠাট্টা সিলভিয়া গায়ে মাখলো না।

আর্থার জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, জব চার্নকের তিন মেয়ে—ম্যারি,

ক্যাথরিন আর এলিজাবেথ। ম্যারির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো স্যর চার্ল্স্ আয়ারের, ক্যাথরিনের সঙ্গে জনাথান হোয়াইটের, আর এলিজাবেথের সঙ্গে উইলিয়াম বাওরিজের। এদের মধ্যে কোনজন তোমার পূর্বপুরুষ ?"

সিলভিয়ার মুখ একটু ফ্যাকাশে হোলো।

বললো, "সে তো জানি না। মা তো আমায় অতো কথা বলে নি! কিন্তু তুমি এসব কি করে জানলে ?"

"ইতিহাসে লেখা আছে।"

"ইতিহাসে ?" সিলভিয়া যেন সত্যি সত্যিই একটু অবাক হোলো, "স্কুলে তো আমিও ইতিহাস পড়েছি, এসব তো পড়িনি। আমার খুব ভালো মনে নেই, তবে যদ্দুর জানি নর্ম্যান ইন্‌ভেশানের কথা পড়েছি, কিং আলফ্রেড-এর কথা পড়েছি, হেনরি দি এইট্‌থ্-এর কথা পড়েছি, কুইন এলিজাবেথ, আর হ্যাঁ, এখানকার ব্যাট্‌ল্ অফ্ প্লাসি-র কথা পড়েছি—কী করে আমরা ইংরেজরা এদেশে সিভিলাইজেশান আনলাম........।"

অরুণ আর দেশাই দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকালো মুচকি হেসে।

আর্থারের মুখ লাল হয়ে গেল।

"নেভার মাইণ্ড অল্ দ্যাট্। তোমার নেকলেসের গল্প বলো," সে বললে।

"আমার নেকলেস ? ও, য়্যু মীন মিসেস চার্নকের নেকলেস। হ্যাঁ, নেকলেসটি নাকি ভয়ানক মূল্যবান। কয়েকবছর আগে এর জন্যে আমায় এক হাজার পাউণ্ড দিতে চেয়েছিলো বৃটিশ মিউজিয়াম। গত বছর একজন আমেরিকান সংগ্রাহক—"

"ওটা দেখাও দেশাইকে," বললো ফ্রেডি নেসবিট, "ও খুব বড়ো চাকরি করে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে। ওরা এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই খুব আগ্রহান্বিত হবে।"

সিলভিয়া তাকালো দেশাই-এর দিকে।

"আপনি মিউজিয়ামের লোক ?" সিলভিয়া হঠাৎ যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল।

তারপর মুহূর্তের মধ্যেই সামলে নিয়ে বললো, "বেশ তো, ভালোই হোলো। আপনি একদিন এসে দেখবেন নেকলেসটি। কিন্তু—, কিন্তু আমি

তো ওটা কারো কাছে বেচবো না। ওটা যে আমার মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সিলভিয়া।

"আমি উঠি এবার, যদি আপনারা কিছু মনে না করেন—"

সিলভিয়া চলে গেল।

"ও, থ্যাঙ্ক্ গড," বললো ফ্রেডি নেসবিট। "আজ বেশ তাড়াতাড়িই গেল মেয়েটি। বাঁচালো বাবা। বসলে তো উঠতেই চায় না।"

"আমি যা বুঝছি," অলগা নেসবিট বললো, "ওর পালানোর কারণ হোলো দেশাই। যেই শুনেছে ও মিউজিয়ামের লোক, আর বসেনি।"

এরপর সিলভিয়ার সঙ্গে অরুণের আরো কয়েকবার দেখা হয়েছে। ওর সম্বন্ধে আরো দু'চার কথা জেনেছে ক্রমশ।

অত্যন্ত দুঃস্থ মেয়েটি। বেগম বাহার লেনে মহীউদ্দীন দরজির দোকান-ঘরটির উপরে একটি ভাঙাচোরা রুমে একলা থাকে। কিন্তু মেয়েটি এমনি বেশ ভালো। তবে ওর সঙ্গ অত্যন্ত ক্লান্তিকর, কারণ ওর মুখে সাধারণত জব চার্নক আর তার বৌয়ের নেকলেস ছাড়া অন্য কোনো কথা নেই। সব সময় নিজের হারানো তথাকথিত কুলমর্যাদার বিস্মৃত আভিজাত্যের কাহিনী, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়া যে, যেই শহরে আজ ওর মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই, অন্নের সংস্থান নেই, সেই শহরের প্রতিষ্ঠাতা ওর এক পূর্বপুরুষ, যার সমাধিমন্দির আজো টিঁকে আছে চার্চলেনের সেণ্টজন্স্ চার্চের কবরখানায়।

ওকে এড়ানোর জন্যে ওর খুঁটিনাটি দু'চারটে উপকার, দু'এক টাকা ধার দেওয়া, এসব সবাই করতো, কিন্তু কেউই বিশ্বাস করতো না ওর গল্প। ওর সঙ্গ সবার অপছন্দ হওয়াটা ওর ব্যক্তিগত জীবনে যথেষ্ট ব্যর্থতা ও বিপর্যয় এনেছিলো। ওর স্বামী মারা গিয়েছিলো কোহিমার যুদ্ধে। তারপর আর অন্য বরও যোগাড় করতে পারেনি।

অলগা অরুণকে একদিন বলেছিলো, "দিনরাত যে মেয়ে নিজের পূর্ব-

পুরুষের সম্বন্ধে, নিজের বংশমর্যাদা সম্বন্ধে আবোল তাবোল হাস্যকর গল্প শুনিয়ে নিজেকে গাধা বানায়, এমন মেয়েকে কে বিয়ে করতে চাইবে বলো?"

"এ ব্যাপারে অবশ্যি অন্য মেয়ের সঙ্গে এর তফাৎ বিশেষ কিছু নেই," অরুণ উত্তর দিলো, "শুধু এ মেয়েটির মাত্রাজ্ঞান একটু কম।"

"কে মাথা ঘামায়," অলগা বললো একটি হাই তুলে, "জব চার্নকের কেন? ও নিজেকে আমেরিকার আবিষ্কারক ক্রিস্টোফার কলাম্বাসের বংশধর বললেই বা মানা করছে কে?"

তারপর একদিন অলগা অরুণকে বললো যে, এবার থেকে হয়তো সিল-ভিয়ার ঘনঘন আসাটা কমে আসবে। হয়তো বেশী দেখাই হবে না ওর সঙ্গে।

"ওকে একটি বর খুঁজে দিয়েছি," বললো অলগা। "আমি ভাবলাম ওর হাত থেকে বাঁচবার সেই বোধ হয় একমাত্র উপায়। এত বিরক্ত করতো আমায়—।"

"সম্বন্ধ কি রকম, ভালো?" অরুণ হেসে জিজ্ঞেস করলো।

অলগা হেসে উঠলো।

"আমার তো মনে হয় ভালো," সে উত্তর দিলো।

"কে সে?"

"পীটার মেনজিস নামে একটি লোক। জাতে গোয়ানিজ। ওর বাবা ছিলো আমার বাবার বাবুর্চি। সিলভিয়াকে অবশ্যি সে কথা বলিনি। পীটার কিছু লেখাপড়া শিখেছে, কথাবার্তায় একটু চালও আছে। আমি এর পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে একটি গল্প বানিয়ে বললাম সিলভিয়াকে। তারপর চুপচাপ মজাটা দেখলাম। দেখছি ওদের দুজনের দুজনকে খুব পছন্দ।"

শুনে অরুণের চক্ষুস্থির।

"তুমি কখন বিয়ে করছো, অরুণ," অলগা জিজ্ঞেস করলো।

"কাকে?"

"কাকে আবার? আমাদের ঈভা বারওয়েলকে?"

"কেন? আমায় কি ওর পূর্বপুরুষের সম্বন্ধে কিছু বলবে?"

অলগা হাসলো। বললো, "ইচ্ছে করলে বলতে পারি দু'একটা কথা।"

"কী বলতে পারো শুনি?"

"কী বলতে পারি? ওয়েল, তোমার পূর্বপুরুষ জুলিয়েট, ঈভার পূর্বপুরুষ রোমিও। তাই না?"

ওরা খুব হাসলো। অরুণ আর অলগা দুজনেই।

এরপর বেশ কিছুদিন অরুণের সঙ্গে অলগার দেখা হয়নি। অরুণকে অফিসের কাজে পাটনা যেতে হয়েছিলো।

সে ফিরে এলো মাস কয়েক পর।

তখন কলকাতায় বসন্ত এসে গেছে। গুলমোহরের স্তবকে স্তবকে রাস্তার গাছগুলো আগুনের মতো লাল আর লাল যতদূর আপনার দু'চোখ যায়। সেখানে লুকিয়ে-থাকা কোকিলের অক্লান্ত কুহুধ্বনি ছাপিয়ে উঠলো চৌরঙ্গির জমজমাট ট্রাফিকের কোলাহল। দূরে ভেসে যাওয়া উদাস দৃষ্টি নামলো লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ের পুলিশটির স্বপ্নালু চোখে।

অরুণ যাচ্ছিলো কর্পোরেশান প্লেসের ভিড় ঠেলে।

এমন সময় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সিলভিয়ার সঙ্গে।

একটি মুসলিম রেস্তরাঁ থেকে কাঠি-কাবাব কিনছিলো সিলভিয়া।

তখন সন্ধ্যে সাতটা।

"হালো অরুণ," তাকে দেখতেই সিলভিয়া বললো, "কাঠি কাবাব খাবে? খাবে না? কেন? খুব ডি-লী-শাস্ খেতে। খাও না! এক সময় যখন আমার বাবা বেঁচে ছিলেন, তখন আমাদের হাতে পয়সা ছিলো, আমি তখন খুব ছোট্টো, একটি মগ বাবুর্চি ছিলো আমাদের। সে আমাদের চমৎকার কাঠি-কাবাব রান্না করে খাওয়াতো। আহ্, কী চমৎকার দিনগুলো ছিলো। আর কী কাঠি কাবাব! মনে পড়লে এখনো আমার জিভে জল আসে।

ঈভা বারওয়েল কি রকম আছে ?”

“ভালো।”

“তোমাদের বিয়ে হচ্ছে কখন ?”

“তুমি কি করে জানলে ?”

“তোমাদের প্রায়ই একসঙ্গে দেখি। তা'ছাড়া বেগম বাহার লেনের সবাই বলাবলি করে। কিছু মনে কোরো না, আমরা ইণ্ডিয়ান ছেলের সঙ্গে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের বিয়ে হওয়া খুব পছন্দ করি না। কিন্তু তোমায় আমাদের এত ভালো লাগে যে আমাদের মনে হয় তোমার চাইতে ভালো ছেলে ঈভা খুঁজে পেতো না। আর ঈভা মেয়েটিও এত ভালো, একা কলকাতায় চাকরি ক'রে খড়গপুরে ওর মা বাবা ভায়েদের সংসার চালায়। এ রকম আজকের দিনে দেখাই যায় না। বিয়েটা করে ফেল তাড়াতাড়ি। তুমি তো ক্রিশ্চিয়ান, না? বিয়েটা কোর্টে গিয়ে করবে? সে কোরো না, একটি চার্চ-ওয়েডিং হোক, কেমন ?”

অরুণ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় মনে করলো।

বললো, “তোমার সঙ্গে তো দেখা নেই অনেকদিন। তুমি কি রকম আছো বলো।”

একটু লাল হোলো সিলভিয়া।

“কেন, অলগা তোমায় বলেনি ?” সে জিজ্ঞেস করলো। একটি মিষ্টি-সলাজ দৃষ্টি হানলো অরুণের দিকে। তারপর বললো, “আমি বিয়ে করেছি।”

সিলভিয়ার মতো প্রচারবিদ বৌ হলে স্বামীর সম্বন্ধে নিজের থেকে কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকার হয় না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে বলতে সুরু করলো তার স্বামীর কথা। তার স্বামীর ঠাকুরদার ঠাকুরদা নাকি বিশেষ বন্ধু ছিলো লর্ড ক্লাইভের। তখনো লর্ড হয়নি রবার্ট ক্লাইভ। আর্কটের অবরোধে ববি আর ওঁর স্বামীর ঠাকুরদার ঠাকুরদা নাকি পাশাপাশি যুদ্ধ করেছিলেন।

“উনি যদি সে যুদ্ধে মারা না যেতেন,” সিলভিয়া বলে চললো, “তা'হলে

কে জানে আমার স্বামী হয়তো আজ বিলেতে ডিউক কিংবা আর্ল অথবা ব্যারন কিংবা ব্যারনেট হয়ে বসে থাকতো। বেচারা! ওর বাবা, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা, সবাই খাঁটি বৃটিশ। শুধু ওর মা দক্ষিণ-ভারতীয় বলে ও খাঁটি বৃটিশের গায়ের রং পায়নি। যাক, কী আসে যায় তা'তে। চার্লির মতো ভালো লোক আর হয় না। ভালো কথা, তুমি যাচ্ছো কোন দিকে? আমার সঙ্গে চলো না, আমার বাড়িতে এক কাপ চা খেয়ে যাবে।"

"আজ নয়, আরেকদিন। আজ আরেকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"এ ডেট উইথ্ ঈভা?"

"না। আর্থারের সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছি।"

"ও, আচ্ছা। তা হ'লে এসো একদিন। কোথায় জানো তো? আগের রুমটি ছেড়ে দিয়েছি। তবে বেগম বাহার লেন ছাড়িনি। পেণ্ডেলবারি ম্যানশান্স্ চেনো তো? যেখানে অলগা, জুডি ফিশার ওরা আগে থাকতো? তারই দোতলায় আমি আর চার্লি ঘর নিয়েছি। স্যুইট নাম্বার টেন। মনে থাকবে তো?"

কাঠি-কাবাব নিয়ে সিলভিয়া চলে গেল।

দিনকয়েক পর অরুণ ঈভা বারওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো বেগমবাহার লেন্-এর ওয়াই-ডবলিউ-সি-এর হস্টেলে।

ফেরার পথে সিলভিয়ার সঙ্গে দেখা।

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

"এই যে অরুণ, কই, তুমি আসবে বলে তো আর এলে না। এখন কি করছো। কিছু করবার যদি না থাকেতো চলো আমার ওখানে গিয়ে এক কাপ চা খাবে।"

সিলভিয়াকে এড়াতে পারলো না অরুণ। ওর সঙ্গে উঠে এলো পেণ্ডেলবারি ম্যানশান্এর দোতলায়।

সিলভিয়ার ঘরে এসে দেখে এক কামরার একটি ফ্ল্যাট, একপাশে ছোট্টো একটুখানি রান্নাঘর। ঘরদোর অগোছালো।

ঘরের মধ্যে কোনো পুরুষালী জিনিসপত্তর দেখতে পেলো না অরুণ।

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলো, "তোমার স্বামী কোথায়?"

নিচের ঠোঁট কামড়ে একটু চুপ করে রইলো সিলভিয়া।

তারপর বললো, "তোমায় বলতে আপত্তি নেই। তুমি আমার পুরোনো বন্ধু। তুমি বুঝবে। অলগাকে বোলো না কিন্তু—। জানো, পীটার আর আমার সঙ্গে থাকে না। মানে—মানে সে আমায় ফেলে পালিয়েছে দিন দুই আগে।

অরুণ অবাক।

এ খবরের জন্যে সে তৈরী ছিলো না। এই তো কয়েকদিন আগে সিলভিয়া এত উচ্ছ্বসিত হয়ে পীটারের সম্বন্ধে বলছিলো। তবে এখনো যেন বিশেষ কিছুই হয়নি এ রকম একখানি ভাব। হোক না সে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। স্বামী পাওয়া আর হারানো কি এতই ডাল ভাত এদের কাছে, অরুণ ভাবলো।

কিন্তু সিলভিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে অরুণের মনে হোলো ঠিক তাই যেন নয়। বড্ডো চাপা মেয়ে সে। নিজের পূর্বপুরুষের আভিজাত্যের কাহিনী, সে সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, ফলাও করে বলতে পারে সবাইকে, কিন্তু নিজের দুঃখের কাহিনী কাউকে আভাষেও জানতে দেবে না। তার বংশ-কৌলীন্যের কথা নিয়ে অন্যের হাসাহাসি তার সইবে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-দৈন্য-ব্যর্থতা নিয়ে অন্যের সহানুভূতি তার সইবে না।

অরুণ কী বলবে ভেবে পেলো না। দু'চারটি মামুলী সান্ত্বনার কথা বলে অন্য প্রসঙ্গ তুলবার চেষ্টা করলো।

"তোমার সেই নেকলেসটি কোথায়," সে জিজ্ঞেস করলো, "যেটি তুমি আমায় একদিন দেখাবে বলেছিলে? এখন যদি অসুবিধে না হয়—"

"না, না, অসুবিধে আর কি," সিলভিয়া উত্তর দিলো, "কিন্তু—কিন্তু সেটাতো আমার কাছে নেই।"

"নেই ? কোথায় সেটি ?"

"পীটার চলে যাওয়ার সময় ওটাও সঙ্গে নিয়ে গেছে। আমাকে বলে নেয়নি, জানো ?"

অরুণ ভেবে পেলো না আর কী বলবে।

"কিন্তু এ নিয়ে আমি ভাবছি না মোটেও," সিলভিয়া বললো, "আমি জানি তাকে আমার কাছে শিগ্‌গিরই ফিরে আসতে হবে।"

এ রকম অব্যর্থ ভবিষ্যদ্‌বাণী অরুণ আর কোনোদিন অন্য কোনো মেয়ের মুখে শোনেনি।

কারণ সে মুহূর্তেই তার কাঁধের উপর দিয়ে ঘরের নিস্তব্ধতায় গমগম করে উঠলো একটি ভরাট কণ্ঠস্বর।

"আমি ফিরে এসেছি, সিলভিয়া," কণ্ঠস্বরটি বললো।

অরুণ ফিরে তাকিয়ে দেখলো।

খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটি মোটা কালো খর্বাকৃতি লোক, পরনে তার খাকি হাফপ্যাণ্ট আর খাকি হাফশার্ট।

অরুণ চলে যাওয়ার জন্যে উঠে পড়লো।

কিন্তু সিলভিয়া তাকে চা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। স্বামীর প্রত্যাবর্তনটা যেন এমন কিছু বিশেষ ব্যাপার নয় তার কাছে। সে একটা নিস্পৃহ ভাব দেখালো, অরুণকে আলাপ করিয়ে দিলো পীটারের সঙ্গে, চা তৈরী করে দিলো দু'কাপ।

তারপর আস্তে আস্তে পীটারকে জিজ্ঞেস করলো, "আমার নেকলেসটি কোথায় ?"

পকেটে হাত ঢোকালো সিলভিয়ার স্বামী পীটার মেনজিস, তারপর জিনিসটি ছুঁড়ে দিলো টেবিলের উপর।

একটি ভারী সেকেলে নেকলেস, ম্লান সোনালী রঙ, লকেটে ফারসী অক্ষরে কী যেন খোদাই করা।

"না বলে নিয়ে গেছ্‌লে কেন ?" জিজ্ঞেস করলো গুরুগম্ভীর সিলভিয়া।

"ভেবেছিলাম বেচে দেবো," উত্তর দিলো পীটার।

তার নির্বিকার স্পষ্টভাষণ অরুণকে অবাক ও বিমুগ্ধ করলো।

"দিলে না কেন বেচে? কেন ফিরে এলে আবার?" জিজ্ঞেস করলো সিলভিয়া।

"সিলভিয়া," উত্তর দিলো তার গদগদ স্বামী, "আমার সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি বোঝো না? আমি চাই একটু শান্তিতে থাকতে আর তুমি সব সময় কোন এক blighter জব চার্নক সম্বন্ধে এক নাগাড়ে বকর বকর করছো তো করছোই। এ সব শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠেছিলো আমার কাছে।"

"তাই তুমি চলে গেলে আমার নেকলেসটি নিয়ে? আমায় একটিবারও জিজ্ঞেস না করে? বেশ, বেচে দিলে না কেন নেকলেসটি? কে বলেছে তোমায় ফিরে আসতে?" সিলভিয়া নির্বিকার ভাবে জিজ্ঞেস করলো কোনো ভাবপ্রবণতার, কোনো অভিমানের আভাস না দিয়ে।

অরুণ বুঝে গেল কেন সিলভিয়া তাকে উঠতে দিতে চায়নি। ওর সামনে সে নিজে বেশ একটা নিস্পৃহ নির্বিকার নিরাসক্ত ভাব দেখিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু তার স্বামী ভাবপ্রবণ হওয়ার সুযোগ পাবে না।

পীটার একবার অরুণের দিকে তাকালো।

অসোয়াস্তি বোধ করলো অরুণ।

তারপর অরুণের অস্তিত্ব এক রকম উপেক্ষা করেই পীটার কথা বলতে সুরু করলো।

"যা হবার হয়ে গেছে," সে বললো, "এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সিলভিয়া, আমি চিরকালই চেয়েছিলাম তোমার আমার একটি শান্তিময় সুখের সংসার। শোনো, যে কথা তোমায় বলতে এসেছি, এবার বোধ হয় সেটা গড়ে তোলা সম্ভবও হবে। আমি আসানসোলে একটা চাকরি পেয়েছি। আমি জানতে এলাম তুমি আমার সঙ্গে আসবে কিনা। তুমি যা খুশী করতে পারো। যদি আসতে না চাও আমি জোর করবো না।

যদি আসতে চাও তো খুব খুশী হবো। কিন্তু তা' হলে একটি কথা দিতে হবে তোমায়, যে আর কোনোদিন জব চার্নকের নাম মুখেও আনবে না। আমরা তো সবাই আদম আর ঈভের বংশধর, দ্যাট বাগার জব চার্নক কি ওদের চাইতেও বেশী নাম করা লোক? সুতরাং কী আসে যায় যদি—"

সে হঠাৎ থামলো।

কারণ সিলভিয়ার কান নেই তার কথায়। সে টেবিলের উপর থেকে নেকলেসটি তুলে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে।

"সিলভিয়া ডার্লিং," চিৎকার করে উঠলো পীটার, "দেখ, তোমায় ওই নেকলেসটির মায়া ছাড়তে হবে। তোমায় ওটা নাড়তে চাড়তে দেখলেই আমার মেজাজ তেতো হয়ে যায়। আমি একটি নতুন নেকলেস গড়িয়ে দেবো তোমায়। ওটা দূর করো এখান থেকে।"

"ডোণ্ট বি সিলি," বললো সিলভিয়া, "এটা কার নেকলেস জানো? এটা—"

"ফর হেভেন্‌স্' সেক্‌, বকর বকর করা তুমি থামাবে? তুমি যেমন জানো, তেমনি আমিও জেনেছি যে ওটা কারো হতে পারে না। ওর কোনো দাম নেই।"

সিলভিয়া চোখ দুটো তুললো।

"মানে? কী বলতে চাও তুমি?"

"সিলভিয়া, আমি এক পওন্‌-ব্রোকারের কাছে ওটা বেচে দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা নিলো না কিছুতেই। ওটা নাকি আসল সোনা নয়।"

সিলভিয়ার চোখে বিস্ময়ের চাইতে করুণাই যেন বেশী।

"ওটা দূর করো ডিয়ার," পীটার বললো, "দিয়ে দাও কাউকে, ছুঁড়ে ফেলে দাও জানলা দিয়ে, দূর করো যেমন করেই হোক। আমি আর ও সম্বন্ধে কোনো গালগল্পই শুনতে চাই না। আমি শুধু চাই একটি শান্তিময় সুখের ঘর আর শান্ত বৌ, যে কথা বলে না বেশী।"

বিশ্বের পুরুষসমাজের চিরন্তন কামনা পীটার মেনজিসের কণ্ঠে ধ্বনিত হোলো।

সিলভিয়া যেন আইসক্রীমের মতো গলতে সুরু করলো আস্তে আস্তে।

"যদি তাই করি তুমি সুখী হবে?" সিলভিয়া জিজ্ঞেস করলো।

পীটার ঘাড় নাড়লো।

সিলভিয়া ফিরলো অরুণের দিকে।

বললো, "অরুণ, আমার একটি উপকার করবে? তুমি এই নেকলেসটি অলগাকে দিয়ে এসো। আমার কাছে ওর কিছু টাকা পাওনা আছে। ওকে দেয়ার মতো এ ছাড়া আমার আর কিছু নেই।"

নেকলেস নিয়ে চলে এলো অরুণ বোস।

অরুণের মুখে ব্যাপারটি শুনে অলগা নেসবিটের মনে সহানুভূতি এলো সিলভিয়ার জন্যে। তবে খুব মজাও পেলো নেকলেসটি ঝুটা শুনে।

ওর স্বামী ফ্রেডি খুব একচোট হাসলো।

এ রকম মজার ব্যাপার সে নাকি আর শোনেনি কোনোদিন।

"বেচারী সিলভিয়া," বললো অলগা, "তা'হলে সে আসানসোল চলে গেল ওর স্বামীর সঙ্গে, 'ম্? ভালোই হোলো। সুখী হবে সে। তবে ওকে আমরা খুব মিস্ করবো এখানে।"

দেশাই নেকলেসটি নেড়ে চেড়ে দেখছিলো।

সেটি টেবিলের উপর রেখে সে বললো, "বেচারী সিলভিয়া!"

একটু কি রকম যেন শোনালো দেশাইর কথা ক'টো। এরা সবাই ফিরে তাকালো তার দিকে।

দেশাই আস্তে আস্তে বললো, "বলছিলে না নেকলেসটি গিল্টি করা? এসব সেকেলে জিনিস সম্বন্ধে আমি একআধটু জানি। এই নেকলেসটি খাঁটি।"

"মানে?" অলগা লাফিয়ে উঠলো চেয়ার থেকে, "তুমি বলতে চাও নেকলেসটি সোনার?"

"একেবারে খাঁটি সোনার," উত্তর দিলো দেশাই, "এবং তারও কিছু বেশী। নেকলেসটা সত্যি সত্যি মিসেস্ চার্নকের। আমাদের আর্কাইভ্স্এ একটি পুরোনো চিঠি আছে। সেটি জব চার্নক লিখেছিলো জোনস্ নামে এক সাহেবের কাছে। সেই চিঠি উল্লেখ করা আছে যে পাঁচু শীলের কাছে যে দুটো নেকলেস গড়াতে দেওয়া হয়েছিলো, চার্নকের দিশী সরকার বদলী দাসকে দিয়ে সে দুটো আনিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেই চিঠিতে নেকলেসের ডিজাইন সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা আছে। একটি চার্নক দিয়েছিলো তার বৌকে। অন্যটি সে ভেট পাঠিয়েছিলো অযোধ্যার নবাবের এক প্রতিপত্তিশালী পারিষদের কাছে। সেটির খোঁজ আমরা পেয়েছি উত্তরপ্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদারের কাছে, যার এসব পুরোনো জিনিস সংগ্রহ করার বাতিক আছে। এ নেকলেসটি অবিকল সেটির মতো দেখতে। এ যে একই জোড়ার অন্যটা নিশ্চয়ই, তা'তে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো সবাই।

তারপর অলগা আস্তে আস্তে বললো, "কি জানি, বিশ্বাস হয় না। অরুণ যে ওর স্বামী পীটারকে নিজের মুখে বলতে শুনেছে যে নেকলেসটি সে বেচতে পারেনি, স্যাকরা বলেছে ওটা আসল সোনা নয়। সে কি ভুল করেছে বলতে চাও?"

"আমার মনে হয়," ফ্রেডি বললো, "পীটার আসলে সেটা বেচে দেয়নি শেষ পর্যন্ত, সে সিলভিয়াকে একটু বেশী রকম ভালোবাসে বলে।"

অরুণ একটু ভেবে বললো, "সে নাও হতে পারে। হয়তো পীটার সেটি বেচতে যায় নি। ইচ্ছে করেই সিলভিয়াকে মিছে কথা বলেছে যা'তে এর উপর সিলভিয়ার কোনো মমতা না থাকে। হয়তো পীটারের ধারণা হয়েছিলো, সিলভিয়ার মন থেকে এই নেকলেসের অব্সেশান দূর করতে না পারলে ওদের পারিবারিক জীবন সুখের হবে না।"

দেশাই হাসলো।

হেসে বললো, "আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে নেকলেসটি আসল, খাঁটি এবং ঐতিহাসিক।"

সিলভিয়া পীটারের সঙ্গে চলে গেল কারো সঙ্গে দেখা না করেই। কারো কাছে ঠিকানা রেখে যায় নি সে। তাই তার সঙ্গে আর চিঠিপত্তরের সংযোগও রাখতে পারলো না কেউ।

কিন্তু মাস ছয়েক পরে সিলভিয়া একবার কিছুদিনের জন্যে কলকাতায় বেড়াতে এলো।

তখন দেখা করতে এলো অলগার সঙ্গে। অরুণও ছিলো সেদিন।

কথায় কথায় অলগা নেকলেসটির কথা পাড়লো।

সিলভিয়া তখন আস্তে আস্তে বললো, "পীটার যে স্যাকরার কাছে নেকলেসটি নিয়ে গিয়েছিলো সে ছিলো চোরাই মালের কারবারি। বেশ বুড়ো সেই স্যাকরাটি। তার সঙ্গে যে পীটারের আগের লেনদেন ছিলো সে খবর আমি জানতাম। কিন্তু পীটার জানতো না যে আমিও চিনতাম সেই বুড়ো স্যাকরাকে। কি করে চিনতাম জানো? তোমায় কি বলেছি, আমার বাবা এক সময় কলকাতা পুলিসের বড়ো অফিসার ছিলেন? হেসো না, সত্যিই ছিলেন তিনি। এই স্যাকরা যথেষ্ট উপকৃত ছিলো তাঁর কাছে।

পীটার নেকলেসটি হাতড়ানোর পর আমি গিয়ে দেখা করলাম তার সঙ্গে, কারণ আমি জানতাম যে সে তারই কাছে যাবে শেষ পর্যন্ত। সুতরাং বুঝতেই পারছো আমি বুড়ো স্যাকরাকে শিখিয়ে দিলাম পীটারকে বলতে যে নেকলেসটি খাঁটি নয়, ওটা গিল্টি। পীটারকে সে তাই বললো। সে খুব প্রবীণ স্যাকরা, তাই তাকে আর অবিশ্বাস করতে পারলো না পীটার। যাচাই করলো না অন্য কোথাও, আবার ফিরে এলো আমার কাছে। বুঝলে না? আমি নেকলেস আর পীটার দুটোই ফেরত চেয়েছিলাম একসঙ্গে। তাই পুলিসে খবর দিই নি।

নেকলেসটি আসলে সোনার নয় শুনে পীটার তো ফিরে এলো আমার কাছে। ইতিমধ্যে সে চাকরিও পেয়ে গেল একটা। সুতরাং জীবনটা শেষ পর্যন্ত আবার বেশ ভালো করে নতুন ভাবে সুরু করা গেছে।”

“তোমার আগের দিনের অভাবের সময় নেকলেসটি বেচে দাও নি কেন? অনেক দাম পেতে নিশ্চয়ই,” ফ্রেডি জিজ্ঞেস করলো।

“মা'কে কথা দিয়েছিলাম বেচবো না,” একটু হেসে সিলভিয়া উত্তর দিলো।

অলগা চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর সিলভিয়ার হাত দুটো তুলে নিলো নিজের হাতের মধ্যে।

বললো, “সিলভিয়া, তোমার সম্বন্ধে আমরা সবাই কতো কি ভেবেছি, কতো হাসাহাসি করেছি নিজেদের মধ্যে। তার জন্যে ভাই আমাদের মাপ করতে হবে তোমায়। আর নেকলেসটি তোমার, সেটি ফেরত নিয়ে যাও।”

সিলভিয়ার কোমল গলাটা একটু কেঁপে উঠলো।

আস্তে আস্তে বললো সে, “অলগা, তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমার দুদিনে আমার অনেক উপকার করেছো। আমায় টাকা ধার দিয়েছো যা আমি ফিরিয়ে দিতে পারি নি। তুমিও চাওনি। পীটারকে যে আমার জীবনে পেয়েছি সেও তোমারই জন্যে। আমি খুব সুখে আছি তাকে নিয়ে। আমার শান্তির সংসার নিয়ে আমি সুখী, এখন আর কে আমার পূর্বপুরুষ ছিলো কোন এক অতীতে, তা নিয়ে মোটেই মাথাব্যথা নেই। নেকলেসটি আমি তোমায় দিয়েছি বন্ধুর উপহার হিসেবে। সে আমি আর ফেরত নিতে পারবো না। ওটা ভাই তুমিই রেখে দাও। আর—আর যদি ইচ্ছে করো—”

একটি মিষ্টি বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো সিলভিয়ার মুখে, চোখ দুটো ঝিল-মিল করে উঠলো দুষ্টুমিতে, একটু থেমে সে বললো,

“—যদি ইচ্ছে করো, তা'হলে তুমি নিজেকে জব চার্নকের বংশধর বলেও পরিচয় দিতে পারো।”

সে থামলো। নিথর হয়ে রইলো অন্য সবাই।

বেগম বাহার লেন ধরে খানিকটা এগিয়ে মহীউদ্দীন দরজির দোকান আর পেণ্ডেলবারি ম্যানশান ডাইনে বাঁয়ে পেছনে ফেলে খানিকটা এগুলেই ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ'র হস্টেল, যেখানে থাকে অরুণ বোসের বান্ধবী ঈভা বারওয়েল। আরো একটু এগিয়ে গেলে সেই বাড়ি, যেখানে থাকে অলগা আর ফ্রেডি নেসবিট, যাদের বাড়িতে এসে আড্ডা দেয় অরুণ, আর্থার, দেশাই আর মাঝে মাঝে জুডি। তারপর আরো দুতিনটে বাড়ি ফেলে গিয়ে ডাইনে যেই বাড়ি, তার দোতলায় থাকে স্টেনো-মেয়ে মলি মার্টিন আর তার অর্ডার-সাপ্লায়ার স্বামী জনি। পাড়ার কারো সঙ্গে খুব বেশী মাখামাখি নেই। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সেরে মলি যায় অফিসে, আরো ঘণ্টাখানেক পরে জনি বেরিয়ে পড়ে তার নিজের কাজে। অফিস থেকে ফিরে এসে মলি আবার লেগে পড়ে সংসারের কাজে। জনি তখনো ফেরে না।

জনি যখন ফেরে তখন অনেক রাত। জড়ানো কণ্ঠে তার পথ-চলতি গান শোনা যায়। মাঝে মাঝে শোনা যায় খুব বকাবকি করছে মলিকে।

জনি বাড়ি ফেরবার পর ঘরের আলো নিভে যায়। মলির অস্পষ্ট অনুযোগ মাখা কণ্ঠ হয়তো শুনতে পায় আশেপাশের বাড়ির দু'একজন, যাদের চোখে তখনো ঘুম নেই।

আর শুনতে পায় জনির হাসি, খুব উঁচু গলায় হাসি।

তারপর সব চুপচাপ, নিসাড়, নিস্তব্ধ।

সবাই জানে মার্টিনদের অবস্থা খুব ভালো নয়। অফিসে চাকরি ক'রে সংসার চালায় মলি। বাজার খারাপ। তাই জনির আয়ও অতি সামান্য।

সুতরাং বেগম বাহার লেনের সমাজে খুব বেশী দেখা যায় না মলিকে। সারাদিন তার কেটে যায় অফিসেই। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের পরও সে পার্ট-টাইম কাজ করে বাইরে।

ফাল্গুন পেরিয়ে চৈত্রের আরম্ভেই কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, ক্যাস্থয়েরিনা, বুগেনভিল্য়ার স্তবকময় বর্ণসম্ভারে যখন রঙিন হয়ে ওঠে কলকাতার বসন্ত, ময়দানের সোনালী-সবুজ গাছগুলোর অন্তরাল থেকে ভেসে-আসা কোকিলের কুহু-কূজনে আনমনা হয়ে ওঠে এসপ্লানেডের ট্র্যাফিক পুলিশ, দক্ষিণের দমকা হাওয়ায় ঝিরঝির করে ফুটপাথের হকারদের পাতাবাহার মন,.........ডেলহাউসি-স্কোয়ারের লোক ঠাসাঠাসি অফিসের কর্মব্যস্ততায় সে সবের কোনো খবর পায় না এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে-স্টেনোরা। সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি সরু সরু ফ্যাকাশে আঙুলগুলোর বর্ষণ ঝরিয়ে যায় টাইপ-মেশিনের উপর, সাহেবের ডাক এলে খাতাপেন্সিল তুলে নিয়ে ডিক্টেশান নিতে ছোটে, আর ফিরে এসে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে হিসেব করে, মাসকাবার হতে আর কতোদিন বাকী।

এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পেরিয়ে পাঁচটা বছর কেটে গেছে মলি মার্টিনের। ভোরে ভোরে উঠে বাজার ক'রে ফিরে এসে চা-টোস্ট পরিজের সস্তা ব্রেকফাস্ট তৈরী ক'রে স্বামীকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে, মেয়েটিকে দুধ খাইয়ে পাশের ফ্ল্যাটের বুড়ি জনসনের জিম্মায় রেখে এসে, তাড়াহুড়ো করে মুখে পাউডার ঘ'ষে ঠোঁটে লিপস্টিক বুলিয়ে ছুটতে ছুটতে এলিয়ট রোডে এসে ট্রাম ধরেছে। অফিসে এসে কাজ ক'রে গেছে যন্ত্রের মতো, দেশবিদেশের নানা লোকের নামে নানা রকম চিঠি টাইপ ক'রে গেছে,—লাখ লাখ টাকার ব্যবসার চিঠি, আইন বে-আইনের চিঠি, নতুন কর্মচারী নিয়োগের চিঠি, পুরোনো কর্মচারী ছাঁটাইয়ের চিঠি। আর তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে মনে পড়েছে, এখন মেয়েটির দুধ খাওয়ার সময়, বুড়ি জনসন তাকে ঠিকমতো খাওয়ালো তো, না কি রকিং চেয়ারে বসে

উল বুনতে বুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রৌঢ় স্বামী জনি মার্টিন হয়তো অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্ডারের সন্ধানে।

কী গরম বাইরে, জনির পিঙ্গল মুখ হয়তো ঘামে চকচক করছে। কাল শনিবার, বাড়ি ফিরতেই হয়তো সে দশটা টাকা ধার চাইবে ফ্লাইং-এঞ্জেলের উপর ধরবে বলে। প্রতিজ্ঞা করবে শনিবার সন্ধ্যেবেলা পঁচিশ টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার—জিতলে মদ খেয়ে ফিরে আসবে, হারলে মুখ চুণ করে ফিরে এসে বলবে, দিনকাল খারাপ, ব্যবসার অবস্থা ভালো নয়, হিকস্ এ্যাণ্ড কুইন কোম্পানীতে হাজার দশেক টাকার বিল প'ড়ে আছে, সেটা আদায় হ'লে দিয়ে দেবে।

সে বিলের কথা মলি শুনছে অনেক দিন থেকেই। সে বিল আদায় কোনোদিনই হয় না, টাকাও ফেরত পায় না মলি মার্টিন।

মলির বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর হোলো, কিন্তু আজো সে ঠিকমতো জানলো না জনি মার্টিনের কিসের ব্যবসা। জিজ্ঞেস করলে বলে অর্ডার সাপ্লাই।

কিসের অর্ডার?

কেন, যে কোনো কিছুর—স্টেশনারি, হার্ডওয়ার, মিলস্টোরস্, স্ক্র্যাপ্স্।

যুদ্ধের সময় নাকি প্রচুর পয়সা কামিয়েছে সে। কিন্তু গেল কোথায় সে পয়সা?

কেন, ইনকাম ট্যাক্স দিতে দিতেই সব শেষ হয়ে গেছে।

মলি, তুমি মেয়েমানুষ, ফাইন্যান্সের কি বোঝো? সুখ ছিল বৃটিশ আমলে। এই নেটিভ ইণ্ডিয়ানদের হাতে 'পাওয়ার' আসবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা যে কী ট্রাব্‌ল্‌সাম্ হয়েছে বলবার নয়। যা আয় করবে, তাই ইনকাম ট্যাক্স বলে নিয়ে যাবে। থাকবো না এ দেশে। চলে যাবো সাউথ-আফ্রিকায়, নয় তো অস্ট্রেলিয়ায়। মার্টিনেরা খাঁটি ইউরোপীয়ানের বংশধর, তার ঠাকুর্দা নাকি একটি সায়েব হাউসের ডিরেক্টার ছিলো। আজ, এই মুহূর্তেই চলে যেতো জনি মার্টিন, তবে কোন এক এঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম এ একটি তিরিশ হাজার টাকার বিল পড়ে আছে, তাই…।

প্রথম প্রথম মলি জানতে চাইতো, তারপর নিস্পৃহ হয়ে গেল। নিজের দেড়শো টাকার মতো মাইনে, সমস্তটাই ঢেলে দিতো সংসারে।

কালেভদ্রে জনিও দিতো দশবিশ টাকা। জনি কিছু আয় করতো নিশ্চয়ই, তা নইলে জনি ওয়াকার, ভ্যাট সিক্স্‌টিনাইনের বোতলগুলো কিনতো কী দিয়ে।

কিন্তু কিছু বলতো না মলি।

যাক গে, ওর পয়সা দিয়ে ও যা' করবে করুক। কে জানে, হয়তো কোনো ব্যাপারে মস্তো ঘা' খেয়েছে জীবনে। হয়তো সত্যি সত্যিই পয়সা ছিলো এক কালে, তখনকার অভ্যেস আর ছাড়তে পারে 'নি। মদের বোতল কেনবার পয়সা না থাকলে এক এক সময় মলিই দিয়ে দিতো নিজের বহু কষ্টের সঞ্চয় থেকে—কারণ, মদ না খেলে অত্যন্ত খিটখিটে হয়ে উঠতো সে, আর খিটখিটে লোক মলি সহ্য করতে পারে না। আর জনি মদ যতো বেশী খেতো ততো বেশী ভালোবাসতো মলিকে। জনি যে ওকে একটু ভালো-বাসে, মলির অভাব-বিপর্যস্ত জীবনে এটুকুই একমাত্র শ্যামলিমা।

বাড়িতে বোতল থাকলে সে বাইরে থাকতো না বড়ো একটা, মলিকে ছাড়া কোনোদিন ডান্সে যেতো না, মলি ছাড়া আর কারো সঙ্গে নাচতো না, —কিন্তু আর কেউ এসে মলির সঙ্গে নাচতে চাইলে কখনো কিছু মনে করতো না,—আর প্রত্যেক রোববার মলির সঙ্গে যেতো সকাল সাড়ে দশটার সিনেমার শো'তে—যার টিকিটের দাম দিতো মলি।

সেদিনও মলি অফিসে বসে টাইপ করতে করতে জনির কথাই ভাবছিলো। জিমির জেল হয়ে যাওয়ার পর কী বিপদেই না পড়েছিলো মলি। জনি এসে বাঁচিয়ে দিলো মলিকে। সে না এলে হয়তো, কে জানে, হয়তো গলায় দড়ি দিতো মলি।

জিমি।—সেই জিমি।—

জীবনের প্রথম রঙিন স্বপ্নগুলো জিমিকে ঘিরে।

জিমির জেল হয়েছিলো চার বছরের জন্যে। তারপর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি তার।

সেই জিমি এদ্দিন পর হঠাৎ টেলিফোন করেছে মলিকে।

সে কথাই মলি ভাবছিলো।

এমন সময় এলো সায়েবের বেয়ারা।

"ম্যাগিট সাহাব,—" সে বললে।

মলি খাতা পেন্সিল নিয়ে উঠে পড়লো। দরজা ঠেলে ঢুকলো ম্যাগিট সায়েবের ঘরে।

"য়েস্ স্যর?"

"নিউ ইয়র্কের চিঠিটা হয়েছে?"

"নট য়েট স্যর।"

ম্যাগিট সায়েব মেঘগর্জন করলো।

"এক্ষুনি এনে দিচ্ছি স্যর।"

মলি মার্টিন নিজের জায়গায় ফিরে এলো।

পাশের টেবিলে কাজ করছিলো ঈভা বারওয়েল, অরুণের বন্ধু। তাকে বললো, "দিস চ্যাপ ম্যাগিট একটি বরাহ। দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত পোনেরোটা চিঠি ডিক্টেট্ করেছে আর আশা করছে যে আমি চারটের মধ্যে সব করে দেবো।"

"আমার হাতে অনেক কাজ মলি," ঈভা বললো, "তা নইলে তোমার কিছু আমি ক'রে দিতাম।"

"থ্যাংক্স্, কিন্তু ওরা দেখতে পেলে রাগ করবে।"

"যা পারো করে ফেল। দেখি যদি আমারগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি, তারপর তোমায় একটু সাহায্য করবো'খন।"

"আজ শরীরটা ভালো নেই ঈভা।"

"দেখে তো মনে হচ্ছে না—।"

"খুব ক্লান্ত বোধ করছি।"

"তোমায় খুব আনমনা দেখাচ্ছে। কী ব্যাপার?"

মলি মার্টিন কোনো উত্তর দিলো না। চিঠি টাইপ করে গেল চুপচাপ। চিঠি শেষ করে বেয়ারাকে দিয়ে সাহেবের ঘরে পাঠিয়ে দিলো।

মাথাটা তখন টনটন করছে।

"জানো, অরুণ আজ আমায় সিনেমায় নিয়ে যাচ্ছে," ঈভা বললো।

মলি একটু হাসলো। তারপর হাত দিয়ে রগ দুটো টিপে ধরে টেবিলের উপর কনুই ভর দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলো চুপচাপ।

পাশের ডেস্কে ঈভা বারওয়েলের টাইপ মেশিনে অবিরাম খটখট শব্দ। তারই প্রতিধ্বনি জাগলো মলি মার্টিনের মনে।

সেই প্রতিধ্বনির রেশ তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ছয় বছর আগে, যখন আরেকটি এমনিতরো অফিসে নতুন টাইপিস্ট হয়ে ঢুকেছিলো সবে স্কুল থেকে বেরুনো মলি। তখন সে মিসেস মার্টিন নয়। তার তখনকার নাম মিস মলি টমসন। তার পাশের টেবিলে বসে টাইপ করতো নীল চোখ তামাটে চুল লাজুক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলে জিমি।

আলাপ হয়ে গেল প্রথম দিনই।

তারপর গ্রেল্ ক্লাবে একসঙ্গে হাউসি খেলতে গেল শনিবার, মাস কাবারে মাইনে পেতে একই সঙ্গে নাচতে গেল ক্লেম-ব্রাউনে।

ফেরবার পথে মলিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ওর সঙ্গে গল্প করলো সে.।

মামুলী টাইপিস্ট হয়ে যে কিছু হয় না, জিমি যদি একটি পোস্ট্যাল কোর্স নেয় সেক্রেট্যারিয়েল প্র্যাকটিসে তা'হলে যে জেমস্ মরিসন কোম্পানিতে ভালো চান্স পাওয়া যাবে, সেই গল্প।

মামুলী টাইপিস্ট হয়ে যে কিছু হয় না, মলি স্টেনোগ্রাফি শিখলেই যে হারবার্ট ফ্রেজার কোম্পানিতে বেশী মাইনের চাকরি পাবে, সেই গল্প।

গল্প কিছুতেই ফুরোতে চায় না।

জিমি আর মলি হাঁটতে হাঁটতে মলিদের বাড়ির নিচে অবধি গেল।

সেখানেও কাবার হয়ে গেল একটি ঘণ্টা।

মলির মা বারান্দায় এসে দেখে গেল কয়েকবার।

অবশেষে দূর গীর্জার ঘড়িতে যখন বারোটা বাজতে সুরু করলো আর পূর্ণিমার চাঁদ ঢলে পড়লো সামনের ম্যানশন বাড়িটির ছাতের উপর জলের ট্যাঙ্কগুলোর পেছনে, মলির মা হাঁক দিলো উপর থেকে, "মলি, তুমি কি আজ রাতে বাড়ি ফিরছো না?"

"আসছি এক মিনিটের মধ্যেই," সাড়া দিলো মলি।

তারপর জিমিকে বললো, "জিমি, কী চমৎকার কাটলো আজকের সন্ধ্যা। আমার আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না।"

"আমারও না।"

"জিমি!

"মলি!"

"আমি তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম।"

"না, মলি।...আচ্ছা, মলি!"

"কি?"

"একটি কথা বলবো তোমায়?"

"বলো।"

"আচ্ছা, আজ থাক, আরেক দিন—।"

"না, না, আজই বলো!"

"বলবো?"

"হ্যাঁ, বলো।"

"আমি জীবনে কোনোদিন কাউকে ভালবাসিনি মলি!"

"কী এমন বয়েস তোমার? একদিন না একদিন কাউকে না কাউকে নিশ্চয়ই ভালোবাসবে।"

"অদ্দিন কেউ অপেক্ষা করবে না, মলি। আমার মনে হচ্ছে আমি আর একজনকে ভালোবেসে ফেলেছি।"

"কাকে, জিমি?"

"মলি, তোমাকে— ।"

"জিমি!"

কিন্তু জিমি আর অপেক্ষা করলো না। হন্-হন্ করে দৌড় মারলো মোড়ের দিকে। মোড়ের কাছে গিয়ে একবার দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো।

মলি হাত ঢেউ খেলালো।

জিমিও হাত নাড়লো।

তারপর অন্তর্ধান করলো নির্জন নিথর হয়ে আসা বড়ো রাস্তার আধো অন্ধকার আবছায়ায়।

সোমবারদিন অফিস থেকে ফেরার পথে দু'জনে গিয়ে নিউ মার্কেটের ভিতর একটি স্টলে চা ও প্যাটিস খেতে বসলো।

কাল আমার উপর রাগ করেছিলে মলি?"

"হ্যা।"

জিমি একটু চুপ করে রইলো। মুখ ম্লান হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, "সত্যি, আমার ও কথা বলা উচিত হয়নি। যাক, সে কথা ভুলে যাও মলি।"

মলি ঠোঁট টিপে হেসে বললো, "না, জিমি, সে জন্যে নয়।"

"তা'হলে?"

মলি তার কালো গভীর চোখ দুটো জিমির নীল বিষণ্ণ চোখ দু'টির উপর রাখলো। হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটোর কোণে।

আস্তে আস্তে বললো, "জিমি, কাল তুমি আমায় গুড-নাইট-চুমু খেয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলে।"

জিমির হৃদয় দুলতে লাগলো দীঘির বুকে চাঁদের প্রতিবিম্বের মতো।

"তুমি আমায় ভালোবাসো, মলি ?'

"তুমি যেন জানতে না !"

"আমি খুব গরীব, মলি।"

"আমিও।"

জিমি একটু চুপ করে থেকে বললো, "তোমায় একটা কথা বলবো, মলি ? আমার বাবা কে, সে কথা কেউ জানে না। আমার জন্মের সময় আমার মা মারা যান। কেউ ছিলো না যে ডাক্তার ডাকবে বা মা'কে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। আমি প্রায় খেতে না পেয়ে বড়ো হয়েছি।"

মলি জিমির হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো।

"এর জন্যে তুমি আমায় ঘৃণা করবে না মলি ?" জিমি জিজ্ঞেস করলো।

মলি আস্তে আস্তে বললো, "আমি তোমার মতো এতো অভাগা নই জিমি। কিন্তু আমার জীবনও সুখের নয়। আমার বাবা মা'কে ছেড়ে আরেকটি মেয়েছেলের সঙ্গে থাকে, যার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়নি। মা আমায় অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছে।"

"আমায় বিয়ে করবে মলি ?"

'হ্যাঁ—।"

"কবে ?"

"তুমি আর আমি যেদিন এ মাসের মাইনেটা পাবো।"

এত খুশী হোলো জিমি যে মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না।

অনেকক্ষণ পর বললো, "মলি, এসো এক কাজ করি। কালকের দিনটা আমাদের এনগেজমেণ্ট সেলিব্রেট করি।"

"কি ভাবে ?"

"এসো, কাল অফিস পালাই।"

"তারপর ?"

"সকাল বেলা আলিপুর চিড়িয়াখানায়, দুপুরে সিনেমা, রাত্তিরে ফার্পোয় ডিনার। দু'জনে নাচবোও একটুখানি। তারপর দু'বোতল বিয়ার খেয়ে

বাড়ি। হায় রে, যদি শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা করা যেতো! যাক, তার জন্যে ভেবো না মলি, আমাদের বিয়ের রজতজয়ন্তীতে শ্যাম্পেনের ব্যবস্থা হবে, আমি কথা দিচ্ছি।"

"কিন্তু কাল যে অফিসে যেতেই হবে!"

"কেন?"

"জরুরী কাজ আছে—।"

সুতরাং চিড়িয়াখানা আর সিনেমার প্রোগ্রাম বাতিল হোলো। রইলো শুধু ফার্পোয় ডিনারের প্রোগ্রাম।

'কিন্তু বেশ কিছু টাকা খরচা হবে যে!"

"কী আর খরচা হবে," জিমি বললো, "আমি চাকরি করছি আজ এক বছর, এরই মধ্যে একশো টাকার মতো জমিয়েছি। তাব থেকে কিছু ভেঙে খরচা করা যাবে।"

"আমিও কিছু জমিয়েছি," বললো মলি, "দু'জনে মিলে খরচ করা যাবে।"

"না, না, এ খরচা আমার একলার।"

"সে হবে কেন? বিয়ে কি তুমি একলা করছো নাকি?"

তারপরদিন অফিসে সারাদিন কাজে ডুবে রইলো ওরা দুজন, এ টেবিলে মলি, ও টেবিলে জিমি। ট্যাপ ডান্স-এর পদক্ষেপের মতো ছন্দোময় হয়ে উঠলো তা'দের টাইপরাইটার দুটো। আর তারই তালে তালে বেজে চললো তাদের হৃদয়ের অর্কেস্ট্রা।

বেলা শেষ হয়ে আসছিলো। এমন সময় মলির সায়েব তাকে ডেকে পাঠালো। কোম্পানীটা ইউরোপীয়, কিন্তু সম্প্রতি এক বিশেষ ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের লোক এটি কিনে নিয়েছিলো।

মলির সাহেব সেই সম্প্রদায়েরই একজন।

তার ভাঙা ভাঙা ব্যাকরণবিহীন ইংরেজিতে বললো, "মিস টমসন, আমি

তোমার কাজ কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি। বেশ কাজ করছো। তোমার ভালো চান্স পাওয়া উচিত। চান্স পেলে সেটি অবহেলা কোরো না। জীবনে চান্স বেশী আসে না।"

"য়েস্ স্যর—।"

"সত্যি কথা বলতে কি, আজ তোমার একটি চান্স এসেছে। আমার সেক্রেটারি মিস ড্যানিয়েল আজ অফিসে আসেনি। সে অসুস্থ। তুমি হয়তো জানো যে আমরা মাঝে মাঝে আমাদের কোনো কোনো ব্যবসায়ী বন্ধুকে এক একটা ঘরোয়া পার্টি দিয়ে থাকি। সেখানে অনেক অফিশিয়্যাল কথাবার্তা হয়। মিস ড্যানিয়েল অবশ্যি পার্টিতে আমাদের অন্য সবারই মতো একজন অতিথি হিসেবে যোগ দেয়। অফিসের বাইরে আমরা ছোটো বড়ো ভেদাভেদ রাখি না। তুমি কি শর্টহ্যাণ্ড জানো?"

"নো, স্যর।"

"তা'হলে তো মুশকিল। আর কাকে বলা যায়?"

"মিসেস মরিস আছেন, পারচেস্ অফিসারের স্টেনো।"

"নাঃ, ও বড়ো কুৎসিত দেখতে। ওকে দেখলে অতিথিরা টেবিল ছেড়ে পালাবে। তোমার মতো অল্পবয়েসী মেয়েই আমার দরকার। ঠিক আছে, তুমি সব কিছু লং-হ্যাণ্ডে নোট্ করবে। তোমায় ছুটি দিলাম। বাড়ি গিয়ে রেডি হয়ে নাও। আমার গাড়ি সাড়ে সাতটায় গিয়ে তোমায় তুলে আনবে।"

"আজ?"

"হ্যাঁ।—কেন?"

"আজ তো আমি পারবোনা। আমার অন্য কাজ আছে। আর আমি অন্য দিনও যেতে পারবো না।"

"কেন?"

"আমার মা পছন্দ করেন না যে আমি সন্ধ্যেয় পর বাড়ি থেকে বেরোই।"

"ও, আচ্ছা, তুমি যেতে পারো।—আর হ্যাঁ, আমি যে স্টেট্মেণ্টখানি

টাইপ করতে দিয়েছি, সেটি হয়েছে ?—না, না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। ওটা শেষ করে দিয়ে তারপর বাড়ি যাবে।"

সেদিন মলি সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত বসে কাজ করলো।

কিন্তু কাজের ভার অনুভব করলো না মোটেও। জিমি বসেছিলো পাশে।

জিমির সঙ্গে রাত্তিরে খেতে গেল ফার্পোয়। কয়েক পাক নাচলো। তারপর বাড়ি ফিরে স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপরদিন অফিসে সবাই যখন খুব কাজে ব্যস্ত, দাঁতের ফাঁকে সিগারেটের হোল্ডার চেপে মলির ভারতীয় সাহেব তার খাস কামরা থেকে বেরিয়ে এলো।

বেরিয়ে এসে সোজা চলে এলো জিমির টেবিলে।

জিমি উঠে দাঁড়ালো।

"কাল একটি ড্রাফ্‌ট্‌ রিপোর্ট টাইপ করতে দিয়েছিলাম, সেটা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই! দেখি একবার।"

"সেটা এখনো তৈরী হয়নি স্যর।"

"কেন ?"

"লম্বা রিপোর্ট। সময় নেবে।"

"হুম্‌। আচ্ছা, তুমি তো এখন অনেক টাকা কামাচ্ছো, না ?"

"আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, স্যর।"

"আমাদের কানে এসেছে যে আমাদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী আমাদের একজন টাইপিস্টকে ঘুষ দিয়ে আমাদের গভর্ণমেন্ট টেণ্ডারগুলোর কোটেশান জেনে নিচ্ছে। স্বচ্ছল অবস্থা তো তোমার ছাড়া অন্য কোনো টাইপিস্টের দেখছি না।"

"আমার অবস্থা স্বচ্ছল ? আপনি নিশ্চয়ই কিছু ভুল বুঝেছেন স্যর।"

"বলছো ? কিন্তু জিমি ছোকরা, তোমার মতো সামান্য টাইপিস্ট ক্লার্কের

পক্ষে তো ফার্পোয় গিয়ে ডিনার খাওয়া আর নাচবার কথা নয়, তাও একটি সুন্দরী মেয়ে নিয়ে। সুন্দরী মেয়ের তো আজকাল অনেক দাম!"

"স্যর!"

"শাট্ আপ্। এদ্দিন অফিসে চাকরি করছো, এই এটিকেট তুমি আজো শিখলে না যে যেখানে অফিসার আর ডিরেক্টারেরা যায় তাদের সন্ধ্যে কাটাতে, সেখানে পেটি ক্লার্কদের যেতে নেই।"

"স্যর, আমি—।"

"স্যর, তুমি একাউন্ট্স্ থেকে তোমার একমাসের মাইনে নিয়ে চলে যাও। তোমার কাগজপত্র সব মিস্ টমসনকে বুঝিয়ে দাও। তারপর যতো তাড়াতাড়ি পারো এখান থেকে দূর হয়ে যাও।"

নিজের ঘরে ফিরে গেল সায়েব।

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো জিমি। সারা অফিস নিথর নিষ্পন্দ!

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো মলি। কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর গটগট করে সোজা সায়েবের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

"য়েস মিস টমসন! তোমার কী চাই?" জিজ্ঞেস করলো অফিসের সায়েব।

মলি জিজ্ঞেস করলো, "আপনি জিমিকে কি ছাড়িয়ে দিলেন এ জন্যে যে, কাল আমি আপনাদের সঙ্গে না বেরিয়ে জিমির সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, আর আপনি আমাদের ফার্পোয় দেখেছেন?"

"আমায় কি তোমার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে?"

"সে হিম্মত আপনার নেই। আপনি একটি কাওয়ার্ড, আপনি একটি রাস্কেল, আপনি একটি ডার্টি ব্লাডি ওয়ার্ম—"

মলি রাগে হাঁফাতে লাগলো।

সায়েব আস্তে আস্তে বললো, "এ অফিস তোমার যদি ভালো না লাগে, তুমিও তোমার বয় ফ্রেণ্ডের অনুগমন করতে পারো।"

জিমির সঙ্গে সঙ্গে মলিও বেরিয়ে এলো।

°   °   •   •   •

তারপর সুরু হোলো দু'জনেরই জীবন সংগ্রাম।

বিয়ে করবার কথা দূরে থাক, খাবার পয়সা আয় করাই সমস্যা হয়ে উঠলো। মলির মা ছিলো, সে কাজ করতো একটি দোকানে। মলির যদিও বা চলতো জিমির একেবারেই চলতো না। মা'কে লুকিয়ে জিমিকে যতোটা সম্ভব সাহায্য করতো মলি। কিন্তু কিছুদিন পর মলির মা হঠাৎ হার্টের অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। তখন মলির দুর্গতি হোলো সব চেয়ে বেশী।

সেই দুর্দিনের প্রথম দিকে মলির সান্ত্বনা ছিলো জিমির সাহচর্য। সিনেমায় বা টী-রুমে বা ডান্সে যাওয়া আর হয়ে উঠতো না, কিন্তু ময়দান খোলা পড়েছিলো তাদের জন্যে। প্রত্যেকদিন বিকেলে ওরা সেখানেই ঘুরে বেড়াতো আর বিহ্বল কোকিলের তীক্ষ্ণ কুহু-কুজনের মায়ায় ডুবু-ডুবু সূর্য যখন ময়দানের পশ্চিমের গাছগুলোর ডালপালা আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে চাইতো আরো কিছুক্ষণ, তখন ঘাসের উপর বসে চীনে বাদাম খেতে খেতে আগামী দিনের রঙিন গল্প করতো ওরা দু'জনে।

তারপর একদিন মলি লক্ষ্য করলো, জিমির চেহারা আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। তার চোখে সেই লাজুক দৃষ্টি নেই, সে চাউনি অনাহার অর্ধাহারে ধারালো হয়ে উঠছে ডাস্টবিনের পাশের কুকুরের মতো। দূর থেকে মলি যাদের সঙ্গে মিশতে দেখলো জিমিকে, তারাও যে ভদ্রশ্রেণীর লোক নয়, তাও সে বুঝে নিলো দু'দিনে।

মলি তা'কে একদিন বোঝালো, দু'দিন বোঝালো, তিন দিন বোঝালো।

জিমি শুধু বললে যে সে পয়সা কামাবার চেষ্টা করছে।

মলি জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি আমার কথা একটুও ভেবে দেখছো না?"

জিমি সে কথার উত্তর না দিয়ে অন্য কথা পাড়লো।

দিন কয়েক পর জিমি বললো, সে একটি চাকরি পেয়েছে। খুব খুশী হোলো মলি।

জিমি তাকে নিয়ে গেল সিনেমায়, চা খাওয়ালো নিউমার্কেটে।

তারপর মলিও চাকরি পেলো চৌরঙ্গির এক দোকানে।

মাইনে খুব সামান্য। তা'হলেও চাকরি। কিন্তু দিনে দশঘণ্টা কাজ। বেশী বেরুনোর উপায় নেই। জিমিও আসতে পারে না। তারও নাকি কাজের চাপ। জিমি চিঠি লিখতো মলিকে। মলিও চিঠি লিখতো জিমির কাছে।

এমন সময় মলির জীবনে এলো জনি মার্টিন।

জনির বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। সে নাকি মলির মায়ের কোন এক বন্ধুর ছোটো ভাই। দেখে শুনে মনে হয় পয়সাকড়ি আছে। দু'পাঁচ দশ টাকা সাহায্য করে মলির মা'কে। শোনা যায়, তার নাকি নানারকম কি সব ব্যবসা।

মলির মা বলেন, "মলি, তুই জনিকে বিয়ে কর, সুখে থাকবি।"

মলি উত্তর দিলো, "না।"

জনি মার্টিন বয়েসেও বেশ কিছু বড়ো।

ওকে নিয়ে তাই খুব হাসাহাসি করলো জিমি আর মলি।

তারপর কিছুদিন আবার জিমির দেখা নেই।

জিমি যেখানে থাকতো মলি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোলো।

জিমি আরেকজনের সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করে থাকতো।

সে লোকটি মলিকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করে বললে, জিমি একটু বেরিয়েছে। ফিরতে বেলা হবে।

কয়েকদিন পর মলি আবার গেল জিমির ওখানে! শুনলো জিমির ফিরতে রাত হবে।

আরও কয়েকবার গিয়ে তা'কে পেলো না।

তখন মলি একটি চিঠি লিখলো জিমিকে।

তা'র কোনো উত্তর এলো না।

মলি পর পর আরো দু'টো চিঠি লিখলো কয়েকদিন অপেক্ষা করবার পর।

এবারেও উত্তর এলো না।

আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করবার পর মলি আরেকটি চিঠি লিখলো। তা'র মধ্যে একথা সেকথার পর লিখলো, "তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার জরুরী দরকার। কিন্তু দেখা তো কিছুতেই হয়ে উঠছে না। তোমার ওখানে গেলেই শুনি, তুমি বেরিয়ে গেছ, তুমি খুব ব্যস্ত। যাক, কেন দেখা করতে চাই সেকথা অগত্যা চিঠিতেই লিখতে হচ্ছে। আমাদের আজকের দিনের এ একটা ট্রাজেডি যে যদিও অর্থনৈতিক কারণে বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম, এবার সামাজিক কারণে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। আমি চাই না যে আমার সন্তান তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বাবা বলে সম্বোধন করুক। সে যদি তোমার মনঃপুত না হয়, তা'হলে অগত্যা আমায় জনি মার্টিনকেই বিয়ে করতে হবে। যাই হোক, আমায় এসে একবার বলে যাও তোমার কী অভিপ্রায়। লাইট হাউসে রোমিও জুলিয়েট হচ্ছে। যদি কাল আসো তো একসঙ্গে দেখতে যাওয়া যাবে—মলি।"

জিমি এলো তারপরদিন। কি রকম যেন রুক্ষ চেহারা হয়েছে।

"এদ্দিন ছিলে কোথায়?" মলি জিজ্ঞেস করলো।

সে কথার উত্তর না দিয়ে জিমি বললো, "তুমি যে মা হতে চলেছো সে কথা আমায় এদ্দিন বলো নি কেন?"

"তোমায় পেলাম কোথায় যে বলবো?"

জিমি চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর বললে, "জীবনটা আবার নতুন করে স্নুরু করতে হবে।"

"কেন?"

জিমি আস্তে আস্তে মলিকে সব কথা বললো। চাকরি-বাকরি সব বাজে কথা। জিমির ওসব কিছু ছিলো না। সে যে সব কাজ করতো,

সে সব অসামাজিক, বে-আইনী। তারই একটির দরুণ সে সম্প্রতি দিন কুড়ি পঁচিশ হাজত বাস করে এসেছে।

"দলটিকে ছাড়তে হবে মলি! কোথাও কাজকর্ম একটা দেখতে হবে। এদ্দিন যা' করছিলাম, বৌ আর কচি ছেলে থাকলে সে তো আর চলবে না।"

মলি অবাক হয়ে শুনছিলো।

জিমি মলির হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো।

বললো, "তুমি দুঃখ কোরো না মলি। এবার দেখে নিও যে আমি ভালো হয়ে যাবো। তোমাদের জন্যেই যে ভালো হ'তে হবে আমাকে।"

জিমি কয়েকদিন আগেরই মতো যাওয়া আসা করলো। তারপর আবার তার দেখা নেই।

মলি খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলো, সম্প্রতি একটি মোটর গাড়ি চুরির ব্যাপারে জিমি হাতে হাতে ধরা পড়েছে। বাঁচবার রাস্তা নেই। জেল হয়ে যাবে।

"কিন্তু সে যে আমায় কথা দিয়েছিলো—!" নিজের মনে গুমরে উঠল মলি।

মলির নামে চিঠি ছিলো একটি: "মলি—আমায় ক্ষমা কোরো। টাকার দরকার বলে শেষবারের মতো একটি অন্যায় করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। তুমি যদি আমার জন্যে আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করো তো ভালোই। যদি না করো তো আমায় কিছু বলবার নেই।"

মলি দাঁতে দাঁত চেপে নিজের মনে বললো, "কিন্তু সে যে আমায় কথা দিয়েছিলো—।"

টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললো চিঠিখানি।

জিমির জেল হয়ে গেল চার বছরের জন্যে।

মলি বিয়ে করে ফেললো জনি মার্টিনকে।

সেই জিমি এদ্দিন পর হঠাৎ টেলিফোন করলো মলিকে। তখন সবে লাঞ্চের ছুটি হয়েছে, এমন সময় টেলিফোন এলো।

"মলি ?"

"হ্যাঁ। তুমি কে ?"

"জিমি।"

"জিমি ! !"

"হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে অনেক দরকার আছে। কদ্দিন দেখা হয়নি। পাঁচ বছর, না ? ছেলেটি কতো বড়ো হোলো ?"

মলি কোনো উত্তর দিলো না।

"মলি, এক কাজ করো। বিকেলে অফিস ফেরত পার্ক স্ট্রীটের সেই টী-রুমটিতে এসো, হ্যাঁ, যেটিতে তুমি আমি প্রায়ই বসতাম।"

"কিন্তু আমার যে অন্য কাজ আছে—।"

"ওসব আজকের মতো বাদ দাও মলি। এসো, কেমন ?" বলে জিমি আর উত্তরের অপেক্ষা করলো না। লাইন ছেড়ে দিলো।

মলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিকেলে সেই টী-রুমে গিয়ে উপস্থিত হোলো।

"আমি জানতাম তুমি আসবে," জিমি বললো।

মলি তাকিয়ে দেখলো জিমিকে।

একটু মোটা আর বেশ একটু রাশভারী হয়েছে জিমি। চোখ দুটো এখনো নীল, কিন্তু অক্সি-এসিটিলিন ব্লো-পাইপের মতো দৃষ্টি। পরনে দামী স্যুট, দামী টাই, দামী জুতো।

জিমি তাকিয়ে দেখলো মলিকে।

এখনো সেই আগের মতো সুন্দর দেখতে, তবে তার চোখের সেই চপল হাসি আর নেই, অভাব অনটনের কালি পড়েছে চোখের নিচে। সস্তা ছিটের ফ্রক, যদিও ছাঁট খুব স্মার্ট। পায়ে সস্তা সুয়েডের জুতো, গোড়ালির এক পাশ ক্ষয়ে-যাওয়া। কিন্তু সেই রক্তিম সূর্যের মতো ঠোঁট, প্রথম ঊষার মতো গায়ের রং আর এপ্রিলের আকাশের মতো প্রশান্ত দৃষ্টি এখনো আছে।

"আমি জানতাম তুমি আসবে," জিমি বললো।

"স্থির করেছিলাম আসবো না," মলি উত্তর দিলো।

"কিন্তু এলে তো।"

"এলাম শুধু তোমায় এটুকু বুঝিয়ে দিতে যে আমি তোমায় এতখানি গুরুত্ব দিই না যে তোমায় এড়িয়ে চলতে হবে।"

জিমি হাসলো।

"অন্য যে কোনো পুরোনো চেনা-জানা আমার কাছে যা," মলি বললো, "তুমিও এখন তাই, জিমি, তার বেশী কিছু নয়।"

"তুমি তো জনি মার্টিনকেই বিয়ে করেছো শেষ পর্যন্ত," জিমি জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ।"

"প্রথম ছেলেটি কোথায়?" জিমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলো। খুব নরম, খুব স্নেহপ্রবণ শোনালো তার কথাগুলো।

"নষ্ট হয়ে গেছে," সঙ্কোচ-বিহীন পরিষ্কার উত্তর এলো।

কাঠিন্যের ছায়া খেলে গেল জিমির মুখের উপর।

"জনি মার্টিন কি রকম লোক?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"খুব ভালো।"

"ওকে তুমি এখন খুব ভালোবাসো বুঝি?"

"খুব। ও আমার স্বামী। আমাদের একটি মেয়ে আছে। খুব মিষ্টি মেয়ে।"

জিমি একটি দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করতে গেল।

পারলো না।

"জীবনটাকে আর আগের দিনগুলোতে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, না মলি?"

"অন্তত তোমার আমার সম্পর্কে সে চেষ্টা নিরর্থক।"

"হুঁম।" জিমি চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবলো।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, "যাক, যা হয়ে গেছে—হয়ে গেছে। তা'

নিয়ে আর হা হুতাশ করে লাভ নেই। আমার কাজটা খুব সহজ হয়ে গেল।"

"কি কাজ ?"

"যে কাজের জন্যে তোমায় ডাকিয়ে এনেছি। ভয় ছিলো যে আমার জন্যে তোমার যদি কোনো দুর্বলতা থাকে তো সে কাজ হয়তো আমি পেরে উঠবো না। সে ভয়টা ভাঙলো।"

"কি কাজ শুনি ?" একটু উদ্বিগ্ন শোনালো মলির কথাগুলো।

"আমি যখন হাজতে ছিলাম, "জিমি আস্তে আস্তে বললো, "তুমি আমায় চারটে চিঠি লিখেছিলে। মনে আছে ?"

"হ্যাঁ।"

"সে সব চিঠির ভাষা আর বিষয়বস্তু মনে আছে ?"

মলির মুখ দিয়ে কথা সরলো না। একটা অজানা আশঙ্কার ছায়া পড়লো তার মনে।

"ভাবছি চিঠিগুলো জনি মার্টিনকে দেখাবো," জিমি আস্তে আস্তে বললো।

"ও, এই ব্যাপার ?" মলি খুব নির্বিকার ভাব দেখবার চেষ্টা করলো, "তাতে কি জনি খুব উৎসুক হবে ? জনিকে চেনো না। ও আমার বিয়ের আগেকার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না।"

জিমি পাইপ ধরিয়ে নিলো।

তারপর বললো, "ও তো জানবে না এ চিঠিগুলো বিয়ের আগের। ও হয়তো জানবে যে, যেহেতু তার বয়েস অনেক বেশী, আর তুমি এখনো কমবয়েসী, তুমি জিমি নামে একটি লোকের সঙ্গে—"

"জিমি !"

জিমি হাসতে সুরু করলো।

বললো, "জনিকে তুমি আমার কথা কোনোদিন বলো নি, সে আমি জানি। ও আমায় কোনোদিন দেখেও নি। সুতরাং—"

"জিমি ! তোমার কি ধারণা জনি আমায় বিশ্বাস না করে তোমায় বিশ্বাস করবে ?"

"করবে। আমার হাতে যখন এসব চিঠি আছে তখন আমার সম্বন্ধে কৈফিয়ত তো তোমায় দিতে হবে। আমি তো জানি তুমি ওকে আমার কথা আগে বলো নি।"

"তুমি কি চিঠির তারিখগুলো বদলে ফেলবে?"

"না, তুমি তো চিঠিতে শুধু তারিখই দিয়েছো, বছর তো দাও নি। সেই চিঠিগুলো সব এপ্রিল মাসে লেখা। সে যে কোনো বছরের এপ্রিল হতে পারে। এখন মে মাস, গত মাসের ব্যাপারও হতে পারে। আমি সে সব চিঠি এমন যত্ন করে রেখেছি যে বোঝাই যায় না সে সব চিঠি পুরোনো।"

"না, না, জনি কক্ষণো তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। আমি বলবো যে এগুলো বিয়ের আগের ব্যাপার।

"বেশ তো। বিশ্বাস নাই বা করলো। তখন তোমার চার নম্বর চিঠি খানি পড়ে সে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে।"

"কোন চিঠি?"

"যে চিঠিতে তুমি লিখেছিলে—অর্থনৈতিক কারণে বিয়েটা যদিও বা ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম, এবার সামাজিক কারণে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। আমি চাই না যে আমার সন্তান তোমায় ছাড়া আর কাউকে বাবা বলে সম্বোধন করে। সে যদি তোমার মনঃপূত না হয় তা'হলে অগত্যা আমায় জনি মার্টিনকেই বিয়ে করতে হয়।—মনে পড়ে? মার্টিন এ চিঠি পড়ে কি ভাববে বলো তো?"

মলির শরীর হিম হয়ে গেল। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো জিমির মুখের দিকে।

অনেকক্ষণ পর শুকনো গলায় বললো, "এ কাজ তোমার পক্ষে সম্ভব আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি জিমি।"

'তোমার পক্ষে জনি মার্টিনকে বিয়ে করা সম্ভব, সে কথা আমিও ভাবতে পারি নি মলি।" একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো জিমি। "একটা সহজ জীবন পেলাম না। সুতরাং আমিও আর সহজ নই। কী করবো, নানা রকম চুরি

জোচ্চুরি করে পয়সা কামাতে হয়। এসব করতে দুঃখে বুক ফেটে যায় কিন্তু না করে উপায় কি? আমার জন্যে তো কোনোদিন কারো কোনো দুঃখু হয়নি। তাই আমারও কোনো মায়া মমতা নেই।"

"তোমার সহজ জীবন পাওয়ায় বাধা দিয়েছিলো কে? আমি না অফিসের সায়েব?"

শুনে জিমি হাসলো।

"মলি, শুনলে খুশী হবে, তার কান ধরে সেদিন পাঁচ হাজার টাকা বা'র করে নিয়েছি। সব খরচা হয়ে গেছে।"

"কিন্তু আমার অপরাধ?"

"আমার যখন জেল হোলো, তখন তুমি আমার ছেলে পেটে নিয়ে আরেকজনকে বিয়ে করেছো। আমার জন্যে তোমার একটুও দুঃখ হয়নি।"

মলি অতি কষ্টে চোখের জল সামলে নিলো।

তারপর বললো, "কিন্তু তার আগে তুমি আমায় কথা দিয়ে কথা রাখোনি। তুমি বলেছিলে, কোনো অন্যায় কাজ আর করবে না। আর তারপরদিনই গাড়ি চুরি করলে!

"তোমারই জন্যে করেছিলাম মলি। নতুন সংসার পাততে অনেক টাকা লাগে।"

"আমি তো সেভাবে ঘর বাঁধতে চাইনি, জিমি!"

"তুমি কি এসব নরম কথা বলে আমার মন ভেজাতে চাইছো যাতে জনি মার্টিনকে আমি এসব চিঠি না দেখাই?"

"ওকে এসব দেখিয়ে তোমার কী লাভ?" মলি অনুনয় করে বললো, "আমার জীবনেব সুখ-শান্তি নষ্ট করে দেওয়া ছাড়া তোমার আর তো কোনো উপকার হবে না।"

"হয়তো তাই আমি চাই। কিম্বা কিছু আর্থিক উপকারও হতে পারে।"

"কি রকম?"

"জনি তো শুনেছি ব্যবসা করে। একটু খোঁজ করলেই বন্ধুবান্ধবদের

সন্ধান পেয়ে যাবো। এসব ব্যাপার ওরা জানতে পারলে হাসাহাসি করবে। সেটা জনি পছন্দ না'ও করতে পারে। শুনেছি বিশ্বস্ত স্বামীরা এ ধরণের। চিঠিপত্র অনেক সময় টাকা দিয়ে কিনে নেয়।"

"তোমার আসল মতলব তা' হলে কিছু পয়সা কামানো?"

"আজকাল তো সবারই একমাত্র উদ্দেশ্য কিছু পয়সা কামানো।"

"জিমি!" মলি আস্তে আস্তে বললো, "আমি যে জিমিকে চিনতাম সে তুমি নও। তুমি জানোয়ারেরও অধম।"

"যদ্দিন মানুষ ছিলাম তদ্দিন উপোস করেছি," জিমি পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দিলো, "এখন জানোয়ারেরও অধম হয়ে নানারকম ভাবে কিছু টাকা উপায় করছি। আমি আমার সম্বন্ধে একটু'ও লজ্জিত নই।"

মলি চুপ করে তাকিয়ে দেখলো জিমিকে।

জিমি এক চোখ বুঁজে পাইপে কয়েকটা টান দিলো।

বয় এসে এক পট চা দিয়ে গেল। জিমি নিজের জন্যে চা তৈরী করে নিলো এক কাপ। মলি চায়ের পটের দিকে তাকালোই না।

"কী শর্তে আমার চিঠিগুলো তুমি আমায় ফিরিয়ে দেবে?" মলি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

"তোমার স্বামীর কাছ থেকে আমি খুব কম করে হলেও এক হাজার টাকা বা'র করে নিতাম। যদি চিঠিগুলো তুমি কিনে রাখতে চাও তো শ'পাঁচেক টাকা পেলে দিয়ে দেবো।"

"আমি সামান্য চাকরি করি জিমি। অতো টাকা আমি পাবো কোথায়?"

"আমি আমার লাস্ট অফার দিয়ে দিয়েছি।"

মলি ভাবলো একটুখানি।

তারপর বললো, "বেশ, তাই পাবে। তবে একসঙ্গে সব টাকা দিতে পারবো না।"

"বেশ, প্রথম তিনটে চিঠি একশো একশো করে। শেষ চিঠিখানি দুশো।

আমি তোমায় দু'চার দিন অন্তর অন্তর টেলিফোন করে জেনে নেবো তুমি কবে কবে আমায় টাকা দিচ্ছো।''

মলি আবার ভাবলো একটুখানি। সেদিন সে মাইনে পেয়েছে এলাওএন্স ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রায় একশো পঁচাত্তর টাকা।

আস্তে আস্তে ব্যাগ খুললো। বা'র করলো একশো টাকার নোটখানি।

মেয়ের ফ্রকগুলো ছিঁড়ে গেছে। এ মাসে তা'কে নতুন ফ্রক কয়েকটি না করিয়ে দিলে নয়। ক্যাভেণ্টার্সে'র দুধের কুপন কেনবার পয়সাই বা আসবে কোত্থেকে ?

হাত কাঁপতে লাগলো।

না। জিমির সামনে কোনো দুর্বলতা সে দেখাবে না। নোটখানি টেবিলের উপর রাখলো। দেখলো জিমির হাতে নীল কাগজে লেখা ভাঁজ করা একখানি চিঠি। সেটি নিয়ে খুলে দেখলো, তারই নিজের হাতের লেখা। কী সব লিখেছিলো সে ? এ লোকটাকেই লিখেছিলো নাকি ?

মলির সমস্ত শরীর জ্বলতে লাগলো।

চিঠিখানি ব্যাগে পুরে উঠে পড়লো সে। গট গট করে বেরিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক পুরোনো কথা মলির মনে পড়ে গেল।

বিয়ে করে ভেবেছিলো স্বচ্ছল জনি মার্টিনের সংসারে সুখ না হোক একটু সোয়াস্তি পাবে। ছেলেবেলা থেকেই মলি অভাবের মধ্যে বড়ো হয়েছে। মা উল বুনে, ছোটোখাটো চাকরি বাকরি করে মলিকে বড়ো করেছে। জিমিকে পেয়ে অভাব অনটন সম্বন্ধে তার সমস্ত ভয় কেটে গিয়েছিলো, জিমিকে হারিয়ে আরো বেশী হয়ে ফিরে এসেছিলো সেই ভীতি।

জনি মার্টিনকে বিয়ে করে যখন দেখলো তার বাইরের বোলচাল সব লোক দেখানো, তখন অনেক খোঁজাখুঁজি করে এই চাকরি তাকে যোগাড় করতে হয়েছিলো। তখন এক এক সময় মনে হোতো তাকেই যদি চাকরি

করে খাওয়াতে হয় স্বামীকে, জিমির জন্যে অপেক্ষা করে থাকলেই তো পারতো।

কিন্তু সে পথ বন্ধ করেছিলো জিমি নিজেই, নিজের জেলে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে।

নিজের মর্যাদা বজায় রাখতে বিয়ে না করে মলির উপায় ছিলো না। তাই জনির বিরুদ্ধে, সবার বিরুদ্ধে, একটা তিক্ত বিক্ষোভ এসেছিলো তার মনে।

কিন্তু আজ কী করে যেন কেটে গেল বিক্ষোভের মেঘ। বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে হোলো তার স্বামী জনি মার্টিনের চেয়ে আপনার আর কেউ নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজের মেয়ে এমিকে বুকে চেপে ধরে আদর করবার জন্যে, জনির পাশে বসে তার কাঁচা-পাকা চুলে আঙুল বুলোনোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো মলির মন।

তবু বা'র বা'র ফিরে ফিরে এলো অনেকদিন আগের পুরোনো একটি সিনেমার গান :

You are mine—I love you—
You are mine—in my dreams—
You are mine—only mine—
In my dreams—every night…।

জিমি সব সময় শিষ দিয়ে ভাঁজতো এই সুর। ওরা দুজনে কতোদিন একসঙ্গে এ গানটি গেয়েছে। ক্লাবের ফ্লোরে অন্য সবার জনতার মধ্যে জিমি আর মলি কতোদিন নেচেছে এ গানের সুরের সঙ্গে।

—In my dreams—every night…

জোর করে অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করতে লাগলো মলি। বুড়ি জনসনের জুতো নেই। ও একজোড়া জুতো চেয়েছে। ওর ছেলে চলে গেছে নিউজিল্যাণ্ড। মায়ের খোঁজ নেয় না। ওকে এক জোড়া পুরোনো জুতো দিয়ে দিলেই চলবে। পাশের বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে থাকে গোয়ানীজ মেয়ে ডাফ্‌নি। ওর স্বামী বছরখানেক বেকার বসে থাকবার পর মাস ছয়েক আগে কোথায়

যে ফেরার হয়েছে কোনো খোঁজ নেই। দিন কয়েকের মধ্যেই ডাফ্‌নির ছেলে হবে। ওর কেউ নেই যে ওকে দেখে। ছ'মাসের বাড়ি ভাড়া বাকী। বাড়িওয়ালা হামিদ খান প্রত্যেকদিন এসে গালমন্দ করছে নিচের তলার মিসেস স্মিথের মেয়েটি এখনো তার কৈশোর কাটিয়ে ওঠেনি, কিন্তু এরই মধ্যে সে তিনপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে এমন নোংরামি স্থরু করেছে যে মিসেস স্মিথ বেগম বাহার লেন্‌এর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজে বেরুতে পারে না নিন্দের জন্যে, কারো কাছে টাকা ধার চাইতে পারে না। মেয়েটিকে একদিন বকে দিতে হবে, স্থির করলো মলি।

……In my dreams—every night……আঃ, আবার! অফিসের বুড়ো ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক কালীবাবুকে হেডক্লার্ক দত্তবাবু সময় ফুরোনোর আগেই রিটায়ার করিয়ে দিতে চাইছেন। কালীবাবু বলছে, মলি মেমসায়েব বড় সায়েবের প্রিয়পাত্রী। যদি একটু বলে দেয়…। হায় রে, কি রকম প্রিয় কালীবাবু যদি জানতো! তার নিজের চাকরিরই ঠিক নেই! যাক, কাল একবার ম্যাগিট সাহেবকে গিয়ে ধরতে হবে……In my dreams—every night……আঃ, জ্বালাতন!

"গুড ঈভনিং মলি—।"

"গুড ইভনিং মিসেস জনসন।"

মলি তাকিয়ে দেখলো কখন এসে গেছে বেগম বাহার লেন্‌এ। এ পাশে ও পাশে চেনাশোনা অনেকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। কেউ ফিরছে অফিস থেকে, কেউ বা বেরুচ্ছে সেজেগুজে।

ওয়াই-ডব্‌লিউ-সি-এ'র সামনে দিয়ে আসতে আসতে দেখলো ফুটপাথের একপাশে দাঁড়িয়ে ঈভা বারওয়েল আর তার ইণ্ডিয়ান বয় ফ্রেণ্ড—কী যেন তার নাম? হ্যাঁ, অরুণ বোস,—গল্প করছে।

মলিকে দেখে অরুণ একটু নড্‌ করলো।

"হালো মলি," বললো ঈভা।

তারপর আবার মশগুল হয়ে গেল নিজেদের কথাবার্তায়।

মলির মনে পড়লো একদিন ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে সে আর জিমিও এমনিতরো অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে—না, কী হবে ওসব কথা ভেবে……In my dreams—every night……কী মুশকিল, এই ভুতুড়ে সুর পাগল করে তুলবে দেখছি, মলি ভাবলো।

তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে বাড়ি পৌঁছে দুমদাম করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকলো।

হুড়মুড় করে ছুটে এলো মলির মেয়ে এমি। .

"মামি, মামি, আমার জন্যে কী এনেছো?—"

"আজ কিছু আনিনি ডার্লিং। কাল একটি মস্তো বড়ো টেডি-বেয়ার নিয়ে আসবো।"

ওর স্বামী জনি মার্টিন আজ যেন একটু সকাল করেই ফিরেছে।

সে শিষ দিতে দিতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো……In my dreams—every night……

"কী ব্যাপার? খুব যে খোশমেজাজ দেখছি।" নিজের অজান্তেই মলির গলার স্বর অত্যন্ত তেতো হয়ে বেরুলো।

জনি উত্তর দিলো, "আজ একটি পার্টি আছে। মাইনে পেয়েছো না? আমায় গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দিতে পারো? পরশু দিয়ে দেবো।"

মলি দশ টাকার একটি নোট বা'র করে দিয়ে বললো, "এই স্পেয়ার করতে পারি, এর বেশী নয়।"

জনি টাকাটা নিলো।

তারপর বললো, "তুমি এত কঞ্জুষ জানলে কে তোমায় বিয়ে করতো?"

মলি চোখের জল ঠেকিয়ে রাখলো। বললো, "জনি, আজ না হয় অন্য কোথাও নাই বা গেলে। আমি তোমায় নিয়ে একটি সিনেমায় যাবো ভাবছি।"

"পুঃ। একটি নতুন বয় ফ্রেণ্ড যোগাড় করে নাও মলি। তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি।"

গলায় কালো বো ও বেঁধে গায়ে সাদা জ্যাকেট চাপিয়ে বেরিয়ে গেল জনি মার্টিন।

বেরিয়ে গেল ঠিক সেই সুরটি ভাঁজতে ভাঁজতেঃ

You are mine—only mine

In my dreams—every night……

মলি সামান্য কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছিলো। হিসেব করে দেখলো এক-শো আশী টাকার মতো আছে। দিনদুয়েক পর সে' টাকা তুলে আনলো। গোটা কুড়ি টাকা ধার করলো অফিসের একজন সেল্‌স্‌ম্যানের কাছ থেকে। দু'শো টাকা দিয়ে পরের শনিবার জিমির কাছে থেকে আর দুটো চিঠি নিয়ে এলো।

আর একটি বাকী।

জিমি বললে, "আগামী শুক্রবারের আগে আমার বাকী টাকাটা চাই, তা' নইলে সেটি জনি মার্টিনের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।"

"পেয়ে যাবে," মলি উত্তর দিলো।

প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে দু'শো টাকা ধার পাওয়ার জন্যে সে আবেদন-করে রেখেছে।

জিমি বললো, "শুক্রবার দিন মিশন রো'র মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। সেখানে এসে দেখা কোরো পাঁচটার পর।"

কিন্তু শুক্রবার দিন জিমি সোজা মলির অফিসে চলে এলো সাড়ে চারটের সময়।

বললো, "টাকাটা দাও।"

"তুমি এখানে কেন এলে?"

"মিশন রো'র মোড়ে আমার দাঁড়ানোটা বিপজ্জনক হয়ে উঠলো বলে," জিমি উত্তর দিলো। "ওখানে আমার চোখের সামনে একজন এ্যাংলো-

ইণ্ডিয়ান চ্যাপি আরেকজনের একটি গাড়ি চুরি করে পালালো। কেউ ধরতে পারলো না তাকে। গাড়ি চুরির ব্যাপারে একবার আমিও ধরা পড়েছিলাম। তার উপর ওখানে আমার দাঁড়িয়ে থাকবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তাই আমিও সরে পড়লাম, তা' নইলে পুলিশে হামলা করতো। দাও, টাকাটা দাও।"

জিমিকে নিয়ে বাইরে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো মলি।

বললো, "জিমি, আমায় আর দুদিন সময় দাও। টাকাটা সোমবারদিন নিও।"

"কেন, তুমি যে বলেছিলে আজ দেবে?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম। টাকাটা যোগাড়ও করেছিলাম, কিন্তু জরুরী দরকারে ও টাকা খরচা হয়ে গেছে। প্লীজ জিমি, সোমবার নিও। আমি এ্যাডভান্স মাইনের জন্যে দরখাস্ত করেছি।"

"সে হয় না মলি, আমি অনেক সময় দিয়েছি। আজ আমি বম্বে যাচ্ছি। আমার টাকার দরকার।"

"প্লীজ জিমি!"

"বেশ, আর দুঘণ্টা সময় দিচ্ছি। সাড়ে ছ'টার সময় তুমি পার্ক স্ট্রীটে সেই টী-রুমে এসো। সেখানে থাকবো।"

মলির মুখে দিয়ে কথা সরলো না।

জিমি বলে গেলো, "আমি পৌণে সাতটা পর্যন্ত তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। যদি তার মধ্যে না আসো সোজা তোমার বাড়িতে গিয়েই উপস্থিত হবো। তোমার ঠিকানা আমি জানি। জনি বাড়ি থাকবে নিশ্চয়ই।"

জিমি চলে গেল।

সে যে এতটা হৃদয়হীন হবে মলি ভাবতে পারে নি। বিশেষ জরুরী দরকারে তার টাকাটা খরচা হয়ে গেছে। ভেবেছিলো দুচারদিন সময় পাবে জিমির কাছ থেকে।

কিন্তু এখন উপায়?

একমাত্র উপায় জনিকে গিয়ে আগের থেকে সব খুলে বলা।

হয়তো ফল হবে না।

কিন্তু অন্য কোনো পথ নেই।

এখন কোথায় পাওয়া যাবে জনিকে, মলি ভাবলো। তারপর তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো অফিস থেকে।

জিমি মলির জন্যে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। তারপর একটি ট্যাক্সি নিয়ে চললো মলিদের পাড়ার দিকে।

বেগম বাহার লেন তার চেনা পাড়া।

মোড়ের কাছে এসে সে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো। নম্বর ধরে খুঁজে বা'র করলো বাড়িটি, তবু তক্ষুণি উঠলো না, কাছেই একটি পানের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, জনি মার্টিনের বাড়ি কোনটা।

পানওয়ালা দেখিয়ে দিলো, আর বললে যে সে এখনো ফেরে নি। ফেরার পথে প্রত্যেকদিন সে তার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে যায়।

জিমি তার কাছ থেকে একটি লেমনেড কিনলো।

একটু পরেই সে পথে ঢুকলো একটি গাড়ি, খুব চেনা গাড়ি মনে হোলো।

ভালো করে তাকিয়ে দেখে এ সেই গাড়িটি, যেটি চুরি হয়ে গেছে মিশন রো থেকে।

গাড়ি এসে থামলো মলিদের বাড়ির সামনে। একটি লোক বেরিয়ে এসে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

জিমি মনে মনে হাসলো।

লোকটিকে সে চিনেছে। এ সেই লোকটি, যে মিশন রো' থেকে গাড়ি চুরি করে পালিয়েছে।

"ওই লোকটিই জনি মার্টিন সাহাব," বললো পানওয়ালা, "কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, সিগারেট নিতে এলো না!"

বটে! তা'হলে এই হোলো জনি মার্টিনের ব্যবসা!

রাস্তা পেরিয়ে এসে জিমিও সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো।

দরজা খোলাই ছিলো।

জিমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লো।

বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো জনি আর মলি।

…"এত দেরী করে ফিরলে কেন? তোমায় যে আমার ভীষণ দরকার।"

"খুব কাজ। আবার বেরুবো? আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি।"

"কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে দুটো জরুরী কথা আছে। বোসো জনি।"

বসলো ওরা দুজনে।

"জনি, তুমি আমায় ভালোবাসো?"

"আঃ, এ আবার কি ননসেন্স। ও সব কথা পরে হবে।"

"না, বলো আমায়।"

"কেন?"

"দরকার আছে।"

জনি একটু কী রকম যেন হয়ে গেল।

"তুমি কি কিছু জানো নাকি?" গলা নামিয়ে সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করলো সে।"

"কি জানবো," চোখ তুলে মলি জিজ্ঞেস করলো।

"আচ্ছা। না, না, কিছু না। বলো।"

"জনি, বিয়ের আগে আমি একটি ছেলেকে ভালোবাসতাম।"

"তারপর?"

"সে ফিরে এসেছে," মলি আস্তে আস্তে বললো।

"তাই নাকি?" জনি হঠাৎ যেন খুব খুশী হয়ে উঠলো। "তাই নাকি? যাক, ভালোই হোলো। নিশ্চয়ই, আমি কিছু মনে করবো না। জানো, তোমায়ও আমি একটি কথা বলবো বলবো ভাবছিলাম। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করে খবরটা ভাঙবো। দেখ মলি, জীবনটা এরকমই। জানো, সম্প্রতি

আমিও একটি মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছি। ওর অনেক টাকা। কদ্দিন আর তোমার উপর বসে খাবো। তোমায় নিস্কৃতি দেওয়াই ভালো।"

"কি বলছো জনি?" অস্ফুট গলায় মলি বললো।

"হ্যাঁ। আর মজার কথা কি জানো? সেই মেয়েটির নামও মলি। মলি পার্কার। তোমার নেম্-সেক্।"

বাইরে দাঁড়িয়ে জিমি সব কথাই পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলো।

শুনে সে মনে মনে কপালে করাঘাত করলো। দুশো'টা টাকা পাওয়ার আশা গেল। জনি মার্টিন আর মলির প্রেমপত্রে আগ্রহান্বিত হবে না।

"হ্যাঁ, শোনো," জনির গলার আওয়াজ এলো ভেতর থেকে, "আমায় একশোটা টাকা ধার দাও তো। আমি পরশু ফিরিয়ে দেবো। আমি কথা দিচ্ছি ডিভোর্সটার ব্যবস্থা শিগ্‌গিরই করে ফেলবো। কোনো হাঙ্গামা হবে না। তোমার ফিরে-আসা বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে তুমি সুখে থাকবে। দাও, টাকা দাও একশো।"

"আমার কাছে টাকা নেই, কিছু নেই।"

"নেই? দেখ মলি, আমার কাছে মিছে কথা বোলো না। আজ সকালে তুমি পাশের বাড়ির সেই গোয়ানীজটার বৌ ডাফ্‌নি'কে দু'শো টাকা ধার দাও নি?"

"ওর ছেলে হবে জিমি। ওর স্বামী ওকে ফেলে পালিয়েছে। টাকাটা না দিলে সে হাসপাতালে যেতে পারতো না। সে মারা পড়তো।"

একটা দারুন ধাক্কা দিয়ে নিজের পুরোনো কথা জিমির মনে পড়ে গেল। তার বাবা তার মা'-কে ফেলে পালিয়েছিলো। তার জন্মের সময় তার মা মারা যায়। মলির মতো কেউ এসে তার মাকে সেদিন সাহায্য করেনি। করলে আজ হয়তো......

জিমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো।

পেছন থেকে মলির গলা ভেসে এলো, "আমার আর এমির কি হবে জনি?"

"তুমি তো চাকরি করো মলি। তোমার ভাবনা কি ?"……

জিমি নেমে বাইরে এসে পথ ধরে হাঁটতে স্থরু করলো।

তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

দূরে বড়ো রাস্তায় পুলিশের ভ্যান ঘুরছে।

জিমি ফিরে দেখলো।

চুরি-করা গাড়িটি ছায়ার আড়ালে দূর থেকে দেখা যায় না। কিন্তু পুলিশ ভ্যান গলিতে ঢুকলেই চোরাই গাড়িটি দেখে ফেলবে, চিনেও ফেলবে।

দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবলো দু'সেকেণ্ড।

তারপর ফিরে এসে সিঁড়ি বেয়ে আবার মলিদের ঘরে উঠে এলো।

তাকে ঢুকতে দেখে মলির মুখ ছাই হয়ে গেল। "তুমি… !"

জনি অবাক হওয়ার ভান করে মলির দিকে তাকালো।

বললো, "আপনি ভুল করেছেন মিসেস মার্টিন, আপনি আমায় চেনেন না।" তারপর জনির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি জনি মার্টিন ?"

"হ্যাঁ।" সন্দিগ্ধ চাউনি জনির চোখে, "হোয়াট ডু্য' ওয়াণ্ট ?"

"আমি আপনার কাছেই এসেছি." জিমি একটু কড়া গলায় বললো, "আপনি কেন আমার ফিঁয়াসি মলি পার্কারের পেছন পেছন ঘুরছেন ?"

"আপনার ফিয়ঁাসি ? মলি পার্কার আপনার ফিয়ঁাসি ?"

"হ্যাঁ। পড়ুন এই চিঠিখানি।"

মলি অবাক হয়ে শঙ্কিত হয়ে দেখলো তারই লেখা চিঠিখানি জিমি তার স্বামীর দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু সেটি মলি পার্কারের চিঠি বলছে কেন সে ? মলি পার্কার, হ্যাঁ, যার কথা তার স্বামী এই মাত্র বললো, তাকে পরিত্যাগ করে যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার স্বামী জনি মার্টিন !

জনি মার্টিন পড়লো—"…এবার সামাজিক কারণে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। আমি চাই না যে আমার সন্তান তোমাকে ছাড়া আর কাউকে

বাবা বলে সম্বোধন করুক। সে যদি তোমার মনঃপূত না হয় তা'হলে অগত্যা আমাকে জনি মার্টিনকেই বিয়ে করতে হয়।—মলি…।"

"—কি ?" পড়ে লাফিয়ে উঠলো জনি মার্টিন, "এই মলি পার্কার মেয়েটি এতো বড়ো চীট্, এতো বড়ো লায়ার ? তার জন্যে আমি—"

জনির কথা শেষ হওয়ার আগেই ওর হাত থেকে চিঠিটা টেনে নিলো জিমি। তারপর সেটি দিলো মলির হাতে। দিয়ে বললো, "মিসেস মার্টিন, এ চিঠি আমি আপনাকেই উপহার দিচ্ছি। আই হোপ্, এরই জন্যে আপনি আপনার স্বামীকে এখানে ধরে রাখতে পারবেন।"

এবার একটু একটু করে জিমির মতলবটা বোধগম্য হতে লাগলো মলির কাছে। কিন্তু এরকম সৌভাগ্য সে যেন বিশ্বাস করেও ক'রে উঠতে পারছে না। তার চোখে জল এলো। কোনো রকমে ধরা গলায় বললো, "থ্যাঙ্ক ইউ…"

জিমি জনির দিকে ফিরে বললো, "আর একটা কথা। ওয়েল্, মিস্টার মার্টিন, আপনাকে দেখলাম মিশন রো থেকে আমার গাড়িতে চ'ড়ে এখানে চলে এসেছেন আমার অনুমতি না নিয়েই। গাড়ির চাবি কি আমায় দেবেন ? দেখলাম মোড়ে পুলিশের ভ্যান ঘুরছে।"

"আপনার গাড়ি ?" জনির মুখ ছাই হয়ে গেল। আর কোনো কথা না বলে সে চাবি বা'র করে দিলো।

গাড়ির চাবি নিয়ে জিমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে সুরু করলো। সিঁড়ির বাঁকের মুখে একবার মুখ তুলে তাকালো।

দেখলো, ঘরের ভিতর জনি চেপে ধরেছে মলির হাত দুটি।

"তুমি আমায় মাপ করো মলি !"

জিমি নেমে এলো শিষ দিতে দিতে—বহুদিনের পুরোনো একটি চেনা গানের সুর : In my dreams—every night… …

বাইরে এসে গাড়িতে উঠে বসলো। তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল বেগম বাহার লেন ধরে।

মোড় ফিরে রাস্তায় পড়তেই পুলিশ ভ্যান তাকে চ্যালেঞ্জ করলো।

জিমি থামলো না, আরো জোরে গাড়ি চালিয়ে দিলো। এলিয়াট রোড থেকে বেরিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোডে এসে পড়তে আরো একটি ভ্যান উত্তর দিক থেকে তার দিকে এগিয়ে এলো। তাকে এড়িয়ে জিমি গাড়ির গতি বাড়িয়ে ছুটে চললো পার্ক স্ট্রীটের দিকে। পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি আসতেই দেখে সামনে থেকে আরেকটি পুলিশ ভ্যান আসছে।

নাঃ, বৃথা চেষ্টা,—সে ভাবলো।

গাড়ির গতি কমিয়ে আনলো আস্তে আস্তে।

কবরখানার ওপার থেকে তখন চাঁদ উঠেছে। বসন্ত এসেছে কলকাতায়। দক্ষিণের দমকা হাওয়ায় ঝিরঝির করছে পথের দু'পাশের গাছগুলো। কোথায় যেন একটি নিঃসঙ্গ কোকিলের কূজন ছাপিয়ে উঠেছে ট্র্যাফিকের কোলাহল।

পুলিশের ভ্যানগুলো দাগী গাড়ি-চোর জিমির গাড়িটিকে ঘিরে দাঁড়ালো।

জিমি তখনো শিষ দিয়ে ভাঁজছে একটি পুরোনো সুর ঃ

···You are mine—only mine,—

In my dreams—every night······

আর চাঁদের আলোয় রুপালী হয়ে উঠেছে কলকাতার জনতাময় বসন্ত।

তারপর দিন সকালবেলা বুড়ো জ্যাসপারের বৌ তাকে ঠেলে তুললো।

খনখনে গলায় বললে, "আমি সারাদিন খাটবো, ঘরের কাজ করবো, আর তুমি শুয়ে শুয়ে ঘুমুবে, না? উঠে একটু টেবিল-চেয়ারগুলো পুঁছলেও তো পারো।"

পেছন দিকের বারান্দায় এক বালতি জল ছিলো। সেখান থেকে এক মগ জল নিয়ে জ্যাসপার মুখ ধুয়ে নিলো।

"ওখানে সাড়ে তিন আনা পয়সা রেখেছি। মোড়ের দোকান থেকে দুটো ডিম নিয়ে এসো।"

"ব্রেকফাস্টের জন্যে ডিম!"

অপ্রত্যাশিত ঘরোয়া স্বাচ্ছল্য বুড়ো জ্যাসপারকে পুলকিত করলো।

"ব্রেকফাস্টের জন্যে!" আবার ঝনঝনিয়ে উঠলো বুড়ি মড্-এর গলা। "যারা অফিসে চাকরি করতে যায় ব্রেকফাস্টের জন্যে ডিম টোস্ট ওরাই খেতে পারে। তুমি এক কাপ চা ও একটি বিস্কুটের বেশী আশা কোরো না। যে সব বুড়ো কিছু করে না, ওদের পক্ষে এই অনেক।"

"তা'হলে ডিম কেন?"

"লাঞ্চে শুধু ডিমের অমলেট। আমার হাতে আর পয়সা নেই।"

"ন্যান্সির টাকা আসে নি?"

"ন্যান্সির টাকা আর আসবে না," বললো বুড়ি মড।

জ্যাসপারের মেয়ে ন্যান্সি তার ফেরারী ফ্রেঞ্চম্যান বরের জন্যে অপেক্ষা করে করে অবশেষে দিল্লি চলে গেছে চাকরি করতে। জ্যাসপারের শেষ জীবনে ওই মেয়েটিই ভরসা।

"ওর টাকা আসবে না? কেন?" জ্যাসপার জিজ্ঞেস করলো।

"দিল্লিতে অনেক খরচা। ওর একলারই চলে না।"

"তুমি কি করে জানো?"

"কাল ওর চিঠি এসেছে।"

"কই, আমায় তো বলো নি।"

"তোমায় বলে কি হবে? টাকার ব্যবস্থা কি এখন তুমি করবে? যা করবার তা'তো আমাকেই করতে হবে। যাও ডিম নিয়ে এসো।"

পয়সা নিয়ে জ্যাসপার দরজার দিকে এগুচ্ছিলো, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে দাঁড়িয়ে পড়লো।

"কি হোলো?"

"আরেক আনা পয়সা দাও।"

"কেন?"

"পানওয়ালার কাছ থেকে ছটো সিগারেট ধার করেছিলাম সেদিন।

প্রত্যেক দিন চাইছে। মুদীর দোকানের পাশেই ওর দোকান।

"তোমার ধার তুমি শোধ করবে।"

"কি দিয়ে করবো? আমার কাছে পয়সা কোথায়?"

"সে আমি কি জানি। সিগারেট ধার করবার সময় আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে?"

"তা'হলে ডিম আনতে পারবো না।"

"কেন?"

"ওদিকে গেলেই পানওয়ালা পয়সা চাইবে।"

"তা'হলে আজ খাবো কি?"

"সে আমি জানি না।"

"তুমি জানবে কেন," তেড়ে এলো বুড়ি মড, "কি খাবো তুমি জানলে আমায় সারাজীবন এত কষ্ট করতে হয়? যাও, ডিম নিয়ে এসো—।"

"আমি ওদিকে যেতে চাইনা যে—!"

"না যেতে চাইলে তোমার লাঞ্চের ডিম তোমাকেই পাড়তে হবে বলে দিচ্ছি। তা নইলে না খেয়ে থাকতে হবে।"

বুড়ো ভাবলো বুড়ি খুব রসিকতা করেছে। হো হো করে হাসলো।

আরো রেগে গেল বুড়ি মড।

কিন্তু কলহটা আরো জমে উঠবার আগেই সমস্যার একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেল। রাস্তা দিয়ে ডিম হেঁকে যাচ্ছিলো এক মুসলমান। জ্যাসপার তাকে ডাকলো। বুড়ি দরদস্তুর ক'রে পোনেরো পয়সা দিয়ে এক জোড়া ডিম কিনলো তার কাছ থেকে।

"তোমার জন্যে আমার একটা পয়সা বেশী খরচা হোলো।"

"সেটা আমার এলাওয়েন্স থেকে কেটে নিও," জ্যাসপার খোশমেজাজে বললো।

"এলাওয়েন্স!" তেড়ে উঠলো বুড়ি।

তবে কথাটা ঠিকই। জ্যাসপার তার বৌয়ের কাছে থেকে দিন এক আনা পয়সা পায় সিগারেট খাওয়ার জন্যে।

"তোমায় পকেট-মানি আর দিতে পারবো না", বুড়ি মড বললো, "ন্যান্সি টাকা পাঠাতে পারবে না লিখেছে। আমার পেনশানটা দিয়েই কোনো রকমে চালিয়ে নিতে হবে।

চোখে তারা দেখতে লাগলো জ্যাসপার। দিন এক আনা পয়সাও যদি সিগারেট খাওয়ার জন্যে না থাকে, তা হলে চলবে কি করে?

বুড়ি এককালে সরকারী হাসপাতালের নার্স ছিলো। কি একটা গোলমাল হওয়ায় মেয়াদ ফুরোনোর অনেক আগেই সামান্য পেনশান নিয়ে অবসর গ্রহণ করতে হয়। নেহাত সায়েব সার্জনের প্রিয়পাত্রী ছিলো বলে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয় নি।

"তোমার তো তবু পেনশান আছে, ওল্ড্ গার্ল,—কিন্তু আমি কি বলো তো?"

"জেলে যাও না কেন?"

"জেলে?"

"হ্যাঁ। জেলে তো থাকার খাওয়ার পয়সা লাগে না। একটা কিছু চুরি টুরি করে সে চেষ্টা করো না," বলতে বলতে বুড়ি মড এক কাপ চা আর একটি বিস্কুট এগিয়ে দিলো জ্যাসপারের দিকে।

আঘাত পেতে পেতে বুড়োর মনে কড়া পড়ে গেছে। তবু তার মনে লাগলো। কোনো কথা না বলে বিস্কুট তুলে নিলো।"

তারপর বললো, "বিস্কুটটা আধখানা ভাঙা।"

"এই আছে," বললো তার গৃহিণী।

"তুমি একখানা আস্ত খেয়েছো।"

"ও, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বুঝি তা'ও লক্ষ্য করেছো?"

"আস্ত একখানা বিস্কুট খাওনি তুমি?"

"হ্যাঁ, খেয়েছি। তখন জানতাম না যে অন্যটা ভাঙা। জানলে ভাঙাটা আমিই খেতাম।"

একটু চুপ করে থেকে বুড়ো বললো, "জেলের আইডিয়াটা তুমি ভালোই দিয়েছো। একবার চেষ্টা করলে হয়।"

হঠাৎ বুড়ি মডের মনেও বোধ একটু লাগলো। কথাটা চাপা দেওয়ার জন্যে বললো, "জানো, কাল সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেকে পুলিশে ধরেছে। কার গাড়ি যেন চুরি করে পালাচ্ছিলো।"

"কি গাড়ি", জ্যাসপার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো।

"হিলম্যান।"

"কে বললে?"

"কাগজে নাকি লিখিছে। পাশের ঘরের ওরা বলাবলি করছিলো।"

"হুঁম," একটু চুপ করে ভাবলো জ্যাসপার। তারপর বললো," দেখ, আমি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু কাল সন্ধ্যেবেলা একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেকে দেখলাম খুব তাড়াতাড়ি মলি মার্টিনদের ফ্ল্যাট থেকে নেমে এসে একটি হিলম্যান গাড়ি জোরে হাঁকিয়ে চলে গেল। ওকে আগে কোনোদিন এ পাড়ায় দেখিনি। মার্টিনদের বাড়িতে কেউ তো বড়ো একটা যায় না। ভাবছি এ লোকটি ওদের ওখানে কি করতে এসেছিলো।"

"দেখ, তুমি বড্ড হিংসুটে। নিশ্চয়ই এসব ব্যাপারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ মার্টিনদের নেই। হয়তো ওদের কোনো বন্ধু এসেছিলো হিলম্যান গাড়ি চড়ে। কতো হিলম্যান গাড়ি আছে।"

"এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলের হিলম্যান গাড়ি?"

"কেন নয়? পয়সা কামালো নিশ্চয়ই গাড়ি কিনতে পারে। সবাই কি তোমার মতো নিষ্কর্মা নাকি?"

"না, না, আমার মনে হচ্ছে এই সে। কিন্তু এসব ব্যাপারে মার্টিনেরা—"

"বাজে বোকো না। মার্টিনদের উপর তোমার বড্ড হিংসে, শুধু মার্টিনেরা কেন, যে সব বাড়িতে ছেলে আর বৌ দুজনেই চাকরি করে সংসার চালায়

তাদের সবারই উপর তোমার হিংসে। তুমি তো চাও সংসারের সব ছেলেরাই তাদের বৌয়েদের উপর বসে থাক। কিন্তু সবাই কি তোমার মতো?

"আমার মনে হয় না জনি মার্টিন কিছু করে। নিশ্চয়ই মলি সংসার চালায়।"

"সে হতে পারে না। মলি খুব শক্ত মেয়ে। জনি টাকা রোজগার না করলে সে তাকে বসে খাওয়াতো না। ঠিক বাড়ি থেকে বার করে দিতো। সবারই মন তো আর আমার মতো নরম নয়?"

"হুঁম," একটু চুপ করে রইলো জ্যাসপার। তারপর একটু হেসে বললো, "আচ্ছা মড, আমি যদি সত্যি সত্যিই একদিন বেরিয়ে যাই—!"

"সেটা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্যে ফেলে রাখছো কেন? যদি যেতে চাও তো এক্ষুনি যেতে পারো। আমি কিছু মনে করবো না। আমার তা'হলে ঝঞ্ঝাট কমে, ঝামেলা কমে, খরচা কমে। কী এমন তফাত হবে তাতে। আমি একলা বেশ সুখে থাকবো। তা'হলে তো আমি এক্ষুনি দীল্লি চলে যেতে পারি। আমার তো এখানে পড়ে থাকা শুধু তোমারই জন্যে।

চা শেষ করে জ্যাসপার উঠে পড়লো।

বললো, "আমি একটু বেরুচ্ছি।"

"লাঞ্চ রেডি হবে এগারোটার মধ্যে। তার মধ্যে ফিরো। তা'নইলে কিছু থাকবে না। আর দুপুর বেলা আমায় এক বন্ধুর বাড়ি যেতে হবে।"

'আচ্ছা,—" বলে বেরিয়ে পড়লো বুড়ো জ্যাসপার।

পথে বেরিয়ে বুড়ো জ্যাসপার স্থির করলো সে আর বাড়ি ফিরবে না।

বুড়ি মড-এর কাছে অনেকদিন গালাগাল খেয়ে জ্যাসপার বেরিয়ে গেছে, সে যে আর ফিরবে না এ কথা বুড়িকে আর আশেপাশের ফ্ল্যাটের সবাইকে শুনিয়ে, কিন্তু আবার ফিরে এসেছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।

কিম্বা হয়তো চুপচাপ বসে থেকেছে হানিফ শেখের চায়ের দোকানের সামনের লম্বা বেঞ্চিতে।

তারপর তার পুরোনো বন্ধু বুড়ো জেঙ্কিন্‌স্ এসে তাকে এক গ্লাস চা খাইয়েছে, একটি চুরুট খাইয়েছে, রেসের ঘোড়া বাতলে দিয়েছে, প্রাইভেট বুকির কাছে বাজি ধরবার জন্যে পাঁচ আনা পয়সা ধার দিয়েছে—আর বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছে।

বেগম বাহার লেনের আশেপাশের বাড়ির লোকেরা, পেণ্ডেলবারি ম্যানশানের আশেপাশের ফ্ল্যাটের দম্পতিরা, হাসাহাসি করেছে। বুড়ো জ্যাসপার ভ্রূক্ষেপ করেনি।

বুড়ি মড ভুরু তুলে বলেছে, "ও, তা'হলে তুমি এলে! ভালোই হোলো। ডিশগুলো ধুয়ে দাও তো—।"

সেই বুড়ো জেঙ্কিন্‌স্ আর নেই। মারা গেছে।

তাকে ভুলতে বসেছে বেগম বাহার লেনের অন্যান্য সবাই।

মনে রেখেছে শুধু বুড়ো জ্যাসপার।

আজ বুড়ো জ্যাসপার রাগ ক'রে হানিফ শেখের দোকানের সামনে বসে থাকলে তাকে ডেকে নেওয়ার কেউ নেই।

মাঝে মাঝে তার মেয়ে ন্যান্সি এসে ডেকে নিয়ে যেতো।

এখন সেও দীল্লিতে,—আর টাকা পাঠাতে পারবে না লিখেছে।

সকাল বেলার বেগম বাহার লেন তখন চঞ্চল। অফিসের বেলা হয়েছে। দ্রুত পায়ে ট্রাম-লাইনের দিকে চলেছে অফিসের মেয়েরা আর ছেলেরা। লাল টাই আর লাল বেল্ট পরে ছোটো ছোটো মেয়েরা বাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে।

স্কুলের বাস আসবে এক্ষুনি।

মনে পড়লো, একদিন ন্যান্সিও দাঁড়িয়ে থাকতো এমনি করে।

বুড়ো স্থির করলো, ফিরবো না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি ফিরেছি। আজ কিছু জানাই নি, সুতরাং আজ আর ফিরবো না।

বুড়ি বড্ডো বকাবকি করে, যা' তা' বলে।

সে সুখে থাকুক।

•   •   •   •   •   •   •

কোথায় যাবে, কি করে চলবে কোনো ভাবনাই বুড়ো জ্যাসপারের মনে এলো না। হঠাৎ মন খুব হাল্কা হয়ে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এলো বেগম বাহার লেন থেকে। তারপর মোড় ফিরে ট্রাম রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লো ওয়েলেসলি স্ট্রীটে। সারি সারি ফার্নিচারের দোকান পেরিয়ে আনমনে এগিয়ে চললো ধরমতলার দিকে।

পথে তখন বেশ রোদ্দুর। পার্কের পুকুরে খুব ভিড়। ড্যালহাউসির ট্রামগুলোতে লোক ঠাসাঠাসি।

এত লোক! কোত্থেকে এলো এরা, জ্যাসপার ভাবলো। এত লোক তো তা'দের কালে ছিলো না। কী সুখের কলকাতা ছিলো তখন! এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হলে সামান্য লেখাপড়া জানা থাকলেই চাকরি পাওয়া যেতো,—রেলে, পোর্টে, কাস্টম্‌স্‌এ, পুলিশে। জ্যাসপার যেদিন আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়লো, সেদিনই তার বাপ বললে ক্লাসে পর পর দু'বার ফেল করেছো, আর পড়ে কাজ নেই, এবার নিজে উপার্জন করো। তার বাপের এক বন্ধু ছিলো, ম্যাক্‌-রবার্ট নাম, রেল-পুলিশে ছিলো। সে নিয়ে গেল ইভান্স নামে রেলের এক ইংরেজ হোমরাচোমরার কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি। কিছুদিনের মধ্যেই উন্নতি। আহা, কী চাকরি ছিলো! রেলের গার্ড! ডান হাতে বাঁ হাতে রোজগার!

অতীত দিনের ওপার থেকে আবার রেলের বাঁশি বেজে উঠলো তার মনে।—•••জাংশান স্টেশন।•••ভিড়, চিৎকার, হট্টগোল। ••এসিস্ট্যাণ্ট স্টেশনমাস্টার পিণ্টো। তার সঙ্গে কতো গল্প সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। •••বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়ে পয়েণ্টস্‌ম্যান শিউশরণের মিশকালো মেয়ে জানকী। তার চোখে কিছুদিন আগেকার একটি রাত্রির স্মরণ।•••হুড়মুড় করে একদল থার্ড-ক্লাসের প্যাসেঞ্জার ঘাড়ের উপর এসে পড়লো।•••হেই, ইটার খ্যা খরটা হাই। ইটার থার্ড খ্লাস ঘাড়ি নেই হাই। উটার যাও।

ঝলডি, আভি ঘাড়ি ছোড়েইগা।···হেই, উটার ঠুম খ্যা খরটা, উটার ঝাও, ও ফার্স্ট খ্লাস হাই। লুক হিয়ার ম্যান, নেই সমঝটা হাই ?· দীজ্ ব্লাডি ইণ্ডিয়ান্স্...

আহা, কী দিন ছিলো তখন ! এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কী খাতির করতো নেটিভেরা, প্রায় সায়েবদের মতো। কী ভয় পেতো দাবড়ে দিলে,—আর এখন বেগম বাহার লেনের সরযূনন্দন পানওয়ালা পর্যন্ত যা' তা' বলে ত্বটো ভার্জিনিয়া নাম্বার টেন্‌এর দাম বাকী পড়ে থাকলে।

মনে পড়লো জান্‌কীর কথা। কী ভালোই না বাসতো জোয়ান ছোকরা জ্যাসপারকে—বিনিময়ে কিছু নয়, ত্ব'একটি সস্তা সেণ্টের শিশি, মাঝে মাঝে চার আনা আট আনা বখশীশ। সব কিছু জানতো শিউশরণ, কোনোদিন কিছু বলতে সাহসে কুলোয় নি।

আর আজ ? মহীউদ্দীন দরজীর মেয়ে ফতিমাকে দেখে শীষ দিয়েছিলো পেণ্ডেলবারি ম্যানশানের ত্ব'নম্বর ফ্ল্যাটের অস্কার। আর ফতিমা সঙ্গে সঙ্গে পায়ের থেকে কাঠের খড়ম খুলে ঠাঁই করে বসিয়ে দিলে তার মাথায়। ছাট বাগার চা'ওয়ালা হানিফ্ শেখের কী হাসি। আর অন্য এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেগুলোও কী হয়েছে আজকাল ! কোথায় ফতিমাকে ধমকে দেবে, ফতিমার বাপকে বেগম বাহার লেন থেকে মেরে তাড়াবে, তা'নয়, উল্টে অস্কারকেই তেড়ে এলো, বললে,—রাইট্‌লি সার্ভড্, সানি। নাও গো এ্যাণ্ড এপলোজাইস্। ইউ কান্‌ট্ ইনসাল্ট্‌এ লেডি।

লেডি! হুঃ। মহীউদ্দীন দরজির মেয়ে ফতিমা আবার লেডি! হোয়াট্ থিংস্ হ্যাভ কাম টু ? কী অধঃপতন হয়েছে এ দেশের, বিশেষ করে ইংরেজরা যাওয়ার পর, ভাবলো বুড়ো জ্যাসপার।

আর আমাদের মেয়েগুলোরও কী হয়েছে ! ওদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ঘুরে বেড়াচ্ছে ইণ্ডিয়ান বয় ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে। কেন ? আমাদের কম্যুনিটিতে ছেলে নেই ? জুডি, অলগা, মলি, এদের দেখ, এরা প্রত্যেকেই কি রকম রেসপেক্‌টেব্লি বিয়ে করে সসম্মানে সুখে আছে ? এত ভালো

মেয়ে ওয়াই-ডব্‌লিউ-সি-এ হস্টেলের সেই মেয়েটি, যার নাম ঈভা বার্‌ওয়েল, সেও কিনা ঘুরে বেড়াচ্ছে অরুণ নামে একটি নেটিভ খৃস্টানের সঙ্গে ?

ঈভাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো বুড়ো জ্যাসপার।

ঈভা বার্‌ওয়েল হেসে বলেছিলো,—হোয়াই, আঙ্কল্‌ জ্যাসপার, এটা একটা ফ্রী কান্‌ট্রি, যে কেউ যে কোনো কারো সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারে।

শুনে তাজ্জব বনে গিয়েছিলো বুড়ো জ্যাসপার। এনিবডি ক্যান গো আউট উইথ্‌ এনিবডি ? বটে ! এই ফ্রী কান্‌ট্রি-তে ? লরেন্সদের ছেলে বার্টি, সে কি পারে মহারাজা অফ্‌ লক্ষ্মীপুরের মেজো মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে ? জোন্‌স্‌দের গ্যারি, সে কি পারে টেগোরদের কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে ?

শুনে ঈভা বারওয়েল হেসে খুন। কেন পারবে না, সে বলেছিলো। বার্টি বা গ্যারি, বা যে কোনো টম ডিক আর হ্যারি যদি মহারাজা বা টেগোরদের অবস্থার লোক হোতো, নিশ্চয়ই পারতো। লর্ড সো-এ্যাণ্ড-সো'র ছেলে বিয়ে করেনি জাস্টিস্‌ দত্তচৌধুরীর মেয়েকে ? আমরা সাধারণ লোক, সাধারণ লোকের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াই। যারা পয়সাওয়ালা, ওরা পয়সাওয়ালাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। প্লেন্‌ এণ্ড সিম্পল্‌। কেন, এই তো সেদিন বেগম বাহার লেনের সাত নম্বর বাড়ির টেরেন্স হার্বার্ট বিয়ে করেছে একজন বাঙালী মেয়েকে। তারপর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেকে সে জানে, তার বৌ পাঞ্জাবী। এ রকম হতে দেখা যায় না বড়ো একটা, কিন্তু দু'একটা যে হচ্ছে না তা তো নয়।

প্লেন এ্যাণ্ড সিম্প্‌ল্‌ ?

না, বুড়ো জ্যাসপারের কাছে কিছু সরলও নয়, কিছু সহজও নয়।

যাক, ওসব ভেবে কি হবে, জ্যাসপার ভাবলো, পয়েন্টস্‌ম্যান শিউশরণের মেয়ে, মিশকালো মেয়ে, জান্‌কীর কথা ভাবা যাক। আহা, কী ভালোই না বাসতো জোয়ান ছোকরা জ্যাসপারকে। বুড়ি মড তার বৌ না হয়ে জান্‌কী তার বৌ হলে কি আজ আর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে

হোতো? জান্‌কী তো বলেছিলো, কেঁদেওছিলো। না, না, সে মোটেও রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল্‌ হোতো না। বুড়ি মড তাকে গালাগাল দিক, ঝাঁটা জুতো যা খুশী মারুক, ডিশ ধোয়াক, পকেট মানি দিয়ে খাইয়ে পরিয়ে জিইয়ে রাখুক—কিন্তু রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল্‌।

এখন কোথায় সে? সেই জান্‌কী?

নিশ্চয়ই বুড়ি হয়ে গেছে। বিহারের কোন গাঁয়ে মাটির ঘরের দেওয়ালে ঘুঁটে ঠাসছে কে জানে। সেও কি ভাবছে জোয়ান ছোকরা ফর্সা উদ্ধত জ্যাসপারের কথা, যে আজ এই শেষ বসন্তের সোনালী সকাল বেলা অলসমনে পথ চলেছে সেই মিশকালো টলমলো মেয়ে জান্‌কীর কথা ভাবতে ভাবতে, যখন মুসলমানদের চায়ের দোকানের গ্রামোফোনে বাজছে তীক্ষ্ণ মেয়েলী গলায় গজলের রেকর্ড,—সেই জানকীর কথা, যার কালো কালো চোখ, কালো কালো চুল, বাটনা বেটে হাত দুটো হলদে, মাথায় যার জলের ঘড়া·········

—হেই বুরবাক, চোখ নেই হ্যায়? রাস্তা চলতা হ্যায়, চোখ খুলকে নেই যাতা হ্যায়···?

আচম্‌কা ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজে চমক ভাঙলো বুড়ো জ্যাসপারের।

আস্তে আস্তে সরে দাঁড়ালো।

দেখলো, একটি ঝকঝকে নতুন গাড়ি। ভেতরে ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক বাঙালী ভদ্রলোক বসে, পাশে তার শাড়ি পরা বৌ।

গালাগাল দিয়েছে বাঙালী ড্রাইভার।

গাড়ি আবার স্টার্ট নিলো।

শোনা গেল, বাঙালী ভদ্রলোকটি তার বৌকে বলছে, "শালার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বুড়ো পথ চলছে যেন ইংরেজ আমলের ভাইসরয়—।"

গাড়ি চলে গেল সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে।

ম্লান হাসি হাসলো বুড়ো জ্যাসপার। ভাবলো, পেতাম ব্যাটাকে বছর কুড়ি আগে—!

রেলের কোন একটা সেকশানের বড়বাবু তাকে একবার কি বলেছিলো,

ঘুষি মেরে তার নাকে মুখে রক্ত বা'র করে দিয়েছিলো জ্যাসপার। সায়েবের কাছে বড়বাবু রিপোর্ট করেছিলো, সায়েব তাকে ডেকে শুধু বলেছিলো, একটু আস্তে মারলেই পারতে।

হ্যাঁ, সায়েবেরাই তাদের কদর বুঝতো। যে চাকরি নেটিভ গ্র্যাজুয়েটকে দিতো না, সে চাকরি দিতো স্কুলে কয়েক-ক্লাস-পরা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার কী মানে হয়, যদি অনর্গল ইংরেজি বলতে না পারে? আর কী ইংরেজি বাবুরা বলে—হাঃ হাঃ—, বুড়ো জ্যাসপার নিজের মনে হাসলো।

কেন যে এদেশ থেকে চলে গেল ইংরেজরা, আজো বুঝতে পারে না জ্যাসপার। কেন, না গেলে কী করতে পারতো নেটিভেরা? আজ-কালকার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলে-মেয়েরা বলে, উই আর নাও এ ফ্রী পীপ্‌ল্‌…।

উই? আমরা? শুনলে গা জ্বালা করে জ্যাসপারের। আমরা অনেক বেশী ফ্রী, অনেক বেশী স্বাধীন ছিলাম ইংরেজ আমলে। ভালো ভালো চাকরি পেতাম। এতোগুলো প্রদেশে এত গভর্নর হয়েছে, একজনও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দেখতে পাও?

শুনে সেদিন এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরা বললে, "কেন, গভর্নর না হোক, একটা গুরুত্বপূর্ণ কমাণ্ডের জি-ও-সি হয়েছে মেজর জেনারেল অমুক। সে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। অমুক হাইকোর্টের জাস্টিস অমুক, সে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান…।

শুনে একটু দমে গিয়েছিলো জ্যাসপার, "তুমি কি ঠিক জানো ওরা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান? ইউরোপীয়ান নয়তো?"

"না, না, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—।"

"কিন্তু, না, ওরা আজকাল আর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলে নিজেদের পরিচয় দেয় না," বললে আরেকটি মেয়ে, "ওরা বলে ওরা ডমিসাইল্‌ড্‌ ইউরোপীয়ান, এখন ভারতীয় নাগরিক।"

শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জ্যাসপার বলেছিলো, তা' না' হলে কি আমাদের

সম্প্রদায় এত গরীব, এত অনগ্রসর। যারা বড়ো হয়, ওরা আর আমাদের স্বীকার করে না। হোতো যদি একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মিনিস্টার কিম্বা গভর্নর—

"সে আর কি করতো, ঝটপট কিছু পয়সা করে, তারপর রিটায়ার করে বিলেতে গিয়ে স্থায়ী আস্তানা গাড়তো," বললে আরেকজন। "তুমি যখন গরীব, যখন তুমি বেশী লেখাপড়া শেখোনি, তখন তুমি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। যেই তুমি লেখাপড়া শিখলে, টাকাকড়ি করলে, অমনি তুমি ইউরোপীয়ান হয়ে গেলে—।"

"যদি অবশ্যি রংটা যথেষ্ট পরিমাণে ফর্সা হয়—।"

শুনে খুব হেসেছিলো সবাই।

কিন্তু জ্যাসপার হাসেনি। ওদের জাতের এখন জীবনমরণ সমস্যা, আর ছোকরাগুলো হাসছে! কেন যে আজকালকার ছোঁড়াছুঁড়িদের এদেশের উপর এত টান জ্যাসপার বুঝতে পারে না। না হয় ওরা পয়সাকড়ি করে বিলেত গেল, নিজেদের ইউরোপীয়ান বললো, কি হয়েছে তা'তে? আমরা সবাই তো ইউরোপীয়ান, জ্যাসপার ভাবলো। বিলেত যাওয়ার জাহাজ ভাড়া থাকলে আমরা কি কেউ বেগম বাহার লেনে বসে থাকতাম!

ভাবতে ভাবতে কখন যে বুড়ো জ্যাসপার সুরেন ব্যানার্জি রোড ধরে হেঁটে এসে চৌরঙ্গিতে পড়লো, খেয়াল নেই।

সে শুধু ভাবছিলো আর ভাবছিলো।

এত দ্রুত বদলাচ্ছে এই দুনিয়া, তার উপলব্ধি কিছুতেই তাল রেখে চলতে পারছে না। ইণ্ডিয়া একটা রিপাব্লিক, তার একজন ইণ্ডিয়ান প্রেসিডেণ্ট, একজন ইণ্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার, প্রদেশে প্রদেশে ইণ্ডিয়ান গভর্নর,—সত্যি হোলো কি? ইউ-এন-ও'র প্রেসিডেণ্টও ইণ্ডিয়ান, তার উপর মেয়ে? ভাবা যায় না। সেদিন কাগজে দেখলো ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করছে আনত হয়ে, আর প্রেসিডেণ্ট সোজা দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য, একজন ইউরোপীয়ান এ্যামব্যাসাডর অভিবাদন করছে একজন ইণ্ডিয়ানকে

তার দেহের ঊর্ধ্বাংশ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে, আর সেই ইণ্ডিয়ান অভিবাদন গ্রহণ করছে মাটির উপর লম্ব হয়ে? তাজ্জব ব্যাপার!

আর এরা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কদর বোঝে না, ইংরেজির দাম দেয় না। অথচ এদের ছেলেরাও আজকাল ফশ ফশ করে ইংরেজি বলে, ক্লাবে যায়, ডান্সে যায়, খুব ভালো সমাজে মেশে।

কে আজকাল পোঁছে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের? হাঁ, খাতির করতো বটে ইংরেজরা। তাদের এক রক্ততো!

"হেই, লুক আউট্, ইউ—!"

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে এক ইংরেজ ভদ্রমহিলার সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে কোনো রকমে সামলে নিলো বুড়ো জ্যাসপার। ভদ্রমহিলার সঙ্গী এক সুপুরুষ ইংরেজ, মহিলাটিকে টেনে নিলো তার দিকে। তাদের সঙ্গে সুট পড়া একজন বাঙালী ভদ্রলোক আর বাঙালী মহিলা।

তাকিয়ে দেখলো, বাঙালী ভদ্রলোকটি বসনে ভাবভঙ্গীতে ইংরেজের চাইতেও বেশী সাহেব, ভূষণ প্রসাধন উন্নাসিকতায় অনেক বেশী মেমসাহেব বাঙালী ভদ্রমহিলাটি।

জ্যাসপার টুপি তুলে বললে, "ভেরি সরি, লেডি···।"

তার কথার উত্তর না দিয়ে ওরা কথা বলতে বলতে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। দু'এক টুকরো ভেসে এলো জ্যাসপারের কানে—

"দ্যাট ওল্ড ফেলো, হী'জ্ এ্যান এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, ইজ ন্'ট্ হী, নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব ছিলো। তোমার ব্যাগটা হাতে আছে তো, মাই ডিয়ার? বোধ হয় ওটা ঝট্ করে কেড়ে নেওয়ার মতলবে ছিলো। আই ডোণ্ট্ লাইক্ দীজ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্স্। জানেন মিস্টার গুহ, সেদিন একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ফেলো আমার কাছে এসে চাকরি চাইলো। আমি বললাম, আমার হাতে এখন কাজ নেই, ঠিকানা রেখে যাও, দরকার হলে জানাবো। ও যখন চলে গেল, দেখি টেবিলে আমার রুপোর সিগারেট কেস্‌টা নেই!"

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল জ্যাসপার।

কী? একজন ইংরেজ বলছে এ কথা? একজন ইংরেজ, যার শরীরে ঠিক সেই রক্তই বইছে যে রক্ত বইছে জ্যাসপারের শরীরে!

আর সেই ইংরেজ এই বাঙালীর এতো বন্ধু! যেই বাঙালী জাত টেরারিস্ট, সেদিনও গুলি চালিয়ে ইংরেজের পর ইংরেজ মেরেছে, যেই বাঙালীকে মেরে মেরে কড়া পড়ে গেছে স্যর টেগার্টের হাতে!

নাঃ, ঈভা বারওয়েলের কথাই ঠিক, বুড়ো জ্যাসপারের মনে হোলো আস্তে আস্তে।—আমরা গরীব লোক, গরীবের সঙ্গে মেলামেশা করি। যাদের পয়সা আছে ওরা মেশে পয়সাওয়ালাদের সঙ্গে। কী আসে যায় কে ইংরেজ, কে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, বাঙালী, কে পাঞ্জাবী,—মনের রং সবারই এক।

আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে।

ক্ষিধে পাচ্ছে আস্তে আস্তে। দূরের টাওয়ারে বড়ো ঘড়িটায় এগারোটা বাজে।......

একটি হালফ্যাশানের তাপনিয়ন্ত্রিত ভারতীয় রেস্তরার সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে কয়েকজন বিদেশী ও কয়েকজন ভারতীয়, পুরুষ নারী মেশানো।

একটি ভিখারী স্ত্রীলোক একটি ছেলের হাত ধরে সেখানে গিয়ে হাত পাতলো।

একজন বিদেশী তার ক্যামেরা চোখের কাছে তুললো।

তার সঙ্গী আরেকজন ভারতীয় তাকে বললো, ছবি তুলো না। লোকে গোলমাল করবে।

সে ক্যামেরা নামিয়ে নিলো।

ভিখারী স্ত্রীলোকটিকে কেউ পয়সা দিলো না।

ছেলেটির হাত ধরে স্ত্রীলোকটি সরে এলো।

দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছিলো বুড়ো জ্যাসপার। স্ত্রীলোকটির গায়ে ছেঁড়া

গাউন, শনের মতো চুল, ফর্সা নোংরা গায়ের চামড়া। ছেলেটিরও তাই। পরণে ছেঁড়া শার্ট, ছেঁড়া হাফ প্যান্ট। খালি পা' দুজনেরই।

জাতে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

বুড়ো জ্যাসপারের চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। বছর কুড়ি আগে কেউ কি ভাবতে পারতো চৌরঙ্গির বুকের উপর দেখা যাবে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভিখারী? দুস্থ ফিরিঙ্গী তখনো যে ছিলো না তা নয়,—কিন্তু দিনে দুপুরে চৌরঙ্গির উপর? খালি পায়ে? বিদেশীদের কাছে, ইণ্ডিয়ানদের কাছে, হাত পাতছে? ...ও গড, গড, বেঁচে থাকলে আরো কতো কি দেখবো!

আনমনে পকেটে হাত ঢোকালো বুড়ো জ্যাসপার। যদি দু'এক পয়সা থাকে! থাকবার কথা নয় অবশ্যি—আরে!

পকেটে হাত দিয়ে জ্যাসপার দেখে কিছু পয়সা আছে।

কতো?

গুণে দেখে, সাড়ে তিন আনা।

কোত্থেকে এলো?

মনে পড়লো, সকালে ডিম আনতে যাবে বলে পকেটে পুরেছিলো পয়সাগুলো, তারপর আর বুড়িকে ফিরিয়ে দিতে মনে নেই। ডিমওয়ালাকে পেয়ে যেতে বুড়ি তারই কাছ থেকে ডিম কিনলো, আর ঝগড়া করতে করতে খেয়াল নেই, দামটা দিয়ে দিয়েছে নিজের ব্যাগ থেকে পয়সা বার করে।

হাঃ হাঃ, হাসি পেলো বুড়ো জ্যাসপারের। সাড়ে তিন আনা পয়সা তার কাছে বিপুল ঐশ্বর্য।

যাক,—পয়সা যখন বেরুলোই, ওই স্ত্রীলোকটিকে কিছু দেওয়া যাক।

তাকে ডেকে দুটো পয়সা দিলো তার হাতে।

পয়সা নিয়ে সে চলে গেল।

খুশিতে ভরে গেল জ্যাসপারের মন, কার্নেগী-রকফেলার মনে হোলো নিজেকে।

তখন রোদ্দুর বাড়ছে, ঝাঁঝ বাড়ছে, পেটের ক্ষিধে বাড়ছে।

কিন্তু তিন আনা পয়সা দিয়ে কী খাওয়া যায়?

অনেকক্ষণ ভাবলো।

তারপর হেঁটে হেঁটে এলো কার্জন পার্কে। দু'আনার আলু-কাবলি খেলো। এক আনা দিয়ে চা কিনলো এক ভাঁড়। তারপর একটি গাছের ছায়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো।

এ বেলার ব্যবস্থা তো হোলো। তারপর?

বরং বাড়িতে খেয়ে বেরুলেই ভালো হোতো। বুড়ি মড্ ডিমের অমলেট বেশ ভালো করে।

বুড়ো জ্যাসপারের জিভে জল এলো। ডিমের অমলেট আলু-কাবলির চাইতে ভালো।

বাড়ি ফিরে গেলে কেমন হয়? ওরে বাবা! বুড়ি তার সাড়ে তিন আনা পয়সা ফেরত চাইবে। তারপর এমন গালাগাল দেবে যা শুনলে কবরের মৃতদেহও পাশ ফিরে শোয়।

না, শিক্ষা হোক বুড়ির। সে জানুক যে তাকে ছাড়াও বুড়ো জ্যাসপারের চলে।

বুড়ি মড্ কী করছে এখন? বাড়ি ফিরতে দেরী হচ্ছে বলে নিশ্চয়ই খুব বকাবকি করছে নিজের মনে। হয়তো নিজে খেয়ে নিয়েছে এতক্ষণে।

অথচ এক কালে কী মিষ্টি ছিলো এই মড্।

প্রায় তিরিশ বছর আগে একদিন এক রোববার সকালে তাকে প্রথম দেখেছিলো সে। চার্চে সেদিন বেশ ভিড়। জ্যাসপারও ঢুকছিলো, সে-ও ঢুকছিলো।

সে চোখ তুলে জ্যাসপারের দিকে তাকালো।

আর জ্যাসপারের মন গুলমোহরের কচি পাতার মতো ঝিরঝির করে উঠলো।

সে চোখ নামিয়ে চলে গেল তার জায়গায়।

তারপর বেরুনোর সময় হারিয়ে গেল মেয়ে-পুরুষের ভিড়ে।

সেদিন রাত্তিরে ঘুম এলো না জ্যাসপারের চোখে।

কতোদিন কতো মেয়েকে পথে ঘাটে রেলে চার্চে নাচে দেখেছে সে, কিন্তু এমনি করে তো কেউ তার মনে দোলা দিয়ে যায় নি। কোথায় পাওয়া যায় এর ঠিকানা?

ভেবে ভেবে সাতটা দিন কেটে গেল।

পরের রোববার খুব সেজেগুজে কোটের ফুটোয় লাল গোলাপ গুঁজে জ্যাসপার চার্চে গেল।

কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলো না সেই মেয়েটিকে।

মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

বেরিয়ে এসে আর বাড়ি ফিরলো না। ঘুরে বেড়ালো সারাদিন।

তারপর বিকেল বেলা গিয়ে বসলো ময়দানে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের কাছে।

হঠাৎ দেখে এক পাশে পায়চারি করছে সেই মেয়েটি। সঙ্গে একটি ছোট্টো কুকুর।

মেয়েটি তাকে দেখলো। চিনলোও।

জ্যাসপার টুপি তুললো।

মেয়েটি একটু নড্ করে অন্যদিকে চলে গেল।

তারপরদিন আবার সেখানে বেড়াতে গেল জ্যাসপার।

মেয়েটিকে দেখে টুপি তুললো।

সেদিনও মেয়েটি একটু নড্ করে অন্যদিকে চলে গেল।

তারপরদিন জ্যাসপার ভাবলো, আজ আলাপ করতে হবে, যেমন করেই হোক।

বিকেল বেলা গিয়ে বসে রইলো সেখানে।

কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, মেয়েটির আর দেখা নেই।

তারপরদিন না, তারপরের দিনও না।

আবার হারিয়ে গেল মেয়েটি।

জীবনটা বোধ হয় এরকমই, জ্যাসপার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভেবেছিলো,—যাকে ভালো লাগে, সে হারিয়ে যায়। যাদের ভালো লাগে না, ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসে।

তারপর কেটে গেল কয়েকটা মাস।

দৈনন্দিন কাজের রুটিনে নিজেকে ভাসিয়ে দিলো জ্যাসপার। কিন্তু একটা মস্তো বড়ো ফাঁক থেকে গেল তার মনে। স্কচ হুইস্কির বোতলের পর বোতলও তাকে কিছুতেই ভুলিয়ে দিতে পারলো না দুটি নিটোল হাত আর একজোড়া বড়ো বড়ো নীলাভ চোখ।

তারপর হঠাৎ একদিন জ্যাসপারের অসুখ করলো। লিভারের অসুখ। সে এলো হাসপাতালে। আহা, কী দিন ছিলো তখন, ইউরোপীয়ানদের জন্যে আলাদা ওয়ার্ড, আর তখন হাসপাতালে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মর্যাদাও ইউরোপীয়ানদের মতো।

সেখানে এসে দেখে মাথায় বনেট কোমরে বেল্ট আর এপ্রন এঁটে তার শুশ্রূষা করতে এসেছে যে নার্সটি তার সঙ্গে চার্চে আর ময়দানে দেখা মেয়েটির আশ্চর্য মিল।

নার্স তাকে দেখে একটু হাসলো।

না, সেই মেয়েটিই। নিঃসন্দেহ হোলো জ্যাসপার।

তখন আর হাসপাতালকে হাসপাতাল বলে মনে হোলো না, মনে হোলো স্বর্গ।

সুতরাং সেরে উঠতে দেরী হোলো না।

হাসপাতাল থেকে চলে আসবার দিন নার্সটিকে ডেকে বললো, "দেখ, কলকাতায় আমার চেনাশোনা বেশী নেই, সব সময় কলকাতায় থাকিও না। যখন আসি, তখন তোমার কাছে কিছু ফুল নিয়ে আসতে পারি কি ?"

নার্সটি হেসে তার ঠিকানা দিলো।

"তোমার নাম কি ?"

"মড।"

জ্যাসপার ফুল নিয়ে মডের কাছে একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিনদিন গেল।

তারপর চারদিনের দিন বললে, "আমার সংসারে কেউ নেই। আমি খুব একা। তুমি কি আমায় বিয়ে করবে?"

মডেরও নিকট আত্মীয় কেউ ছিলো না।

সে রাজী হোলো।

সেই সুরু।

বিয়ের পর সেই যে বেগম বাহার লেনের পেণ্ডেলবারি ম্যানশানে এসে ঢুকেছে, আজো টিকে আছে সেখানে। শুধু আগে ছিলো তিন রুমের স্যুট। তারপর দু'রুমের। তারপর ওর মেয়ে ন্যান্সি দীল্লি চলে যেতে এখন শুধু একখানা ঘর।

তারপর দুটি মধুময় বছর কেটে গেল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই। কী দিন ছিলো তখন! তখনকার ক্রিস্‌মাস্, তখনকার ঈস্টার—আজকাল-কার গুলোতে আর সে আমেজ কোথায়?

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লো তার খেয়াল নেই।

ঘুমের মধ্যে শুধু স্বপ্ন দেখলো ব্যাণ্ডে ফক্স্‌ট্রট বাজছে। ফ্লোরে খুব ভিড়। আর সেই ভিড়ের মধ্যে সে আর মড, মডের ডান হাতখানি তার বাঁ হাতে, বাঁ'হাতখানি তার ডান কাঁধে, তার ডান হাত খানি মডের কোমরের পেছনে ঠিক পিঠের নিচে, দু'জনে বড়ো কাছাকাছি, আর মুখে কোনো কথা নেই।

জ্যাসপারের যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা পড়ে এসেছে, সূর্য নেমে গেছে পশ্চিমের রাজভবনের ওপারে। ট্রামে বাসে অফিস-ফেরত যাত্রীর ভিড়, চারদিকে জনতা, কোলাহল।

জ্যাসপার উঠে বসলো।

বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। এক কাপ চা পেলেও হোতো।

কিন্তু পকেট শূন্য।

বাড়ি ফিরবো, কি ফিরবো না, জ্যাসপার ভাবলো।

নাঃ, ফিরবো না, সে স্থির করলো। কে যায় বুড়ি মডের কাছে ফিরে। বেরিয়ে যখন পড়েছি, তখন চিরদিনের জন্যেই।

কিন্তু, চলবে কি করে?

দেখাই যাক না, জ্যাসপার ভাবলো, পথ তো চলি।

উঠে পড়ে রাস্তা পেরিয়ে চলে এলো চৌরঙ্গিতে।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললো পার্ক স্ট্রীটের দিকে।

অনেক কষ্ট করেও সুদিনগুলোর কথা আর মনে পড়ছে না কিছুতেই। মনে পড়ছে শুধু লিভারের অসুখটা আর সারলো না। আবার হোলো। কাজে নিয়মিত যেতে পারতো না। একদিন ঝগড়া হোলো সায়েবের সঙ্গে।

রাগ করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলো।

মড বললে, "এ তুমি কি করলে! পার্মানেণ্ট চাকরি, না হয় বড়ো জোর রিটায়ার করিয়ে দিতো। টাকা তো আসতো কিছু!"

"ভারী টাকা আসতো! ও টাকায় আমার কী হবে? দেখ না কতো টাকা রোজগার করি।"

হাতে কিছু টাকা ছিলো। তাই দিয়ে ধরমতলায় একটি চুরুট-সিগারেট প্রভৃতির দোকান খুললো। ক্ষতি হোলো প্রথম বছরেই, তারপর ধার হোলো, তারপর দোকানটি গেল।

মন তখন খুব খারাপ।

মড বললে, "ভাবনা কি, আমি তো আছি। যদ্দিন তোমার কিছু না হয় তদ্দিন চালিয়ে নেবো।"

মড সরকারী হাসপাতালে নার্স। সুতরাং প্রথম দিকে তেমন কিছু অসুবিধে হোলো না।

তদ্দিনে ওদের একটি মেয়ে হয়েছে। ফুটফুটে মেয়ে, কিন্তু একটু ময়লা রং।

"ঠিক আমার মায়ের মতো," বললে মড আর নাম রাখলো কনস্ট্যান্স, ডাক নাম ন্যান্সি।

কিন্তু এ সুখও বেশীদিন রইলো না। নার্সদের কি একটা গাফিলতিতে একজন রোগী মারা গেল। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলে মড চাকরি থেকে বরখাস্ত হোলো না, কিন্তু তাকে সামান্য পেনশানে অবসর নেওয়ানো হোলো চাকরি থেকে।

এদিকে তখন উনিশ শো তিরিশ এসে গেছে। দুনিয়া জুড়ে আর্থিক বিপর্যয়। চারদিকে ছাঁটাই, লোকসান, অর্থাভাব।

ঘুরে ঘুরে কোথাও কোনো কাজ পেলো না জ্যাসপার।

আর সেদিন থেকে মড বদলে গেল। মেজাজ খিট খিটে হয়ে গেল। মুখে মিষ্টি কথা নেই।

তিনজনের সংসারে সম্বল শুধু মডের পেনশান। আর কখনো সখনো নার্সিং হোম বা প্রাইভেট কল থেকে কিছু উপরি আয়।

সারাদিন মড হয় নিজের কাজে ব্যস্ত, তা' নইলে মেয়ে ন্যান্সিকে নিয়ে ব্যস্ত। নিজের জীবনে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল জ্যাসপার। নিঃসঙ্গ হয়ে আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে গেল।

সুতরাং, আর কী লাভ বুড়ি মডের কাছে ফিরে গিয়ে, ভাবলো জ্যাসপার। দেখি, কোনো 'হোম্'এ যদি জায়গা পাওয়া যায়।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো পার্ক স্ট্রীট অবধি।

কার কাছে যাওয়া যায়, সে ভাবলো। কে তাকে কোনো একটি 'হোম্'এ ব্যবস্থা করে দেবে ?

এমন সময় দেখলো পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে পেট্রল-পাম্পে তেল নিচ্ছে একটি গাড়ি।

চেনা গাড়ি বলে মনে হোলো। মিষ্টার নিকল্‌সনের গাড়ি না ?

হ্যাঁ, তাইতো।

মিষ্টার নিকল্‌সন বেগম বাহার লেনের কয়েক পুরুষের অধিবাসী। ওদের

খুব পয়সা। এক বিঘে জমির উপর সেকেলে ধরণের একটি বাড়িতে থাকে। তার নিজেরই পৈত্রিক বাড়ি সেটা। লেখাপড়া জানা লোক। বিলেত ঘুরে এসেছে। খাটি ইংরেজ বৌ। মস্তো বড়ো চাকরি করে একটি বিলিতী কোম্পানীতে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের একজন বেশ হোমরা চোমরা লোক।

বুড়ো জ্যাসপারের সঙ্গে আলাপ আছে।

নিকল্সন পারে না? পারে নিশ্চয়ই। কেন পারবে না, মরিসন্স্ হোম ফর দি ওল্ড এ্যাণ্ড ইনফার্ম যেটি আছে তার ট্রাস্টী বিল জনসন তো নিকল্সনের বন্ধু!

গাড়ির পেছনের সীটে বসেছিলো নিকলসন আর তার বৌ। বুড়ো কাছে গিয়ে নোংরা খাকি সোলার টুপিটি তুললো।

"কি খবর জ্যাসপার?"

জ্যাসপার নিবেদন করলো তার বাসনা।

নিকল্সন শুনে একটু হাসলো।

বললো, "ওরা তো তোমায় জায়গা দেবো না জ্যাসপার। তোমার বৌ আছে, মেয়ে আছে। তোমার বৌ পেনশান পায়, তোমার মেয়ে চাকরি করে। যাদের কেউ নেই, শুধু তাদের জন্যেই মরিসন্স্ হোম।"

জ্যাসপার বললো, "কিন্তু—"

"কিন্তু নয় জ্যাসপার, বাড়ি ফিরে গিয়ে বৌয়ের সঙ্গে মিটমাট করে নাও।"

"ইফ্ ইউ প্লীজ স্যর—।"

এবার একটু রুক্ষ হয়ে উঠলো নিকলসন। বললো, "আমার দ্বারা হবে না। যদি আর কেউ পারে তো চেষ্টা করে দেখ।"

গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল নিকলসন।

জ্যাসপার আস্তে আস্তে ফিরে চললো।

তখন সোনার গোধূলি নেমেছে। অফিসের কাজ সেরে পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে এ সময় কতো সুখ, জ্যাসপার ভাবলো।

কিন্তু যে বাড়িতে মডের মতো বৌ? না, সে বাড়িতে নয়।

তার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল এক ইংরেজ বুড়ো আর বুড়ি। সৌম্য প্রশান্ত তাদের মুখ।

জ্যাসপার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

পার্ক স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে, চৌরঙ্গি পেরিয়ে হেঁটে চললো ময়দানের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো।

ওধারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল। আর এ পাশটা—।

হ্যাঁ এখনো সেই আগেরই মতো, তিরিশ বছর আগেকার মতোই আছে। চিনেবাদামওয়ালা চিনেবাদাম বেচছে। কুলপিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে। তরুণ আর তরুণী হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে পথ চলছে পাশাপাশি। আর ওই একটি মেয়ে একটি ছোট্টো কুকুর নিয়ে পায়চারি করছে—

হঠাৎ চমকে উঠলো জ্যাসপার। মড?

না। সে তো তিরিশ বছর আগেকার কথা। আজকের এই অল্পবয়েসী মেয়েটি মডের মতোই আরেকজন।

ও গড্, এ যেন সুখী হয়, জ্যাসপার ভাবলো। আমার মতো কোনো হতভাগা যেন এর জীবনে না আসে।

কিন্তু, মড? মড কি করছে? নিজের মনে গজগজ করছে জ্যাসপার ফেরেনি বলে, ডিমের অমলেটে পিঁপড়ে হয়েছে বলে। আজও তার মনে হবে না যে জ্যাসপার আর ফিরবে না। একদিন যাবে, দু'দিন যাবে, তিন দিনের দিন—

সত্যিই কি কাঁদবে মড?

হঠাৎ যেন জ্যাসপারের মনে হোলো মড্ নিশ্চয়ই সুখী নয়। সত্যিই তো বুড়ো জ্যাসপারের কাছে সে জীবনে কী পেয়েছে? আশ্চর্য, একথা কেন আজ পর্যন্ত কোনোদিনই তার মনে পড়ে নি।

মড যদি জানতে পারে যে জ্যাসপার সুখী নয়, জ্যাসপার যদি জানতে

পারে যে মড স্থখী নয়, তাহলেও তো দুজন দুজনের উপর সহানুভূতি নিয়ে স্থখী হতে পারে।

বাড়ি ফিরে গিয়ে মড্‌কে একথা বললে কি রকম হয়?

না, না, ওরে বাবা। মড প্রথমেই তার সাড়ে তিন আনা পয়সা ফেরত চাইবে। কোত্থেকে দেবে সে? তখন যদি বলে—মড, আমি জানি আমায় বিয়ে করে তুমি স্থখী হওনি,—মড যে ভাষা ব্যবহার করবে সেটা রাজার ইংরেজি নয়।

না, বাড়ি আর ফিরবো না, ভাবলো জ্যাসপার।

তারপর ঘুরে দাঁড়ালো।

ভাবলো, এখানে অন্ধকার হয়ে আসছে। এখানে আর কেন?

হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলো চৌরঙ্গিতে।

পার্ক স্ট্রীট ছেড়ে এসে লিণ্ডসে স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে ভাবলো, রাত্তিরটাতো ঘুমুতে হবে কোথাও, দেখি ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের দিকে চেনাশোনা কারো সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়। একটা রাত্তিরের জন্যে আশ্রয় দেবে না? তারপর কাল থেকে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।

নিউ মার্কেট বাঁয়ে রেখে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে এসে পড়লো জ্যাসপার।

তারপর কিছুক্ষণ দক্ষিণদিকে হাঁটবার পর ভাবলো, এখানে নয়,—ওয়েলেস্‌লির দিকে গিয়ে দেখি, ওদিকে চেনাশোনা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

বাঁয়ের একটি গলি পেরিয়ে ওয়েলেসলিতে এসে পড়লো, ঠিক যেখানটায় ট্রাম লাইন ঘুরে গেছে এলিয়ট রোডের দিকে।

বাটার জুতোর দোকানের সামনে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ।

বালীগঞ্জ আর পার্ক সার্কাসের ট্রাম এসপ্লানেড ফেরত যাত্রীর ভিড়ে ঠাসাঠাসি।

সবারই নীড় আছে ফিরে যাওয়ার, শুধু আমারই নেই, জ্যাসপার ভাবলো; আজকের দুনিয়ায় বুড়োদের কেউ পছন্দ করে না, কেউ ভালো-

বাসে না, কেউ তাদের খোঁজও নিতে চায় না। সবাই যে যার নিজের গণ্ডির ভেতর সুখে থাকতে চায়। গাধারা জানেনা যে আমাদের সময়ে আমরা কতো বেশী সুখে ছিলাম।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ভালো লাগলো না।

ভাবলো, একবার ওদিকটা দেখে আসি!

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এলো বেগম বাহার লেন্‌এর মোড়ে।

না, না, ফিরে যাবো না ওখানে, বুড়ো জ্যাসপার বোঝালো নিজেকে,—শুধু একবারটি দূর থেকে দেখবো আমার জানলায় কি আলো জ্বলছে না অন্ধকার।

মোড়ে দাঁড়িয়ে গলির ভেতরে তাকালো।

না, ভালো করে দেখা যায় না এখান থেকে।

একবার ঢুকবো গলির ভিতর?

না, না—যদি বুড়ি দেখে ফেলে?

ফিরে যাই, ভেবে বুড়ো এক পা' পিছিয়ে এলো।

কেন, বুড়িকে ভয় পাই নাকি?—

বুড়ো আবার দু'পা' এগুলো।

না, ভয় পাই না, কিন্তু বুড়ি যা' তা' বলে।

জ্যাসপার আবার পিছিয়ে গেল এক পা।

না, চলেই যাই।

ঘুরে দাঁড়ালো জ্যাসপার।

ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়লো এক পাশে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—

"মড?"

মডও তাকে দেখেছে। এতক্ষণ চুপচাপ পর্যবেক্ষণ করছিলো তাকে।

পানওয়ালা চেনা লোক। ডেকে বললো, "সারাদিন কোথায় ছিলে সায়েব? সেই বেলা তিনটে থেকে মেমসায়েব এখানে দাঁড়িয়ে আছে।"

বুড়ি মড বুড়ো জ্যাসপারের কাছে এসে দাঁড়ালো।

জ্যাসপার কী করবে ভেবে না পেয়ে হিঃ হিঃ করে হাসতে লাগলো বাচ্চা ছেলের মতো।

বুড়ি মড্ জ্যাসপারের হাত দুটো নিজের দু'হাতের মধ্যে নিয়ে বললো, "আমার উপর এত রাগ কেন, ওল্ড ম্যান?"

কি রকম মিষ্টি শোনালো বুড়ি মডের গলা, প্রায় তিরিশ বছর আগেকার সেই তন্বীর মতো।

জ্যাসপারের হাসি ক্ষীণ হয়ে এলো। কোনো উত্তর দিলো না সে।

"তুমি খাওয়ার সময় ফিরলে না। এরকম তো কোনোদিন হয়নি ডার্লিং।"

জ্যাসপার আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "অমলেট কি রকম হয়েছে?"

"আমি জানি না ডার্লিং। আমিও আজ সারাদিন না খেয়ে আছি।"

"তুমি আমায় সব সময় বড্ড বকো," জ্যাসপার খুব নরম গলায় অনুযোগ করলো।

"আর কোনোদিন বকবো না," অস্ফুট উত্তর এলো।

"চলো বাড়ি যাই, আবার সাপারের দেরী হয়ে যাবে।"

"চলো।"

বুড়োর বাহু অবলম্বন করে গলির ভিতর ঢুকলো বুড়ি মড।

চলতে চলতে জ্যাসপার একসময় জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি ভেবেছিলে আমি ফিরে আসবো?"

বুড়ি একটু চুপ করে থেকে উত্তর দিলো, "আমি জানি যে সারাদিন তুমি আমার কথা ভাবছো। আর আমার কথা ভাবতে ভাবতে একবার তুমি আমায় চুরি করে দেখতে আসবেই।"

জ্যাসপার হাসলো জ্যাম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া দুষ্টু ছেলের মতো।

তারপর বললো, "জানো, আমি নিকলসনকে বলছিলাম মরিসন্স্ হোমএ আমার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে।"

মড্ জ্যাস্‌পারের হাতে চাপ দিয়ে বললো, "দেখ, ওল্ড ম্যান, আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর তুমি যেই হোম্‌এ খুশি গিয়ে থাকতে পারো—কিন্তু যদ্দিন তুমি আর আমি বেঁচে আছি তদ্দিন আমরা থাকছি শুধু বেগম বাহার লেন্‌এ, আর কোথাও নয়।"

বুড়ো জ্যাসপার বুড়ি মডের কোমর জড়িয়ে ধরলো।

বললো, "ওল্ড গার্ল, আমার শুধু তুমিই আছো, আর তোমার আছি শুধু আমি। আমাদের আর কেউ নেই।"

"আর কাউকে দরকারও নেই, ওল্ড ম্যান," উত্তর দিলো তার প্রিয়া।

কলকাতার আকাশে তখন ফ্যাকাশে জ্যোৎস্না।

নীল গ্যাসের আলোয় থম থম করছে বেগম বাহার লেন।

দিন তিন চার পর।

অর্ড্‌ন্যান্স ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলো অরুণ আর ঈভা বারওয়েল।

ফেরার পথে ঈভাকে পৌঁছে দেওয়ার সময় দেখে রাস্তায় পায়চারি করছে বুড়ো জ্যাসপার আর তার বৌ।

হস্টেলের সামনে ল্যাম্প-পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে একটুখানি গল্প করে নেওয়ার সময় ঈভা অরুণকে বললো, "জানো, আঙ্কল্ জ্যাসপার সেদিন পালিয়ে গিয়েছিলো। ওর বৌ ওকে আবার ধরে এনেছে।"

"তাই নাকি? কে বললে?"

"সাণ্ড্রা।"

"সাণ্ড্রা? সাণ্ড্রা কে?"

"সাণ্ড্রাকে চেনো না? ডেনিস নিকলসনের বৌ।"

"ও, হ্যাঁ, ওর কথা শুনেছি।"

"জ্যাসপার নাকি নিকলসনকে ধরেছিলো মরিসন্‌স্ হোম্‌এ ওর একটা ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে। সে পারবে না বলে দিয়েছিলো। এখন দেখ, বুড়ো বুড়ি কি রকম মনের সুখে গল্প করছে—!"

ওদের দিকে তাকিয়ে অরুণ আর ঈভা দু'জনেই হাসলো।

ঈভা হস্টেলের ভিতর ঢুকে গেল।

অরুণ ধরলো বাড়ির পথ।

পথে যেতে যেতে ভাবছিলো ডেনিস নিকলসনের কথা।

একটি বিলিতী ফার্মে মস্তো বড়ো অফিসার ডেনিস নিকলসন, বিলেত-ফেরত একাউন্টেন্ট্।

অরুণ আরেকটি ফার্মে সাধারণ এসিস্ট্যাণ্ট।

বয়েসের পার্থক্যও বেশ কিছু। বন্ধুত্ব হওয়ার কথা নয়—তবু হয়েছিলো।

সিলভার মূন ক্লাবেরই হাউসিতে নিকলসনের সঙ্গে তার আলাপ।

সে বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। তখনো হাউসি আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়নি।

তখন বেগম বাহার লেনে অরুণের আনাগোনা ছিলো না। এ রাস্তার নামও সে জানতো না। নিকলসনের সঙ্গে যা কিছু যোগাযোগ হোতো, সবই তার অফিসে, নয়তো বা ক্লাবে।

অরুণ তালে ছিলো যদি নিকলসনদের অফিসে একটা ভালো স্থযোগ পাওয়া যায়। নিকলসন কলকাতার প্রায় সব ক্লাবেরই মেম্বার, তবে এসব ক্লাবের সব অনুষ্ঠানে সে আসতো না বড় একটা। আসতো শুধু হাউসিতে।

একদিন ওরা বসেছিলো পাশাপাশি। তখনো আলাপ হয়নি।

মাইক্রোফোনে নম্বর ভেসে আসছে একটার পর একটা।

"টু-লিট্‌ল্ ডাক্‌স্—টোয়েন্টি-টু—"

অরুণ একটি নম্বর কাটলো।

"নট্ সো স্থইট্—সেভেন্‌টীন—।"

অরুণ আরেকটি নম্বর কাটলো। নিকলসনও।

"ফোর্ সেভেন্—ফর্টি সেভেন্—।"

"হাউ-উ-উ-স্—ড্," অরুণ চেঁচিয়ে উঠলো।

নিকলসনই প্রথম কথা বললো অরুণের সঙ্গে।

"তোমার তো বরাত খুব ভালো। আসতে না আসতেই! গত তিন মাস ধরে আমি এদের প্রত্যেকটাতে আসছি। শুধু পয়সাই নষ্ট হচ্ছে।"

অরুণ তাকে পানীয় যাচলো।

সে গ্রহণ করলো।

তারপর বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো দুজনে। নিকলসন অনেক মনের দুঃখ সমঝালো অরুণকে। অরুণ অবাক হয়ে দেখলো যে এতবড় চাকরি, বাড়িতে সুন্দর বৌ,—তবু লোকটা সুখী নয়।

যে সমস্ত লোকের কথা উল্লেখ করে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের বুড়োরা ছেলেদের বলতো, ভালো করে পড়াশুনো করো, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শেখো, বাজে কাজে সময় নষ্ট কোরো না, তা' হলেই অমুকের মতো বড়ো হতে পারবে, সে সমস্ত সার্থক ব্যক্তিদের অন্যতম হোলো বেগম বাহার লেনের শেষ প্রান্তে বিরাট কম্পাউণ্ড ঘেরা বাড়ির ডেনিস নিকলসন। একটি জীবনে যা কিছু মধুর, যা কিছু সাফল্য, অন্য লোকে যার স্বপ্ন দেখে, সব কিছুই সে নিজের জীবনে পেয়েছিলো। বাপের বেশ কিছু পয়সা থাকা সত্ত্বেও নষ্ট হয়ে যায় নি, স্কুলে বেশ ভালো ছিল্লো পড়াশুনোয়। বাপ তাকে বিলেত পাঠিয়েছিলো একাউন্টেন্সি পড়তে,—আর একটি খাঁটি মেমসায়েব বৌ যোগাড় করতে। প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলে কলকাতার ইংরেজ মহলে পাত্তা পায়নি বলে বোধ হয় ক্ষোভ ছিলো নিকলসন সিনিয়ারের, তাই ডেনিসকে বিলেত পাঠিয়ে সেখানকার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যারা ছিলো তাদের চিঠি লিখে বার বারঃঅনুরোধ করেছিলো ডেনিসকে একটি ভালো মেয়ে "ফাইণ্ড্" করে দিতে।

ডেনিসের দু'চারজন আত্মীয় আত্মীয়া লণ্ডনেই বসবাস করতো, বাপের খুড়োদের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ইংরেজ কুটুমও ছিলো।। লণ্ডনে গিয়ে ডেনিস দেখে একটি সাদাসিধে মোটা বুদ্ধির মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেওয়া

হোলো, তাকে নিয়ে বেরুতে উৎসাহিত করা হোলো, অন্য মেয়ের সঙ্গে সামান্যতম বাক্যালাপেও নিরুৎসাহিত করা হোলো। সে নিজে কিছু জানবার আগেই দেখে অন্য সবাই ধরে নিয়েছে যে গোঁড়া রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত ইংরেজ পরিবারের রক্ষণশীল সাদাসিধে মেয়ে সাণ্ড্রার সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

সুতরাং ফেরার সময় তাকে বিয়ে না করে ফেরার কোন পথ রইলো না—এতই নিখুঁত আগের থেকে সাজানো ব্যাপার। ডেনিস নিকলসন এমনিতেই একটু লাজুক প্রকৃতির, সুতরাং নিরুপায় হয়ে এদের ষড়যন্ত্রের বলি না হয়ে পারলো না।

অরুণের সঙ্গে যখন তার আলাপ হোলো তখন তার বয়েস প্রায় চল্লিশ। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে মান, সম্মান, খ্যাতি খুব। বাপের তদ্বিরে চাকরিও পেয়েছিলো ভালো। জীবনে আর কোনো কিছুরই অভাব নেই।

পেছনে যে নিন্দে দু'একজন করতো না তা' নয়। তার বৌ যে খাঁটি ইংরেজ, সেটা অনেকের পক্ষেই সন্তোষজনক হয় নি।

কারণ, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে মেয়ের অভাব নেই। সুপ্রতিষ্ঠ রত্নেরা যদি বিলেতে গিয়ে মেমসায়েব বৌ আনে, এরা যায় কোথায়?

তার উপর অন্যান্য এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে কি রকম একটা দূরত্ব রেখে চলে তার ইংরেজ বৌ সাণ্ড্রা। ওদের সমাজে বেশী মেশে না। বাড়িতে গেলে অবশ্যি খুব ভদ্র ব্যবহারই করে, কিন্তু তার বন্ধুবান্ধব সব কলকাতার ইংরেজ মহলে।

এসব ডেনিসেরও খুব পছন্দ নয়। সে চায় তার বৌ একটু এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে মেলামেশা করুক। কারণ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানের আগামী বাৎসরিক নির্বাচনে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হিসেবে দাঁড়ানোর তার খুব ইচ্ছে। এ পাড়ার ওয়াই-ডবলিউ-সি-এ হস্টেলের মেয়েদের, পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের, আর অন্য পাড়ার মেয়েদের প্রায়ই বাড়িতে ডাকতো নিকলসন, সাধ্যমতো চাকরি যোগাড় করে দিতো বেকারদের, নিঃসহায় বুড়ো বুড়িদের সাহায্য করতো মরিসন্‌স্ হোম্‌এ জায়গা পেতে।

তবু তার বৌ যেন কি রকম একটু নিস্পৃহ।

কাউকে এসব কথা বোঝানো যায় না। সবাই জেনে যাবে।

অরুণকে পেয়ে, বিশেষ করে কয়েকটি পানীয়ের মন-ঢিলে-হয়ে-যাওয়া পরিবেশে, হঠাৎ মন খুলে দিলো তার কাছে। যাই হোক, ওর কাছ থেকে তো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের কেউ জানতে পারবে না। সুতরাং তার মতো একজন নিরাপদ লোকের কাছে মনের ভার হাল্কা করে সে সান্ত্বনা পেতে চাইলো।

তারপর, সে আরো অনেক পরে, একদিন যখন সে দেখলো অরুণ আনা-গোনা আরম্ভ করেছে বেগম বাহার লেনে, আর তার সঙ্গে খুব ভাব ওয়াই-ডবলিউ-সি এ হস্টেলের ঈভা বারওয়েলের সঙ্গে, তার মনের কোনো এক গোপন অবদমিত তন্ত্রে হঠাৎ কে যেন একটু-টুং-টাং করলো। সে জিজ্ঞেস না করে পারলো না, "অরুণ, তুমি কি ঈভা বারওয়েলকে খুব ভালোবাসো," এবং পেটে পাঁচটি স্কচ পরা মন-খোলা মেজাজে অরুণ যখন উত্তর দিলো, "খুউব, আমার সামনের প্রমোশনটি পেলেই ওকে বিয়ে করবো," নিকলসন অরুণের পিঠ চাপড়ে বললো, "দ্যাট্স্ ফাইন্, তুমি একটি খুব লাকি চ্যাপ্।"

"কেন?"

"কারণ তুমি একটি মেয়েকে ভালোবাসো, আর সেই মেয়েটিও তোমায় খুব ভালোবাসে।"

"এর আর এমন কী বিশেষত্ব আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। আমার এ রকম কোনোদিন হয়নি। বিলীভ্ মী। হ্যাভ এনাদার ছোটা। বেয়ারা—!"

তারপর তার নিজের মনের গোপনতম দুঃখটি খুলে বললো অরুণকে।

তার জীবনের এই দুঃখটি ব্যর্থতার, আর সেই গভীর ব্যর্থতা ছিলো রোমান্স। নিকলসন জীবনে সব কিছুই পেয়েছে, স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা,

সবই—কিন্তু এই রোমান্স পায়নি কারো কাছে, এমন কি নিজের স্ত্রীর কাছেও নয়।

বিয়ের আগে দু'একটি মেয়ের প্রেমে পড়বার চেষ্টা যে সে করেনি তা নয়, কিন্তু প্রত্যেকের বেলাই সে দেখেছে যে মেয়েদের আগ্রহ তার চাইতে তার ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার উপর অনেক বেশী।

সুতরাং বেশীদূর এগোয় নি ডেনিস নিকলসন। এমনিতেই একটু লাজুক। তার উপর ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত রোমান্সপ্রবণ মন। কিন্তু তার সেই রোমান্সের তৃষ্ণা কেউ মেটাতে পারে নি, মেটাবার চেষ্টাও করেনি।

তার এই রোমান্সপ্রবণ মন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিলো তার স্ত্রীর কাছ থেকেও। একরকম আগের থেকে সাজানো রেডি-মেড কোর্ট-শিপের মধ্যে বিয়ে হলেও, সাণ্ড্রা তাকে বেশ ভালোবাসতো তার সাদাসিধে ধরণে, ডেনিসও ভালোবাসতো সাণ্ড্রাকে। কিন্তু সে অত্যন্ত আটপৌরে ভালোবাসা—পারিবারিক জীবনের একটি চিরন্তন ফরমুল্যায় বাঁধা।

নিকলসনের ছেলেমেয়ে বেশী হয়নি, শুধু এক ছেলে, এক মেয়ে। এর বেশী সে চায়ওনি। স্বাস্থ্য এবং একটা আটপৌরে সৌন্দর্য সাণ্ড্রা ধরে রেখে-ছিলো এত বছর পরেও। কিন্তু এসবে ডেনিস নিকলসনের মন ভরে নি।

বিয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়নি একদিনের জন্যেও, জীবনে কোনোদিন প্রেমপত্র বা মামুলী চিঠি লেখবারও প্রয়োজন হয়নি। বিয়ের অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই সাণ্ড্রা তার কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠেছিলো। তবে তাকে সেকথা বুঝতে দেয় নি নিকলসন।

হয়তো বা সাণ্ড্রার কাছেও সে একঘেয়ে হয়ে উঠেছিলো আর কেতাদুরস্ত ইংরেজ ললনা সাণ্ড্রাও তাকে বুঝতে দেয়নি সেকথা।

তবু পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট শান্তি ছিলো, প্রত্যেকে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতো প্রত্যেকের সঙ্গে।

এ সব দুঃখ করে অরুণকে বোঝাতো ডেনিস নিকলসন।

মেয়েরা যদি এত বস্তুতান্ত্রিক হয়, তাহলে ছেলেদের জীবনে রোমান্স আসে কোত্থেকে, নিকলসন আক্ষেপ করে বলতো।

কিন্তু ডেনিস নিকলসনের জীবনে সব কিছুর সাফল্য ছিলো নিয়তির লিখন।

শেষ পর্যন্ত রোমান্সও এলো।

ডেনিস নিকলসনের স্কুলের সহপাঠী এক পাঞ্জাবী বন্ধু ছিলো। তার নাম ওমপ্রকাশ। পেশায় এন্‌জিনিয়ার। বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছে। সম্প্রতি ফিরে এসেছে এ দেশে।

সে এসে একদিন বললে, "ডেনিস, একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে। আমার সঙ্গে সে বেরোয়, কিন্তু একা আসে না। সঙ্গে ওর একটি বন্ধু থাকে। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে আসো তো ভালো হয়।"

"কেন, আমি এসে কী করবো?"

"তোমার সঙ্গে যদি ওর বন্ধুর ভাব হয়, আর সে যদি তোমার সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়, তা হলে এই মেয়েটিকে আমি একটু নিরিবিলি পেতে পারি।"

ডেনিস নিকলসনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। এ রকম তার জীবনে কোনোদিন হয়নি।

কিন্তু পরমুহূর্তেই সে শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

বললো, "না, না, এ ভালো দেখায় না। আমার বৌ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, বয়েসও প্রায় চল্লিশ হোলো—।"

ওমপ্রকাশ তার কাঁধে হাত রেখে বললো, "আঃ, কী হয়েছে তাতে, এসো, এসো। তোমায় দেখে তিরিশের বেশী মনে হয় না। আর কে বলতে যাচ্ছে তোমার বৌকে। আমার তো এখনো তোমার বৌয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ারই সুযোগ হয়নি।—"

"না, তোমার সম্বন্ধে তো কোনো ভয় নেই। আমি ভাবছি অন্য কথা। আমার নাম তো অনেকেই জানে।"

"জানলেই বা। এই মহিলাটি তো আর তোমার বৌয়ের কাছে গল্প করতে যাচ্ছে না—।"

"অন্য কারো কাছে তো গল্প করতে পারে। তারপর যদি আমার বৌয়ের কানে কথাটা ওঠে?"

"আচ্ছা লোক তো! বৌ আছে এরকম অনেক লোক দেখেছি, কিন্তু তোমার মতো ভীতু আর দেখিনি।"

"না, না, সে জন্যে নয়," নিকলসন বললো, "দেখ, আমার বৌ যদি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হোতো, আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু আমার বৌ, জানোই তো, ইংরেজ। সে আমায় ভুল বুঝতে পারে। ওরা একেবারে ডাহা কন্‌জারভেটিভ।"

"বেশ, তাহলে এসো না।"

নিকলসন একটু বিষণ্ণ হোলো।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, মহিলাটি কে?"

"আমার মেয়েটি হোলো জীন্‌ রিঙ্গার, আধা ফ্রেঞ্চ, আধা আমেরিকান। ছবি আঁকে। ওর বাবা বাওয়ার অয়ল্‌ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড্‌এর জেনারেল ম্যানেজার। আর ওর শেপারনটি জুনো বার্কার। নিশ্চয়ই ওর নাম শুনেছো।"

"জীবনে কোনোদিন না," বললো নিকলসন, "হু দি ডেভিল ইজ্‌ শী?"

"ওই যে বাচ্চাদের পাতায় ছড়া লেখে মাঝে মাঝে—," বলে ওমপ্রকাশ একটি বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিকের নাম করলো।

"কি জানি, আমি বাচ্চাদের পাতা পড়ি না। যাই হোক, বেশ একটা ইন্টারেসটিং ক্রাউড্‌, এ্যাঁ? ওরা একজন পেইণ্টার, একজন পোয়েট, আমরা একজন একাউণ্টেণ্ট, একজন এন্‌জিনিয়ার।—আচ্ছা, ওরা কি আমার নাম জানে?"

"আমার মনে হয় না।"

"আমায় কোনোদিন দেখেছে কোথাও ?"

"ওটা প্রশ্নের বাইরে। ওরা যেসব বৃত্তে ঘুরে বেড়ায়, আমরা ওসব বৃত্তের স্পর্শরেখা হয়ে চলে যাই।"

"তা হলে এক কাজ করো। আমার নাম ওদের বোলো না। বোলো, আমার নাম—ম্—অরুণ,—অরুণ বোস।"

"বাঙালী নাম ? ওহে, তোমার চেহারাটি ?"

"বোলো আমার মা ছিলেন ইংরেজ।"

নিকলসনের মুখে একথা শুনে অরুণ বললো, "সর্বনাশ করলে। শেষে আমায় কোন বিপদে ফেলবে !"

"পাগল না কী ! তুমি বিপদে পড়তে যাবে কেন ? কলকাতায় কতো অরুণ বোস আছে। আর তোমার মা তো ইংরেজ নয়।"

ওমপ্রকাশ একটা, দুটো, তিনটে এন্‌গেজমেণ্ট করেও নিকলসনকে টেনে নিয়ে যেতে পারলো না।

ও প্রত্যেকবারই পিছিয়ে গেল।

বললো, "না, আমায় ভয় করছে।"

তারপর একদিন ওমপ্রকাশ এসে বললে, "ডেনিস, এবার আর তোমায় ছাড়ছি না। তোমায় আসতেই হবে।"

"কোথায় ?"

"ফার্গুহার্সন এণ্ড কানিংহ্যাম ফুড প্রডাক্‌ট্‌স্‌এর ছোটো কানিংহ্যাম ওর বাড়িতে একটা পার্টি দিচ্ছে। একটু অন্যরকম ব্যাপার। সবাই মাস্‌ক্ পরে থাকবে। আর নো ইনট্রোডাকশান্‌স্। তোমার জন্যে একটি কার্ড এনেছি।"

"কবে ?"

"চোদ্দো তারিখ— ।"

সেদিন ফেব্রুয়ারি মাস। ডেনিস নিকলসনের মনে পড়লো।

"সেদিন ভ্যালেন্টাইন্‌স্ ডে— । তাই না ?"

ওমপ্রকাশ হাসলো।

নিকলসন একটু ভাবলো।

তারপর বললো, "ওম, তোমার কাছে টাইট্ পায়জামা আর কালো শেরওয়ানি আছে ?"

"হ্যাঁ। কেন ?"

"আমায় ধার দিতে পারো ? তোমার আমার প্রায় এক সাইজ। ঠিক ফিট্ করবে।"

ওমপ্রকাশ হাসলো।

বললো, "মন্দ আইডিয়া নয়। কালো ট্রাউজার আর সাদা জ্যাকেটে তোমায় অরুণ বোস বলে চালানো একটু শক্ত হতে পারে। সেটা অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য হবে পায়জামা শেরওয়ানিতে। বেশ, আমার কোনো আপত্তি নেই।"

সেদিন সন্ধ্যের পর নিকলসন্ তার বৌ সাণ্ড্রাকে বললো, "আমাদের অফিসের একজন ওর বাড়িতে খেতে বলেছে। একটু ব্যবসা সংক্রান্ত কথা-বার্তাও আছে। ফিরতে একটা দেড়টা হবে। তুমি অপেক্ষা কোরো না।"

"ঠিক আছে," সাণ্ড্রা বললো, "আমার বড্ডো মাথা ধরেছে। আমি তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়বো।"

পার্টির ভিড়ের মধ্যে ডেনিস নিকলসন কাউকে চিনতে পারলো না প্রথমে। তারপর গলার আওয়াজে চিনতে পারলো কয়েকজনকে। তবে অচেনাও অনেক।

ওমপ্রকাশকে জিজ্ঞেস করলো, "ওরা কোথায় ?"

এককোণে বসে গল্প করছিলো কয়েকজন।

ওমপ্রকাশ বললো, "ওই যে দেখছো, ওদের মধ্যে যে মেয়েটির গলায় মুক্তোর মালা সেই হোলো জীন।"

"কি করে চিনলে?"

"ওর হাতে ওই তিব্বতী ব্রেসলেটখানি দেখছো? ওটি আমার দেওয়া।"

"সে তোমায় কি করে চিনবে?"

"আমার কোটে সাদা গোলাপ গুঁজেছি, দেখছো না? তাই কথা ছিলো।"

"ও, আচ্ছা। অন্য মেয়েটি?"

"জুনো? ওই যে ওর পাশে বসে আছে।"

নিকলসন তাকিয়ে দেখলো। কিছু বুঝবার উপায় নেই, অন্য সবারই মতো কাঁধ-খোলা গাউন, মুখের উপর কালো মাস্‌ক্।

"তুমি ওকে কিন্তু বলবে আমার নাম অরুণ বোস! আসল নামটা বলে ফেলো না যেন—।"

ওমপ্রকাশ হাসলো।

"আজতো কাউকে কারো নাম বলা হবে না—।"

"ও হ্যাঁ, নো ইনট্রোডাক্‌শান্‌স্! মনেই ছিলো না।"

"তবে সে জন্যে ভেবো না। জীনের মারফৎ জুনো জেনে গেছে যে আজ আমার সঙ্গে একজন আসছে যার নাম অরুণ বোস। আর তোমার পোশাক পায়জামা, শেরওয়ানী।"

"কিন্তু পায়জামা শেরওয়ানী পরে তো আরো দু'জন এসেছে।"

"তোমার বাটন্‌হোলে সাদা গোলাপ—।"

"ও, হ্যাঁ। সেজন্যেই তুমি এটি দিয়েছিলে?"

ওদের পানীয় শেষ করে ওরা এদিকে সরে এলো।

নাচ সুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে।

জীনের সামনে এসে ওম বাও করে এ নাচে তার সাহচর্য চাইলো।

ও কথা শেষ করবার আগেই জীন হেসে উঠে পড়লো।

অন্ধ মেয়েটি মাস্ক্‌এর ভিতর থেকে তাকালো নিকলসনের দিকে।

নিকলসনও দেহের উপরের অর্ধাংশ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করলো।

তারপর গলা দিয়ে কথা বার করতে গিয়ে দেখে গলা শুকিয়ে গেছে, কথা বেরুচ্ছে না।

কিন্তু তার কোনো কথা বলার জন্যে আর অপেক্ষা করলো না জুনো বার্কার নামে সেই মহিলা।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

তাকে নিয়ে অন্যান্য জুড়িদের ভিড়ে মিশে গেল ডেনিস নিকলসন।

আর সারাটাক্ষণ একটি রোমাঞ্চময় অনুভূতির ঢেউ ওঠা নামা করতে লাগলো তার শরীর বেয়ে।

অন্য কারো সঙ্গে যে সে কোনোদিন নাচেনি, তা' নয়। কিন্তু সে সব সামাজিক সুজনতা, তারা যে এর বৌ, ওর বোন, বা তার বাগদত্তা, এই সামাজিক পরিচয় সম্বন্ধে সজাগ হয়ে।

কিন্তু এই প্রথম একজন—যে তার সম্পূর্ণ অচেনা, যাকে তার নিজের পরিচয় না দিলে, বেশ কিছুদিন.........

না, না, ওমপ্রকাশ যাই বলুক, সে হতে পারে না। তার বাড়িতে বৌ আছে, ছেলেমেয়ে আছে,.........

কিন্তু এতদিন পরে যখন সেই রোমান্সের সুযোগ এলো, যেটা তার জীবনে আগে কোনোদিন.........

না, না, সে হয় না। ঘেমে উঠলো ডেনিস নিকলসন।

শেষ হোলো।

চারদিকে ভিড়, লোকে ঠাসাঠাসি।

জুনোকে নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এলো নিকলসন।

তারপর কথা বলতে গিয়ে দেখে গলাটা একেবারে ধরে গেছে, কথা বেরুচ্ছে না। ভেতরের শার্ট ঘামে ভিজে গেছে, আর আঙুলগুলো কাঁপছে থরথর করে।

কোনো কথা না বলেই সে বার্‌-এ পালিয়ে এলো।

কিছুক্ষণ পর ওমপ্রকাশ এলো তার খোঁজে। বললো, "তোমার কী হয়েছে বলো তো? ওরা তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলো। বলছিলো, তোমার বন্ধু বোবা নাকি, একটি কথাও বলে নি। আমি বলতে বাধ্য হলাম যে পথে ঠাণ্ডা লেগে তোমার গলা ধরে গেছে। যাক, এসো এবার। ওদের গিয়ে বলি, কয়েকটি পানীয়ের পর তোমার গলা ঠিক হয়ে গেছে।"

"না, ভাই, মাপ করো, আমি এখান থেকে নড়ছি না। আমার আরো কয়েকটি পানীয় দরকার।"

"সে তো ওখানে বসেই হতে পারে—।"

ডেনিস নিকলসন গেল না কিছুতেই। ওমপ্রকাশ রাগ করে চলে গেল।

নিকলসন বসে রইলো চুপ করে। গেলাসে একটু একটু করে চুমুক দিতে দিতে ভাবলো, কেন আমার এরকম হোলো? আর তো কোনোদিন হয়নি। শুধু একটি অচেনা মেয়ের হাত ধরেই আমার আঙুল কাঁপছে? কিন্তু কী মিষ্টি তার গায়ের সৌরভ? কি পারফ্যুম্ ব্যবহার করে সে? নামটা ভাববার চেষ্টা করলো নিকলসন। মনে পড়লো না।

চারদিকে সব একটু একটু করে ঘুরতে সুরু করেছে। টেবিলগুলো দুলছে, চেয়ারগুলো দুলছে, লোকগুলো আওয়াজ করছে চাকের মৌমাছির মতো, আকাশের চাঁদ দুলছে, তারাগুলি নেমে এসে জানলার পর্দার পেছনে উড়ে বেড়াচ্ছে জোনাকির মতো।

নিকলসন মাথাটা ঝাঁকালো।

নাঃ, আর নয়, অনেক হয়েছে।

ভাবতে ভাবতে আরো তিনটে গেলাস হয়ে গেল।

ওমপ্রকাশ এসে বললো, "এ কী, তুমি বারান্দার রেলিঙের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছো কেন? আর, এক পা বাইরে, এক পা ভেতরে? হাঃ হাঃ, নামো, নামো, পড়ে যাবে তা নইলে। এসো, ওরা চলে যাচ্ছে—।"

"ওদের জাহান্নামে যেতে দাও," নিকলসন জড়িয়ে জড়িয়ে বললো।

"এসো, ডোণ্ট বি এ ফুল, ওরা তোমায় কী ভাববে বলো তো?"

"ওদের যা খুশি ভাবুক। জুনোকে বলে দিও যে আমি প্রথম দর্শনেই ওর প্রেমে পড়ি নি। কোনোদিন প্রেমে পড়বোও না। ওকে কি রকম দেখাচ্ছে জানো? ঠিক একটি মেয়ে-ড্রাকুলার মতো, ঠিক একটি মস্তো বড়ো ভ্যাম্পায়ার-ব্যাট, একটি রক্তচোষা-বাদুড়, ইন হার লুস্ ব্ল্যাক গাউন। ওকে ওর পাখা মেলে উড়ে যেতে বলো," এই বলে মাথা থেকে বুকে, বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধে, ক্রস্ কাটলো।

"তুমি যে একটু মাতাল হয়ে গেছ, ডেনিস," ওমপ্রকাশ বললো।

"হয়েছি তো বেশ করেছি। হতে হয়েছে আমায়। ও যে তিন চার মিনিট আমার সঙ্গে ছিলো, ওরই মধ্যে আমার হার্টের তিন আউন্স রক্ত নিংড়ে খেয়েছে। এই দেখ আমার মুখ কি রকম সাদা, ঠিক তোমার জ্যাকেটের মতো।"

একটু হেসে ওমপ্রকাশ চলে গেল।

আরেকটি গেলাস শেষ করলো ডেনিস নিকলসন।

বারান্দার থামটি জড়িয়ে ধরে জিটারবাগের চেষ্টা করলো।

তাতে সাফল্যলাভ করতে না পেরে আরো একটি গেলাস শেষ করলো।

তারপর বার্-টেণ্ডারকে বললো, "এতে কিছু হচ্ছে না। কিছু মিশিয়ে দাও,—হুইস্কি, জিন, রাম্, যা যা ইচ্ছে। খুব কড়া করে একটা কিছু—"

"খুব হয়েছে, আর নয়," বলে পেছন থেকে তাকে টেনে নিয়ে এলো ওমপ্রকাশ। তারপর ওকে নিয়ে লন্এ গিয়ে বসলো।

বললো, "তুমি যা যা বলেছিলে সবই ওদের বলেচি—।"

"এ্যাঁ? সব?"

"সব। জানো, আমিও একটু 'হাই' হয়ে আছি, তবে তোমার মতো নয়। তোমার কথা শুনে ওরা খুব হাসলো।"

"হ্যাঁ, ওরা তো হাসবেই। আমার বুক যখন জ্বলে, তখন ওরা হাসে। রোম যখন জ্বলেছিলো, নীরো তখন হেসেছিলো।"

"বোসো, তোমার জন্যে, কফি নিয়ে আসি এক কাপ।"

একটু পরে খুব কড়া এক কাপ কফি নিয়ে ওমপ্রকাশ ফিরে এলো।

ডেনিস নিকলসন জিজ্ঞেস করলো "কফিতে সোডা এত কম দিয়েছে কেন?"

হাসি চেপে ওমপ্রকাশ বললো, "সোডা মেশালে বড্ড পাতলা হোতো, তাই 'র'-কফি এনেছি, নীট্ খেয়ে নাও।"

"ও ইয়েস, থ্যাঙ্ক্যু, থ্যাঙ্ক্যু, থ্যাঙ্ক্যু— ।"

কফি শেষ হতে ওমপ্রকাশ বললো, "এবার বাড়ি চলো।"

"না, আমি বাড়ি যাবো না।"

"কোথায় যাবে তা' হলে?"

"জুনোর বাড়ি যাবো।"

"আচ্ছা, তাই চলো— ।"

বাইরে এসে ওমপ্রকাশ গাড়ির হুড তুলে ময়দানের দিকে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলো। ময়দানের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু সুস্থির হোলো ডেনিস নিকলসন।

বললো, "দেখছো, কলকাতা কী সুন্দর দেখতে! আকাশে তারা, চৌরঙ্গিতে আলো। মনে হয় জুনোর একটি চোখ আকাশে, একটি চোখ চৌরঙ্গিতে। আই এ্যাম ইন্ লাভ উইথ ক্যালকাটা, সো আই এ্যাম ইন লাভ উইথ জুনো।"

"জুনোর বাড়ি যাবে?"

"না, আজ নয়, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। এবার বাড়ি চলো।"

"জুনো যে বসে আছে তোমার জন্যে— ।"

"না, ওর ওখানে কাল যাবো। এখন বাড়ি চলো।"

ওমপ্রকাশ ডেনিস নিকলসনকে বাড়ি পৌঁছে দিলো।

তারপরদিন ওমপ্রকাশ অফিসে টেলিফোন করলো।

"হ্যালো ডেনিস, ওল্ড বয়, কি রকম আছো।"

"ফাইন, থ্যাঙ্ক্যু।"

"আজ জুনোর বাড়ি যাবে?"

নিকলসন হাসলো।

"আজ নয়। এখন থাক, পরে একদিন দেখা যাবে।

এরপর একদিন অর্ডন্যান্স ক্লাবে অরুণের সঙ্গে দেখা হতে নিকলসন বললো, "ওহে, তোমায় এখন থেকে খবরটা দিয়ে রাখি। আগামী মার্চে আমাদের সেল্স্এ কিছু লোক নেবে।"

"তাই নাকি," খুশী হোলো অরুণ।

ঈভাকে বিয়ে করতে হবে। আয়টা একটু বাড়ানো দরকার।

"আরেকটা কথা। শুধু তোমার আমার মধ্যে। জানো, আমি প্রেমে পড়েছি।"

অরুণের চোখ কপালে উঠলো।

অরুণ আর ডেনিস বাইরে দুটো চেয়ার টেনে বসলো। ডেনিস বয়কে ডেকে দুটো বীয়ার আনতে বললো।

তারপর ফিরলো অরুণের দিকে। আস্তে আস্তে বললো, "এখনো তার সঙ্গে ভালো করে আলাপই হয় নি।"

"সে কি?"

"হ্যাঁ। ওমপ্রকাশ,—আমার একজন বন্ধু, তুমি ওকে এখনো দেখ নি, না? নাইস্ চ্যাপ, একদিন আলাপ করিয়ে দেবো—ওমপ্রকাশ বলছিলো সে নাকি বার বার আমার কথা জিজ্ঞেস করছে। এরকম হতে পারে?"

"কেন হতে পারে না?"

"সে আমায় ভালো করে দেখেই নি—"

"তাতে কি?"

"ও জানে আমার নাম অরুণ বোস।"

"সর্বনাশ, অরুণের মুখ ফ্যাকাশে হোলো, "ঈভা যদি জানতে পারে—।"

"পাগল হয়েছো? ওরা বিদেশী। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ হওয়ার কোনো উপলক্ষ হবে না।

অরুণ চুপ করে রইলো।

"ভাবছি যাবো কি যাবো না," নিকলসন বললো। "সে ওমপ্রকাশকে দিয়ে আমায় অনেকবার খবর পাঠিয়েছে।"

অরুণ কোনো উত্তর দিলো না।

ওমপ্রকাশ সোজা নিকলসনের অফিসে এসে উপস্থিত হোলো।

বললো, "এরকম আমি জন্মেও শুনিনি— ।

"কী ব্যাপার ?"

"কী কাণ্ড ! তুমি ওর সঙ্গে একটি কথাও বলো নি। শুধু কয়েক মিনিট একসঙ্গে নেচেছো। আর এতেই সে আমার গার্ল জীনকে দিনরাত শুধু তোমার কথাই জিজ্ঞেস করছে ? বলছে, তুমি কী চমৎকার নাচো। ঠাণ্ডায় তোমার গলা ধরে গিয়েছিলো বলে তুমি ভদ্রতা করে আর ওর কাছে যাও নি, যাতে তোমার সঙ্গ ওর একঘেয়ে না লাগে। তুমি ইণ্ডিয়ান বলে তোমার এত ভদ্রতাবোধ, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। আর তুমিও এমন গাধা ! এত প্রোগ্রাম করলাম, একটার পর একটা। একটিতেও এলে না। এই নাও।"

"কী ওটা ?"

"জুনোর চিঠি। জীন আমাকে আর তোমাকে চায়ে ডেকেছে। চিঠিতে জুনোও একটি লাইন লিখে দিয়েছে।"

নিকলসন চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়ে দেখলো। জীন লিখেছে তার ওখানে চায়ে ডেকে। নিচে এক লাইন জুনোর,—"ডিয়ার মিস্টার বোস্, তুমি যদি আসো তো খুব আনন্দিত হবো।—জে।"

"তুমি যাবে ?"

"আমি ?"

অনেকক্ষণ ভাবলো ডেনিস নিকলসন।

তারপর বললো, "আচ্ছা, যাবো।"

ওমপ্রকাশ নিকলসনের পিঠ চাপড়ে বললো, "খুব ভালো কথা। তাহলে

সন্ধ্যে নাগাদ আমার বাড়ি এসো। তারপর একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলো ডেনিস নিকলসন।

দেখলো বেরোবার উদ্যোগ করছে তার বৌ সাণ্ড্রা।

"কোথায় যাচ্ছো," জিজ্ঞেস করলো ডেনিস।

"এক বন্ধুর ওখানে। তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছিলো, ডেনিস। কিন্তু, তুমি তো আটটার আগে অফিস্ থেকে ফেরোই না। আচ্ছা এত কী কাজ তোমার, ডেনিস? তোমায় বাড়িতে একেবারেই পাওয়া যায় না। আমার এ বন্ধুর সঙ্গে তো তোমার আলাপই করিয়ে দেওয়া হয় নি। এ আমার বিলেতের বন্ধু। সম্প্রতি এখানে এসেছে। মেয়েটির বাবা আমেরিকান, মা ফ্রেঞ্চ। অনেকদিন লণ্ডনে ছিলো।"

শুনে ভুরু কোঁচকালো ডেনিস নিকলসন।

"কে সে?"

"রিঙ্গার। জীন্ রিঙ্গার। খুব ভালো ছবি আঁকে। একদিন তোমাকে ওর ছবি দেখাতে নিয়ে যাবো।"

নিকলসন চুপ করে রইলো।

"তোমার অন্য কোনো কাজ না থাকলে তুমিও চলো না," সাণ্ড্রা বললো।

"অনেকেই থাকবে বুঝি?"

"না, না, এই কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। তোমার বেশ ভালো লাগবে ওদের। চলো না। মোটে আমাদের ক'জনকে চায়ে ডেকেছে।"

"আমায় তোডাকেনি—।"

"হ্যাঁ, আমায় বলেছিলো তোমার কথা। কিন্তু তোমার ফিরতে দেরী হবে ভেবে আমি জীনকে বলে দিয়েছি যে তুমি যাবে না, শুধু আমি একাই যাবো। তুমি গেলে কিন্তু জীন খুব খুশী হবে।"

"না, আজ আমি বড়ো ক্লান্ত," উত্তর দিলো নিকলসন।

ভাবলো, সাণ্ড্রাও তা'হলে জীন্‌কে চেনে? তার মানে জুনোকেও চেনে।—সর্বনাশ করেছে!

ওমপ্রকাশকে টেলিফোন করে দিতে হবে যে আজ ওর যাওয়া হবে না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, জুনো বার্কার বলে কাউকে তুমি চেনো? "যে বাচ্চাদের জন্যে ছড়া লেখে," বলে একটি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিকের নাম করলো।

সাণ্ড্রা একটু তাকালো নিকলসনের দিকে, তারপর হাসতে সুরু করলো।

ইতিমধ্যে তার মুখও একটু লাল হয়ে এসেছে।

বললো, "ডেনিস, ভেবেছিলাম কেউ জানবে না, তারপর একদিন আস্তে আস্তে তোমায় বলবো। এখন দেখছি সবাই জেনে গেছে। সত্যি, কলকাতায় কি কিছু গোপন রাখবার উপায় নেই? ছোটোদের জন্যে ছড়া লেখায় আমার খুব শখ। অনেকদিন ধরে লিখছি, কাউকে বলিনি। তোমায়ও বলিনি, শুনে তুমি যদি হাসো। একদিন কাগজে পাঠিয়ে দিলাম। দেখি ওরা ছাপিয়ে দিয়েছে। তারপর আরো কয়েকটা ছাপিয়েছে। আগামী মাসে আমার জন্মদিন। ভেবেছিলাম, সেদিন তোমায় বলবো। তুমি নিশ্চয়ই রাগ করোনি;—কিন্তু তুমি কী করে জানলে বলো তো?"

একটু হেসে নিকলসন বললো, "আজ আমাদের একজন ডিরেক্টার বলছিলো।"

"সে কী করে জানলো?"

"নিশ্চয়ই ওই খবরের কাগজের ডিরেক্টারদের কারো কাছ থেকে শুনেছে। ওদের মধ্যে তো জানাশোনা খুব।"

সাণ্ড্রা পাশের ঘরে চলে গেল।

নিকলসন শুনতে পেলো সাণ্ড্রা ফোন করছে তার বন্ধু জীন্‌কে—আজ সে যেতে পারবে না, তার স্বামী ফিরে এসেছে অফিস থেকে। তার বন্ধুদের যেন বলে দেয় কিছু মনে না করতে।

ফিরে এসে নিকলসনকে বললো, "সত্যি সত্যি তুমি রাগ করেছো আমার উপর ?"

"কেন ?"

"আমি যে জুনো বার্কার নামে বাচ্চাদের ছড়া লিখি সে কথা তোমায় এদ্দিন জানাইনি বলে—"

নিকলসন হেসে সামনে ঝুঁকে সাণ্ড্রার নাকের ডগায় একটি চুমু খেলো।

তারপর একটি সোফায় গিয়ে বসলো।

সাণ্ড্রা বসলো হাতলের উপর। হাতখানি রাখলো নিকলসনের কাঁধে।

সেই হাত ! ডেনিস নিকলসন ভাবলো,—লাভ ইজ ব্লাইণ্ড, কিন্তু সে কি মানুষকে এতই অন্ধ করে দেয় যে এত চেনা হাতটি চিনতে পারলাম না, এত চেনা পারফ্যুমের গন্ধ, তাও ধরতে পারলাম না !

সাণ্ড্রাকে কোনোদিনই জানতে দেয় নি নিকলসন্।

অরুণের কাছেও রোমান্সের জন্যে আক্ষেপ করে নি আর কোনোদিন।

নিয়নের আলো-ঝলমল সন্ধ্যেবেলা সিনেমার শো-ভাঙা জনতা যখন উজান বেয়ে চলে চৌরঙ্গির ফুটপাথ ধরে, বিবি আর সাহেবজাদীরা একটু থমকে দাঁড়ায় জুতোর দোকানের বাহারে শো-কেসের সামনে, আনমনা পথিক বইএর স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে বিদেশী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যায়, কলকণ্ঠ ভিখারী ছেলেমেয়ে তাড়া করে মাথায়-পানামা-হ্যাট গায়ে-ছবি-আঁকা-হাওয়াইআন-শার্ট আর কাঁধে-ক্যামেরা-ঝোলানো বিদেশী পর্যটকদের, আর বড়ো হোটেলটির সামনে জমকালো উর্দি পরা পশ্চিমা দারোয়ানটি যখন অনুগত গোলামের মতো সেলাম ঠোকে জমকালো গাড়ি থেকে নেমে আসা উন্নাসাদের———ফুটপাথের এক পাশে তখন শোনা যায় টুং-টাং ব্যাঞ্জো বাজছে।

কেউ বা ফিরে তাকায়, কেউ বা ফিরে তাকায় না।

ঈভা বারওয়েল্‌ও প্রথমটা দেখেনি। সে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলো অরুণের সঙ্গে।

বলছিলো, "সেদিন সাণ্ড্রার বর ডেনিসের সঙ্গে আলাপ হোলো। এত সাদাসিধে! এত বড়ো চাকরি করে কিন্তু কোনো দেমাক নেই। কিন্তু সাণ্ড্রা একটু কিরকম যেন। খুব ভদ্র, তবু যেন একটু দূরত্ব রেখে চলে। বোধহয় ও ইংরেজ বলেই এরকম। তবে এটা সত্যি, ওরা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসে।"

অরুণ একটু হাসলো।

ডেনিস নিকলসন তার রোমান্সের গল্প শুধু অরুণের কাছেই করেছিলো, আর কাউকে কোনোদিন কিছু বলে নি।

ব্যাঞ্জো বাজাতে বাজাতে লোকটি তাদের সামনে এলো।

ঈভা তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে তার হাতে একটি দু'আনি দিলো।

লোকটি চলে গেল পাশ কাটিয়ে।

ঈভা বললো, "জানো অরুণ, আমি শুনেছি এ লোকটি নাকি আগে বেগম বাহার লেনে থাকতো। তখন তার চোখ দুটো ভালো ছিলো। চোখে দেখতে পেতো। চাকরিও একটা করতো। ও অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ওর এই দুর্দশা। এখনো ওকে মাঝে মাঝে বেগম বাহার লেনে দেখা যায়।"

"ওর কেউ নেই?" অরুণ জিজ্ঞেস করলো।

"নিশ্চয়ই কেউ নেই," বললো ইভা। "কেউ থাকলে কি আর এরকম হয়। কিংবা, কে জানে, হয়তো কেউ থেকেও নেই। আজকের দিনে জুতোর গোড়ালি ক্ষয়ে ক্ষয়ে মাটিতে ঠেকলে কে আর কার খোঁজ নেয় বলো।"

ওরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলে গেল।

এদিকের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে লোকটি ব্যাঞ্জো বাজিয়ে যায় নিজের মনে।

অতি করুণ তার ব্যাঞ্জোর সুর, অতি মন্থর তার পদক্ষেপ। পরনের নীল জিনের প্যাণ্টখানি কোনোরকম আকৃতিবিহীন, রং উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। গায়ের খাকি শার্ট এখানে সেখানে ছেঁড়া। গায়ের ফর্শা রং অভাবে আর রোদ-ঝড়ে বিবর্ণ, ফ্যাকাশে! মাথার কটা চুল রুক্ষ, এলোমেলো। কেউ বা দু'এক আনা পয়সা দেয় তার হাতে। আর কেউ বা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কারো কাছে হাত পাতে না লোকটি। শুধু ব্যাঞ্জো বাজিয়ে যায় নিজের মনে।

চৌরঙ্গির আলো আর রঙের বাহার তার চোখে আজ আর ধরা পড়ে না, শুধু ধরা পড়ে তার মনে।

কই, বদলায়নিতো কিছুই? ব্যাঞ্জো বাজাতে বাজাতে ভাবে চার্লি নেলসন।

ওপাশে রাস্তার মাঝখান দিয়ে গাড়ির পর গাড়ির হর্ন, এ পাশের ফুটপাথে অসংখ্য পদধ্বনি। খুটখুট করে যেন জুতোর হীলের আওয়াজ, নিশ্চয়ই কোনো অল্পবয়েসী মহিলা,—আরেকটু কাছে আসতেই মৃদু ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ।

কি যেন হাতে গুঁজে দিলো।

আঙুল দিয়ে অনুভব করে চার্লি নেলসন।

একটি আধুলি।

"থ্যাঙ্ক্যু ম্যা'ম্।"

আস্তে আস্তে দূরে চলে যায় উঁচু হীলের শব্দ।

নিজের মনে ব্যাঞ্জো বাজায় চার্লি নেলসন, অনেকদিনের পুরোনো একটি গানের সুর—

There was a moon,—
That April night……

যে গানটি গাইতো বেরিল ও'হারা নামে সেই মেয়েটি। ল্যাভেণ্ডারের সৌরভ পাওয়া যেতো তার সান্নিধ্যেও, আর এমনি করে হীল খুট খুট করে চলতো সে।

কতোদিন……কতোদিন এই চৌরঙ্গিতে ঘুরে বেরিয়েছে সে আর বেরিল, এ পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরেছে সিনেমা দেখে। কতো নিউ ইয়ার ঈভ্ তাদের হাসির দমকা হাওয়ায় শির শির করে উঠেছে রাস্তার ওপারের গাছগুলোর পাতায় পাতায়। সেই দিনগুলোতে চালি আর বেরিল মিশে থাকতো এখানকার জনতায়——যেই জনতায় থাকতো জ্যাকি ব্রাউন, জুডি, হেনরি, মলি, জিমি, ফ্রেডি নেসবিট, আইরীন, ববি, ডলি ডি-সুজা, রোজমারী, পলিন, অলগা, সিলভিয়া, ন্যান্সি, জেনি, নোরা আর আরো কতো কে।

তখন চোখে দেখতে পেতো চালি নেলসন, তখন চাকরি করতো একটি রেডিওর দোকানে। তখন বয়েস ছিলো আরো কম, দেখতে ছিলো ভালোই। তখনো এমনিতরো জনতা সন্ধ্যেবেলার চৌরঙ্গিতে, তখনো এমনিতরো আলো……

টুং-টাং ব্যাঞ্জো বাজে, এক পা এক পা করে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় চালি নেলসন। ঠুক ঠুক উঁচু-হীল জুতোর শব্দ। আবার তেমনিতরো ল্যাভেণ্ডারের মৃদু গন্ধ। হাতের মুঠোয় দুটো দুআনি আসে।

"……থ্যাঙ্ক্যু ম্যা'ম্…।"

প্রায় প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা এমনিতরো ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ তিনবার চার-বার। কতো মেয়ে ল্যাভেণ্ডার ব্যবহার করে আজকাল, যেমনটি ব্যবহার করতো বেরিল ও'হারা।

চালি নেলসন নিজের মনে ব্যাঞ্জো বাজায়……There was a moon… রঙ-ময়লা মেয়ে বেরিল ও'হারা……That April night……তবু কী মিষ্টি, কী সুন্দর দেখতে……When I was in your arms……

……তেমনিতরো মৃদু ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ, আবার।

"……থ্যাঙ্ক্যু ম্যা'ম্।

……There was a dream……নিজের মনে টুং-টাং ব্যাঞ্জো বাজিয়ে

যায় চার্লি নেলসন···**That lonely night**······আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসে জনতার কোলাহল আর ট্র্যাফিকের শব্দ···**When I was in your arms**···

ব্যাঞ্জোর মিঠে টুং-টাং শব্দ ভেসে আসে অনেক স্মৃতির ওপার থেকে।···

······সেদিনও এমনিতরো এক সন্ধ্যা।

বেগম বাহার লেনের পেণ্ডেলবারি ম্যানশানস্‌এর একতলায় একটি ছোটো কুঠুরিতে থাকতো চার্লি নেলসন। চাকরি করতো ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের একটি রেডিওর দোকানে।

সন্ধ্যেবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছিলো নিজের মনে। ভুলে থাকতে চাইছিলো যে তার পকেটে আট আনার বেশী পয়সা নেই, মাস কাবার হতে আরো দুদিন বাকী।

ক্ষিধে পেলো শেষ পর্যন্ত। ব্যাঞ্জো রেখে দিলো এক পাশে। ডীল-উডের টেবিলে একটি সস্তা টাইমপীস। তা'তে তখন ন'টা বেজে সতেরো।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো চার্লি নেলসন।

ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের দোকানে দুটো পরটা আর একটুখানি মাংস—ছ'আনা, মনে মনে হিসেব করলো চার্লি। দুআনা থাকবে। কাল ?······ সে কাল দেখা যাবে। আজকের রাতটা তো খেয়ে বাঁচি।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এসে দেখে, সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। ময়লা রং, গায়ে সাদা লংক্লথের জামা, পরনে সস্তা ছিটের স্কার্ট। বেশ টানা চোখ, মাথার কোঁকড়া চুল কাঁধের দুপাশে ঢেউ খেলে পড়েছে।

দেখে চার্লির ভালোই লাগলো, কিন্তু খুব বিমুগ্ধ হবার মতো মন তার নেই। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। দেরী হলে পরটা-মাংস পাওয়া না'ও যেতে পারে। আজকাল সবাই যেন ওয়েলেস্‌লির পরটা-মাংস দিয়ে সাপার সারছে।

দু'পা এগুলো চার্লি নেলসন।

"শোনো !"

মিষ্টি গলা টুং-টাং করে উঠলো চার্লি নেলসনের ব্যাঞ্জোর মতো।

চার্লি ফিরে দাঁড়ালো।

"ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছিলে তুমি?" মিষ্টি গলাটি জিজ্ঞেস করলো।

চার্লি ঘাড় নাড়লো।

"তুমি তো বেশ বাজাও!—ও ঘরে থাকো বুঝি? আমরা এখানে নতুন এসেছি। তেতলায়, স্যুইট্ নাম্বার সেভেন্‌টীন্। আমার নাম বেরিল —বেরিল ও'হারা।"

হ্যাঁ, বুড়ি জনসনের কাছে চার্লি শুনেছিলো বটে তেতলার খালি ঘরটিতে কোন এক জিম্ ও বার্থা ও'হারা এসেছে। বেরিল তা হলে তাদেরই মেয়ে। মিসেস জনসন বলছিলো ও'হারারা নাকি ভীষণ ঝগড়াটে। সেদিনও রোজ-মারীকে ধরে খুব গালাগাল দিয়েছে রাত দশটায় গ্রামোফোন চালাচ্ছিলো বলে।

"আমার নাম চার্লস্," চার্লি বললো, "চার্লস্ নেলসন।"

"কাল আমার জন্মদিন। আমার দু'চারজন বন্ধুকে আসতে বলেছি। একটুখানি নাচ হবে, দু'চারটি ক্যাবারে আইটেম্স্, চা আর স্যাণ্ডউইচ্ আর যথেষ্ট ফান্। তোমার খুব ভালো লাগবে। আসবে? তুমি আমাদের ব্যাঞ্জো বাজিয়ে শোনালে খুব খুশী হবো।"

একটু ইতস্তত করে চার্লি বললো, "ওয়েল, তুমি যদি চাও··· "

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি চাই যে তুমি আসো। কোথায় যাচ্ছো এত রাত্তিরে?"

"এই, রাস্তায় একটুখানি পায়চারি করতে। ঘরে বড্ড গুমোট।—"

"হ্যাঁ, আজ খুব গরম। কলকাতার আবহাওয়া আমার ভালো লাগে না। আমরা আগে ছিলাম নৈনিতাল। কী লাভ্‌লি ওয়েদার, জাস্ট লাইক্ হোম্। তুমি হোম্‌এ গেছ কখনো?"

"হোম্?" চার্লি একটু অবাক হয়ে তাকালো।

"মানে ইউ-কে। গেছ কখনো?"

"না।"

"আমিও যাই নি। তবে আমার বাবা অনেকদিন ওখানে ছিলেন। চমৎকার জায়গা! তার তুলনায় কলকাতাটা নরক। বাবা রিটায়ার করলে পরে আমরা সবাই চলে যাবো। দেখ, জীবনে যদি কিছু করতে চাও, বাইরে চলে যাও,—লণ্ডনে যাও, স্টেট্‌স্‌এ যাও, সাউথ আফ্রিকায় যাও, অস্ট্রেলিয়ায় যাও, যেখানে খুশী যাও। এখানে থেকো না। ক্যালকাটা ইজ এ ডার্টি প্লেস্‌। এখানে কিছু করতে পারবে না। চলো বেরুই। এখানে বড্ড গরম। তুমি কি কিছু মনে করবে আমি যদি তোমার সঙ্গে আসি?"

চার্লি কিছুতেই বলতে পারলো না সে তার নৈশ ভোজন কিনতে যাচ্ছে ওয়েলেস্‌লিতে। নিরুপায় হয়ে বেরুলো বেরিল্‌এর সঙ্গে।

বাইরে বেরিয়ে বেরিল বললো, "কী সুন্দর জ্যোৎস্না— !"

জোৎস্নার দিকে তাকিয়ে তখনকার মতো ক্ষিধে ভুলে গেল চার্লি নেলসন।

……সেদিন ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে অন্ধ চার্লি শুনলো, কে যেন আরেকজনকে আস্তে আস্তে বলছে,—আমায় তুমি ভালোবাসো, ডার্লিং?

—আঃ এই ভিড়ের মধ্যে কেন?

—ভিড়ের মধ্যেই যে কেউ কারো কথায় কান দেয় না।

—চলো, রাস্তা পেরিয়ে কোথাও গিয়ে বসি।

—যাচ্ছি, কিন্তু বলো, ডু য়্ লাভ মী?

—তুমি যেন আর জানো না। কিন্তু তার আগে একটি আরো ভালো চাকরি খুঁজে নাও। তোমার এ চাকরির আয়ে তো তোমার আর আমার চলবে না!"

—কেন চাকরি তো তুমিও করছো, ঈভা!

—ও টাকা বাবাকে আর মা'কে দিতে হবে না? ওঁরা বুড়ো হয়েছেন ওদের আর কে দেখবে, অরুণ?"

কথাগুলো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল জনতার কোলাহলে। ব্যাঞ্জোর উপর আঙুলের অক্লান্ত বর্ষণে সুরের ঝড় তুললো চার্লি নেলসন।

আর হাসলো নিজের মনে। কিছুই তো বদলায়নি আজো।

সেদিনও ছিলো এমনিতরো সমস্যা।······

······"য়্ লাভ মী ডার্লিং,?" চার্লি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো বেরিলকে।

একটু চুপ করে থেকে বেরিল হেসেছিলো। চিকচিক করে উঠেছিলো তার চোখ।

"তুমি যেন আর জানো না! কিন্তু তোমার ওই রেডিওর দোকানের চাকরিতে আমাদের দুজনের তো চলবে না। ডিকসন বলছিলো কাস্টম্‌স্‌এ লোক নিচ্ছে। চেষ্টা করে দেখ না।"

"সে না হয় দেখলাম। কিন্তু এখন বিয়ে করতে ক্ষতি কি? চাকরি তো তুমিও করছো—।"

"এ টাকা যে দিতে হবে বাবাকে আর মা'কে—।"

······খুটখুট উঁচু হীলের শব্দ। কাছে আসতেই ল্যাভেণ্ডারের মৃদু গন্ধ। তেমনিতরো সৌরভ ছিলো বেরিলেরও, আজো মনে পড়ে মন দুলিয়ে।

কিছু খুচরো পয়সা এলো হাতের মুঠোয়।

"······থ্যাঙ্ক্যু ম্যা'ম্···।"

ভেসে চলে গেল ল্যাভেণ্ডারের সৌরভ।

টুং টাং ব্যাঞ্জো বাজিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে চললো চার্লি নেলসন।

—আজ রাত্তিরে নাচে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—ওরা সবাই আসছে?

—সব্বাই আসছে। বেট্‌সি আসছে, পামেলা আসছে, জো আসছে, নর্ম্যান আসছে! মুন্না খোশলা নিয়ে আসছে লোলা মুখার্জিকে। সুনীল গুপ্টা আসছে মিস আহ্‌মেদকে নিয়ে। বারুচা আমায় পিক্ আপ্ করে নেবে বলেছে।······

……চৌরঙ্গির কতো কথা এপাশ ওপাশ থেকে ভেসে আসে চার্লির কানে। সে শুনে যায় আর ব্যাঞ্জো বাজায়।

কী সুন্দর নাচতে পারতো বেরিল ও'হারা। তার সঙ্গে প্র্যাকটিস করে নিখুঁত হয়ে গিয়েছিলো চার্লির নাচও।

লোয়ার সার্কুলার রোডে ছিলো সিলভার মুন ক্লাব। এখন আর নেই, উঠে গেছে।

সেখানে বেরিল আর চার্লি গিয়েছিলো একদিন শনিবার সন্ধ্যায়।

স্লো-ফক্সট্রটের পর ওয়ল্‌জ্‌, ওয়ল্‌জ্‌-এর পর ট্যাঙ্গো। ট্যাঙ্গো চার্লির জানা নেই। নিজেদের চেয়ারে ফিরে এসে ওরা চুপচাপ বসে গল্প করতে লাগলো।

এমন সময় এলো জ্যাকি ব্রাউন।

জ্যাকি ব্রাউন স্কুলে পড়তো চার্লির সঙ্গে। চার্লি কবে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। জ্যাকি সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পাশ করে একটি ইউরোপীয়ান ফার্মে ঢুকেছে। মাইনে পায় ভালো, ওর মা'ও চাকরি করে। সংসারে শুধু দু'জন। থাকে, খায় দায় ভালোই। জ্যাকির পোশাকে, কথাবার্তায়, ব্যবহারে বেশ এক সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রকাশ। কালো প্যান্ট, সাদা জ্যাকেট, কালো বো৩ আর কালো শু পরে সামনে এসে দাঁড়াতে, সাদা জিনের কোট প্যান্ট আর সস্তা আর্ট-সিল্কের টাই-পরা চার্লি কুণ্ঠিত হয়ে পড়লো।

জ্যাকির সঙ্গে বেরিলের আলাপ করিয়ে দিলো চার্লি। জ্যাকি বেরিলকে নিয়ে ফ্লোর্‌এ নামলো।

জ্যাকির সঙ্গে চার্লির অবস্থার তারতম্য থাকলেও এমনি ওরা খুব বন্ধু। চার্লি প্রায়ই যেতো জ্যাকি ব্রাউনের কাছে। প্রয়োজনের সময় টাকা ধার ওরই কাছে পাওয়া যায়।

জ্যাকির মা মিসেস ব্রাউনও খুব পছন্দ করতো চার্লিকে।

অবশ্যি সব সময় জ্যাকির কাছে তার টাকা ধার চাওয়াটা পছন্দ করতো না। বলতো, "খাটো, শুধু খাটো, খেটে টাকা কামাও, তারপর জীবনটা

উপভোগ করো। টাকা না কামালে জীবন উপভোগ করবার অধিকার নেই। এই তো আমায় দেখ না!"

সত্যি খুব খাটতো মিসেস ব্রাউন। কোন একটি মার্চেণ্ট অফিসের স্টেনো। মিস্টার ব্রাউন যখন মারা যায়, জ্যাকি তখন খুব ছোটো। সেই তখন থেকে নিজে খেটে আয় করে জ্যাকিকে বড়ো করেছে, পড়িয়েছে, নিজের সায়েবকে ধরে আরেকটি ফার্মে ভালো কাজ পাইয়ে দিয়েছে জ্যাকিকে। জ্যাকি চার্লির সমবয়েসী, একুশ-বাইশ বছর হবে। মিসেস ব্রাউনের বয়েস বেয়াল্লিশ কি তেতাল্লিশ, এখনো বেশ মজবুত গড়ন, প্রসাধনের গুণে আরো একটু কম দেখায়।

ছেলেকে নিয়ে মিসেস ব্রাউনের খুব গর্ব। জ্যাকি এরই মধ্যে সায়েবের ডান হাত হয়ে উঠেছে। ছেলে যেদিন কভেনেণ্টেড্ পোস্ট পাবে, মিসেস ব্রাউন সেদিন চাকরি ছেড়ে দেবে। ছেলে তদ্দিনে কারো কাছে বাগদত্ত হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। ছেলে কিছু টাকা জমিয়েছে, মিসেস ব্রাউন নিজেও কিছু জমিয়েছে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে টাকা দিয়ে কোথাও একটি নিরিবিলি টি-রুম খুলবে, জীবনের বাকী কয়টা দিন বেশ কেটে যাবে। চাকরি করতে আর ভালো লাগে না। অফিসে এত কাজের চাপ! এক এক সময় মনে হয় টাইপ করতে করতে আঙুলে পক্ষাঘাত হবে।

ছেলে যাকে বিয়ে করবে করুক। তবে মেয়েটি ভালো হতে হবে, সে যেন আপ্-স্টার্ট না হয়। অবশ্যি ভালো ঘরের মেয়ে হতে হবে নিশ্চয়ই, তৃতীয় শ্রেণীর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হলে চলবে না। জ্যাকির ঠাকুর্দা খাঁটি ইংরেজ ছিলেন। মিসেস ব্রাউনের নিজের ঠাকুর্দার মা ছিলেন ফ্রেঞ্চ। জ্যাকির কী সুন্দর রং ছাখো! কী সুন্দর সোনালী চুল! ওর ইংরেজি শুনেছো? আর দশটা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মতো নয়। না ব'লে দিলে কে বুঝবে সে খাঁটি ইংরেজ নয়? ওর সায়েব বলেছে ওকে আগামী বছরই কভেনেণ্টেড্ পোস্ট্ দেওয়া হবে। এক বার কভেনেণ্টেড্ পোস্ট

পেলে তাকে কে ঠেকায়? জ্যাকি যে রকম স্মার্ট ছেলে, সে নিশ্চয়ই একদিন ওদের কোম্পানির ডিরেক্টার হয়ে যাবে। ওরা নিশ্চয়ই ওকে ওদের লণ্ডন-অফিসে ট্রান্সফার করবে। জ্যাকি, তোমার পুওর মামিকে নিশ্চয়ই তখন ভুলে যাবে না, ভুলবে না সত্যি? না, না, আমাদের জ্যাকি আমাকেও হোম্‌এ নিয়ে যাবে। জানো চার্লি, বার্মিংহ্যামে আমার কয়েকজন কাজিন্ আছে, ওরা প্রায়ই চিঠি লেখে, বলে, তোমরা আসো না কেন? চলে এসো এখানে। এখানে জ্যাকির জন্যে বিরাট ভবিষ্যত খোলা পড়ে রয়েছে। ইণ্ডিয়ায় বসে থেকে কী হবে? জ্যাকি, তোমার আঙ্কল্ বিল্ ম্যানচেস্টার থেকে ফিরে এসে তোমায় যে চিঠিখানি লিখেছেন, তার উত্তর দিয়েছো? আজই দিয়ে দিও কিন্তু। তারপর চার্লি! তুমি কোথাও কোনো সুবিধে করে উঠতে পারলে, না কি সেই রেডিওর দোকানেই এখনো আছো? ডোন্'ছ্যু'ওয়ারি, আমি টী-রুম করলে তোমায় ক্যাশিয়ার করে রাখবো। সবাই কি আর জ্যাকির মতো পারে? ও যদি ওখানে ইউ-কে'তে জন্মাতো এদ্দিনে ক্যাবিনেটে যেতে পারতো, আমি খুবই নিশ্চিত।

এমনি করে সব সময় জ্যাকির গল্প। জ্যাকি কতো ব্রিলিয়াণ্ট্, জ্যাকি কতো ইণ্টালিজেণ্ট্, জ্যাকি কতো ভালো, জ্যাকি এটা, জ্যাকি ওটা, জ্যাকি সেটা!

এই জ্যাকির জন্যে মিসেস ব্রাউন আর বিয়ে করে নি। বার্টি স্মিথের বয়েসও প্রায় চল্লিশ, নিজের একটি মোটর-গ্যারাজ আছে। পয়সাকড়ি আছে বলেই লোকে জানে। পাপা ব্রাউন মারা যাওয়ার পর থেকেই মামা ব্রাউনের পেছনে লেগে পড়ে আছে তাকে বিয়ে করবার জন্যে। মিসেস ব্রাউনও খুব পছন্দ করেন তাকে। কিন্তু জ্যাকির মুখ চেয়ে তাকে বিয়ে করে নি। আর বার্টি স্মিথও সেই দুঃখে অন্য কাউকে বিয়ে করেনি। এখনো যাওয়া আসা করে ব্রাউনদের বাড়িতে। এমনি মিসেস ব্রাউনের খুব বন্ধু। জ্যাকিকেও খুব ভালোবাসে। চার্লির সঙ্গেও আলাপ আছে।

মিসেস ব্রাউন বার্টি স্মিথকে মাঝে মাঝে বলে চার্লির কথা। "ওর একটা ব্যবস্থা করে দাও বার্টি! রেডিওর দোকানে ও যা পায়, তাতে ওর একলারই চলে না। ওকেও নিজের জন্যে একটি মেয়ে খুঁজে নিতে হবে তো!"

বছর খানেক ধরে বার্টি স্মিথ নিয়মিত আশ্বাস দিয়ে আসছে চার্লিকে।—খোঁজে আছি, সুবিধে হলেই তোমায় ভেতরে ঠেলে দেবো কোথাও।

বেরিলের সঙ্গে কয়েকদিন দেখা নেই। ওর অফিসে নাকি ভীষণ কাজের চাপ পড়েছে। রাত করে বাড়ি ফিরে আর বেরুতে চায় না।

সেদিন চার্লি গিয়েছিলো ব্রাউনদের বাড়ি, জ্যাকির কাছে কিছু টাকা ধার করতে। জ্যাকির সঙ্গে দেখা হোলো না। মিসেস ব্রাউন ওকে বসিয়ে এক কাপ কফি করে দিলো।

"একটা ভালো খবর শুনেছো চার্লি? জ্যাকি বলেনি তোমায়? জ্যাকির অফিস ওকে লণ্ডনে পাঠাচ্ছে। ওখানে একটা ট্রেনিং নিয়ে ছ'মাস পর ফিরে আসবে।"

শুনে চার্লি খুব খুশী হোলো।

"আরো একটি খবর আছে। অনেক বেশী ভালো খবর। জ্যাকি এন্‌গেজ্‌ড্‌ হয়েছে।"

"তাই নাকি? কার সঙ্গে?"

"তুমি বোধ হয় ওকে চেনো। মেয়েটির নাম বেরিল ও'হারা। তোমাদের বেগম বাহার লেনে থাকে। বেশ মেয়েটি। আই লাইক্ হার্ ইমেন্স্‌লি।"

সেদিন সূর্যাস্তের অনেক আগেই মাঝরাত্তির নামলো চার্লি নেলসনের মনে।

বাড়ি ফিরে এসে ব্যাঞ্জো বাজাতে সুরু করলো।

সেই সুর সে আজো বাজিয়ে চলেছে।.........

বেরিল দেখা করতে এসেছিল চার্লির সঙ্গে।

"আই এ্যাম সরি চার্লি,—কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝছো। তুমি আমার বন্ধু, আমি তোমায় খুব পছন্দ করি, কিন্তু জ্যাকির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি জানতাম না ভালোবাসা কি। তুমি খুব ভালো। কিন্তু জ্যাকি? হি ইজ সিম্প্লি ওয়াণ্ডারফুল……!"

চার্লি ব্যাঞ্জো বাজাতে বাজাতে বললো, "বেরিল, একটি নতুন গান শিখেছি, শোনো, তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে—"

কিছুক্ষণ শুনে উঠে চলে গেল বেরিল ও'হারা।

সেদিন সূর্যগ্রহণ।

পরিষ্কার আকাশ। তারপর আস্তে আস্তে চাঁদের ছায়া গ্রাস করতে লাগলো সূর্যকে। জানলায় বসে খালি চোখে তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো চার্লি নেলসন। ভাবলো, আমার জীবনের সঙ্গে কী আশ্চর্য মিল!

সেদিন দুপুর থেকে তার মাথাটা টনটন করতে লাগলো। জ্যাকি হলে নিশ্চয়ই বেরিল এসে মাথা টিপে দিতো, চার্লি ভাবলো।

তারপরদিন চারদিক ঝাপসা।

বিকেল বেলা কাজ থেকে ফেরার পথে একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চার্লি থমকে দাঁড়ালো।

"সরি।"

"আরে, চার্লি? কী হোলো তোমার?"—মিসেস ব্রাউনের গলা।

"চোখে কিছু দেখতে পারছি না।"

মিসেস ব্রাউন চোখটা দেখলো। বললো, "কিছু একটা হয়েছে। গো এ্যাণ্ড্ সী এ ডক্টার। হ্যাঁ, জানো, জ্যাকি আগামী কাল লণ্ডন রওনা হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই ওকে গুড্‌বাই জানাতে আসছো?"

"বেরিল যাচ্ছে না?"

"না। জ্যাকি ফিরে এলে পরে ওদের বিয়ে হবে।"

চার্লি কিন্তু গেল না জ্যাকির সঙ্গে দেখা করতে। দু'চারদিন পর গিয়ে

মিসেস ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করলো। বললো, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিসেস ব্রাউন, আমার খুব জ্বর হয়েছিল। জ্যাকির সঙ্গে দেখা হোলো না। যাক, মাস ছয়েকের মধ্যেই তো ফিরে আসছে।"

"তোমার চোখ কি রকম আছে, চার্লি?"

"ভালো নয়। ডাক্তার বলছে চশমা নিতে হবে।"

চার্লি নেলসন বাড়ি থেকে বেশী বেরুনো বন্ধ করলো। সন্ধ্যেগুলো বাড়ি বসেই কাটাতো। একলা বসে ব্যাঞ্জো বাজাতো নিজের মনে।

মাস খানেক পর একদিন বেড়াতে গেল মিসেস ব্রাউনের বাড়ি।

ঘরে ঢুকেই সে অবাক।

ইজি চেয়ারে বসে চোখে রুমাল চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মিসেস ব্রাউন। আর পাশে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছে বার্টি স্মিথ্।

চার্লি চলে যাচ্ছিলো। মিসেস ব্রাউন তাকে বসতে বললো।

একটু পরে বার্টি স্মিথ উঠে চলে গেল।

ব্যাপারটা চার্লি শুনলো মিসেস ব্রাউনের মুখে।

জ্যাকি বিলেতে একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করছে। চিঠি লিখেছে, সে আর ফিরবে না।

"সে যদি সুখী হয় হোক," মিসেস ব্রাউন আস্তে আস্তে বললো, "কিন্তু আমার দেখাশোনা করবার জন্যে কেউ আর রইলো না। বার্টি স্মিথ বলছে এখনো সে আমায় বিয়ে করতে রাজী। লোকটি এত ভালো। মনে হচ্ছে ওকে বিয়ে করে ফেললেই হয়।"

চার্লি চুপ করে রইলো।

"আর বেরিলের দুঃখটাও ভেবে দেখ! পুওর ডার্লিং! আচ্ছা, ওকে একবার নিয়ে আসতে পারবে আমার কাছে? বোলো, আমি বলেছি।"

বেরিলের সঙ্গে চার্লির দেখা হোলো সেদিনই সন্ধ্যেবেলা।

আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে।

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বললো না।

তারপর চার্লি আস্তে আস্তে বললো, "বেরিল, অনেকদিন আগে এক চাঁদনী রাতে আমায় একটি কথা বলেছিলো, মনে আছে?"

"চার্লি," বেরিল উত্তর দিলো, "জ্যাকিকে আমি ভুলতে পারবো না কোনোদিন।"

"সে যা করেছে এর পরও?"

বেরিল চুপ করে রইলো প্রথমটা। তারপর বললো, "চার্লি, তুমি আমার খুব ভালো বন্ধু। তোমার সঙ্গে আমার অনেক ভালো সময় কেটেছে। এসব কথা বলে আমায় আর কষ্ট দিও না।"

চার্লি আর কোনো কথা বললো না।

বেরিল আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "চার্লি, বলতে পারো, যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন?"

"আমারও একই প্রশ্ন, বেরিল।"

বেরিল একটু হাসলো। "তুমি কি এখনো আমায় চাও, চার্লি?"

"খুব।—ভীষণ ভাবে।"

"সব জেনেশুনেও?"

"তোমার তো কোনো দোষ নেই বেরিল।"

চার্লির কাঁধে হাত রেখে বেরিল বললো, "চার্লি, কিছুদিন যেতে দাও। লেট্ মি গেট্ ওভার ইট্। আমি এখন আর কিছু ভাবতে পারছি না। এখন বাড়ি যাও। রাত হয়ে আসছে।"

"মে আই কিস্ ইউ গুড-নাইট," চার্লি জিজ্ঞেস করলো।

"ওয়েল্, তুমি যদি খুবই চাও, তা'হলে..."

তারপরদিন সন্ধ্যেবেলা চার্লির সঙ্গে বেরিলও গেল মিসেস ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করতে। বার্টি স্মিথ্ও সেখানে ছিলো সান্ধ্য পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে।

বেরিলের শুকনো মুখ দেখে মিসেস ব্রাউন বললো, "একটুতেই এত মুষড়ে পড়ছো কেন বেরিল? তুমি কি ভেবেছো জ্যাকি ওই ইংরেজ মেয়েটিকে নিয়ে ঘর করতে পারবে? দেখো, ঠিক দু'দিন পরে ওকে ডিভোর্স করে আমার জ্যাকি আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি ওর মা, আমি ওকে চিনি না? নাও, বাড়িতে মুখ শুকনো করে পড়ে থেকো না। আজ অর্ডস্ন্যান্স ক্লাবে নাচ হচ্ছে। যাবে সেখানে?"

বেরিল চার্লির দিকে তাকালো।

তখন মাসের শেষ। চার্লির পকেটের অবস্থা খুব সঙ্গীন। তবু বললো "হ্যাঁ, চলো না যাই। কিন্তু আমি তো ওখানকার মেম্বার নই। ঢুকবো কি ক'রে? হ্যাঁ, নর্ম্যান ওখানকার মেম্বার। দেখি সে যদি রাজী হয় টু সাইন্ আস্ ইন্।"

"না, না, তুমি থাকো আমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। বেরিল, তুমি বার্টির সঙ্গেই যাও। সে ওখানকার মেম্বার। ও এসেছে আমায় নিয়ে যেতে। কিন্তু আমার এমন মাথা ধরেছে—।"

বার্টি আর বেরিল চলে যেতে মিসেস ব্রাউন চার্লিকে বললো, "তোমায় যেতে দিলাম না কেন জানো? এখন মাসের শেষ, তোমার অবস্থা যে ভালো নয় তা'তো জানি। আর আমি চাই না যে তুমি বার্টির সঙ্গে যাও আর সে পয়সা খরচা করুক। আরেকটা কথা কি জানো, আমি চাই না যে বেরিল তোমার সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ হোক। আমি ঠিক জানি, কয়েক মাস পর জ্যাকি ফিরে আসবেই। তখন দেখে নিও ও এসে ঠিক বেরিলকে বিয়ে করবে। তুমি ভেবো না চার্লি। আমি তোমায় একটি ভালো মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আরেকটি ভালো খবর আছে। আগামী মাসে বার্টি স্মিথের সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে। আমি একটি ছোটো পার্টি দেবো। তুমি নিশ্চয়ই আসবে। তোমার চোখ কি রকম আছে চার্লি? চশমাটা কতো পড়লো? ও ডিয়ার, কী পুরু লেন্স্!"

বাড়ি ফিরে এসে চার্লি নেলসন ব্যাঞ্জোটি পেড়ে নিয়ে বাজাতে বসলো।

……বাজাতে বাজাতে একদিন দেখলো চোখে আর দেখছে না।

বুড়ি জন্‌সন্‌কে ডাকলো। সে বাড়ি নেই।

ভাবলো, আজকের দিনটা যাক। কাল ট্যাক্সি ডেকে হাসপাতালে যেতে হবে। মোড়ের ডাক্তারটি কোনো কাজের নয়।

আবার ব্যাঞ্জো বাজাতে বসলো সে।

অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তখনো তার মাথায় আসে নি। ভেবেছিলো এ কোনো সাময়িক ব্যাপার। ওষুধ দিলে সেরে যাবে।

বাজাতে বাজাতে মনে হোলো কে যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"কে?"

"দেখতে পাচ্ছো না?" মিসেস ব্রাউনের গলা শোনা গেল।

"কেন? চোখে কী হয়েছে?"

"কিছুই দেখতে পারছি না। কাল একবার হাসপাতালে যাবো ভাবছি।"

মিসেস ব্রাউন চার্লির খোলা চোখের সামনে একবার হাতের পাতা নাড়লো। দেশলাই জ্বালিয়ে জ্বলন্ত কাঠি নিয়ে গেল চোখের কাছে।

চোখের তারায় কোনো চঞ্চলতা নেই।

"ও ডিয়ার, ডিয়ার," বলে সামনের টুলটিতে বসে পড়লো মিসেস ব্রাউন।

চার্লি তখনো কিছু ভালো করে বোঝেনি।

জিজ্ঞেস করলো, "কী হয়েছে?"

মিসেস ব্রাউন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর নিজের যে কথা বলতে এসেছিলো সে কথা বললো।

বললো, "বেরিল ও'হারা বার্টি স্মিথ্‌কে বিয়ে করেছে।"

চার্লি নিথর হয়ে বসে রইলো দু'মিনিট।

তারপর ব্যাঞ্জোটা তুলে নিয়ে টুং টাং করতে লাগলো নিজের মনে।

"ওর মধ্যে বেরিল কী যে পেলো কে জানে?" ভারী গলায় বলে চললো মিসেস ব্রাউন, "বার্টির বয়েস চল্লিশের ওপর, বেরিলের এখনো কুড়ি হয়নি—।"

চার্লি বাজিয়ে চললো নিজের মনে।

"বার্টিকে যে আমি এত ভালোবাসি এতদিন জানতাম না। আগে যখন সে আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলো তখন বিয়ে করে ফেললেই হোতো। ...আচ্ছা, চার্লি, বলতে পারো, যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন?"

চার্লির মুখে মৃদু হাসি। সে নিজে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নি একজনকে, নিজেও কারো কাছ্ থেকে এর উত্তর পায়নি।

হাসপাতাল থেকে জানা গেল চার্লির চোখ আর সারবে না। সেই যে সূর্যগ্রহণের দিকে খালি চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলো সেদিন, তাইতে চোখটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে গেছে।

চার্লি গুম হয়ে বসে রইলো অনেকক্ষণ। ভাবলো, এ ধাক্কা সামলাই কী করে? খাওয়াপরাই বা জুটবে কোত্থেকে?

ব্যাঞ্জো বাজাতে বাজাতে দেখলো কেমন যেন খুব সহজ মনে হচ্ছে এ দুঃখকে। এর আগে যে দুঃখ পেয়েছে তাতে তো পাথর হয়ে গেছে তার মন। এখন যেন মনে হচ্ছে, তার চোখ থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি।

মিসেস ব্রাউন শুনতে পেয়ে ছুটে এলো। বললো, "চলো আমার বাড়ি।"

"সে কী করে হয়, মিসেস ব্রাউন?"

"চার্লি, আমায় দেখবার তো আর কেউ নেই, জ্যাকিও নেই, বার্টিও নেই—।"

"কিন্তু কাউকে দেখবার মতো চোখ তো আমার নেই মিসেস ব্রাউন—!"

"কী আসে যায় তাতে! আমার টী-রুমের আইডিয়া আমি এখনো ছাড়িনি, চার্লি। তোমায় সেখানে রাখবো ব্যাঞ্জো বাজাতে। এত সুন্দর ব্যাঞ্জো বাজাও তুমি! আর পিয়ানোটা যদি শিখে নিতে পারো, আরো ভালো হয়—।"

মিসেস ব্রাউনের বাড়িতেই আস্তানা গাড়লো চার্লি নেলসন।

মিসেস ব্রাউন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যেবেলা বসে রান্না করে। খেয়ে উঠে আমেরিকান ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টায়। চার্লি নেলসন ব্যাঞ্জো বাজায় জানলার পাশে বসে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা একটু ক্ষীণ গন্ধ নাকে এলো।

তারপর মিসেস ব্রাউনের কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারলো। মদ ধরেছে মিসেস ব্রাউন, খুব বেশী রকম খেয়েছে।

চার্লি জিজ্ঞেস করলো।

"কেন খাবো না," তেড়ে উঠলো মিসেস ব্রাউন। "আমার কে আছে? জ্যাকি নেই, বার্টি নেই—। আজ জ্যাকি কি লিখেছে জানো? সে আর ইণ্ডিয়ায় ফিরবে না। সে ইউ-কে'র সিটিজেনশিপ্ নেওয়ার চেষ্টা করছে।"

অনেকক্ষণ অনর্গল আজে বাজে বকলো মিসেস ব্রাউন। তারপর চার্লির কাছে এসে দাঁড়ালো। হাত রাখলো ওর কাঁধে।

"চার্লি!"

"য়েস্, মিসেস ব্রাউন!

"মাথায় একটা মতলব এসেছে।"

"কী?"

হাসতে লাগলো মিসেস ব্রাউন, মাতাল মেয়েছেলের উদ্ধত উন্মত্ত হাসি!

"ইট্ উড্ বি গ্রেট্ ফান্, চার্লি। তুমি চাইলে বেরিলকে, জ্যাকি তাকে নিয়ে চলে গেল। আমি চাইলাম বার্টিকে, বেরিল তাকে নিয়ে চলে গেল। পড়ে রইলাম তুমি আর আমি। হাঃ, হাঃ,—হিঃ হিঃ হিঃ— বার্টি যদি শোনে যে আমি খুব ড্রিঙ্ক্ করি, আমি বিয়ে করেছি তোমাকে, সে কি ভাববে বলো তো? হুঃ হুঃ হুঃ—" ঘোড়ার মতো হাসতে লাগলো মিসেস ব্রাউন।

"আই এ্যাম গোইং। আমি চললাম। এখানে আর নয়—," বললো শঙ্কিত চার্লি। উঠে পড়লো সে। দু'পা গিয়েই উল্টে পড়লো একটি চেয়ারে হোঁচট

খেয়ে। তার মনেই ছিলো না যে সে অন্ধ। ভেবেছিলো বুঝি বসে আছে গুমোট অন্ধকারে। তাই ছুটে যাচ্ছিলো বাইরের আলোর দিকে।

শুনলো মিসেস ব্রাউন হাসছে, পাগলের মতো হাসছে।

চেয়ারটা ধরে ধরে চার্লি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

ক্ষীণ হয়ে এলো মিসেস ব্রাউনের হাসি।

চার্লি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর অনুভব করলো নিথর নিশুতি হয়ে আছে চারদিক।

কানে এলো গভীর নাক-ডাকার শব্দ।

কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে মিসেস ব্রাউন।

তারপরদিন মিসেস ব্রাউন অফিসে চলে যাওয়ার পর চার্লি ঘর থেকে বেরুবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখে, তার ঘরটা বাইরে থেকে তালাবন্ধ।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো সে। এই প্রথম অনুভব করলো দৃষ্টি হারিয়ে ফেলার কষ্ট।

মিসেস ব্রাউন ফিরলো রাত করে। মুখ ভরে মদের গন্ধ।

বললো, "পালাবার চেষ্টা করেছিলে না? আমি জানতাম। তোমার জন্যে কি এনেছি জানো? এই দেখ। না, না, কি করে দেখবে, তুমি তো অন্ধ। শোনো।"

হাওয়ায় সাঁই করে একটা আওয়াজ হোলো।

শিউরে উঠলো চার্লি। মিশন স্কুলে অত্যাচারী মাষ্টারদের হাতে এরকম সরু বেতের আস্বাদ সে পেয়েছে বহুবার।

সেই উন্মাদ মিসেস ব্রাউনকে একদিন শয্যা গ্রহণ করতে হোলো। এত মদ খেয়েছে মাস তিন চার ধরে, আর ঘরে বাইরে এত অত্যাচার করেছে শরীরের উপর যে উঠে দাঁড়াবার শক্তি আর নেই।

চার্লি চোখে দেখতে পেলো না বটে, কিন্তু একটি গন্ধ ভেসে এলো তার

নাকে। এমনিতরো একটি গন্ধ তার নাকে ভেসে এসেছিলো বহুদিন আগে, সেই ছেলেবেলায়, যখন তার মায়ের কফিনের পেছন পেছন সে ঢুকেছিলো লোয়ার সার্কুলার রোডের কবরখানায়।······

শেষ ক'টা দিন চার্লি নেলসন যতোটা সম্ভব পরিচর্যা করলো। রোগীকে পথ্য খাওয়ানোর পয়সা নেই, ওষুধ খাওয়ানোর পয়সা নেই। নিজের খাওয়া জোটেনি দু'দিন।

একদিন চার্লি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো ব্যাঞ্জো নিয়ে। আন্দাজে আন্দাজে পথ ধরে হাঁটতে লাগলো ব্যাঞ্জো বাজাতে বাজাতে। এগিয়ে চললো উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে।

হঠাৎ এক সময় দেখে, কে যেন হাতে একটি একআনি গুঁজে দিয়েছে।

এতো মন্দ নয়, চার্লি ভাবলো।

এগিয়ে চললো সে।

পরে যখন বাড়ি ফিরলো তখন পকেটে পোনেরো আনার মতো খুচরো।

সেই স্বরু হোলো।

শেষের ক'টা দিন ওষুধ পথ্য এক আধটু খাইয়েছিলো মিসেস ব্রাউনকে। কিন্তু মিসেস ব্রাউন আর বাঁচলো না।

চার্লি খবর দিতে চেয়েছিলো বার্টি স্মিথকে। জ্যাকিকেও খবর দিতে চেয়েছিলো।

কিন্তু মিসেস ব্রাউনের অভিমান শেষ মুহূর্তেও গেল না। কারো কাছে খবর দিতে রাজী হোলো না সে।

শুধু বললো, "আমি মারা যাওয়ার পর জ্যাকিকে জানিও—চিঠি লিখিয়ে নিও কাউকে দিয়ে—জ্যাকি ওর মামিকে ভুলে গেছে কিন্তু মামি সব সময় ওর কথা ভাবতো।

সেদিন থেকে ফুটপাথই চার্লি নেলসনের আশ্রয়।

চৌরঙ্গির মাঝখান দিয়ে উড়ে যায় দ্রুত ট্র্যাফিক, ফুটপাথের উপর দিয়ে

ভেসে যায় নানা জাতের লোকজনের জনতা। মাঝখানে একপাশে আস্তে আস্তে ব্যাঞ্জো বাজায় চার্লি নেলসন।

কখনো কখনো শোনা যায় কাছে এগিয়ে আসছে এক জোড়া হাই-হীলের শব্দ। কাছে এলে ল্যাভেণ্ডারের মৃদু গন্ধ, আর বেরিল ও'হারা কে মনে পড়ে যাওয়া। হাতের মুঠোয় কার যেন ছোঁয়া পড়ে, বেড়ে ওঠে দু'আনি এক আনির ভার।

"…থ্যাঙ্ক্যু ম্যা'ম্……।"

আবার মিলিয়ে যায় ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ।

এমনি করে কাটে দিনের পর দিন।

এ জীবন এ ভাবে আর কদ্দিন, চার্লি নেলসন একদিন ভাবলো, একটু বৈচিত্র্য দাও ভগবান!

সেদিন একটুখানি বৈচিত্র্য এলো তার জীবনে।

লিণ্ড্সে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে সে ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছিলো, হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে তার জামার আস্তিন ধরে টানলো।—

"চার্লি!"

"কে!"—চট্ করে চিনতে পারলো না সে। বহুদিন পর নিজের নাম শুনলো পরের মুখে।

"আমি বার্টি, বার্টি স্মিথ্—।"

"ও, বার্টি? কি রকম আছো?……আমি? আমি কি রকম আছি সে তো দেখতেই পাচ্ছো।……বেরিল কি রকম আছে?"

খুব সহজভাবেই কথা বললো চার্লি নেলসন।

বার্টি চুপ করে রইলো একটুখানি। তারপর বললো, "বেরিল? বেরিল এখানে আর নেই।"

"নেই মানে?"

শুনলো বার্টির কাছে।

মিসেস ব্রাউন ঠিকই চিনতো তার ছেলেকে। জ্যাকি ইংরেজ বৌকে ডিভোর্স করে ফিরে এসেছে। মিসেস ব্রাউনের ভবিষ্যদ্বানী ঠিকই ফলেছে।

আর বার্টি স্মিথের বৌ বেরিল স্মিথ—আগের দিনের সেই মিষ্টি মেয়ে বেরিল ও'হারা—বার্টিকে ছেড়ে চলে গেছে জ্যাকি ব্রাউনের কাছে। কাল ওরা বম্বে চলে যাচ্ছে।

"তোমার কথা বেরিল মাঝে মাঝে বলতো। কোথায় যে তুমি চলে গেলে—।"

চার্লি নেলসন কোনো উত্তর দিলো না।

"চার্লি, তুমি আমার সঙ্গে এসে থাকবে? আমি তোমার দেখাশোনা করবো।"

"না বার্টি, আমি বেশ আছি," চার্লি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বললো।

বার্টি স্মিথ চলে গেল।

চার্লি ব্যাঞ্জো বাজাতে বাজাতে ফিরে চললো ফুটপাথ ধরে।

তারপর কখন যেন জনতার ভেতর থেকে চার্লির কাছে এগিয়ে এলো হাই-হীলের খুটখুট শব্দ। আর সেই ল্যাভেণ্ডারের মৃদু গন্ধ।

চার্লির হাতে এলো আট-আনি একখানি।

"বেরিল," চার্লি খুব নরম গলায় ডাকলো।

কোনো সাড়া নেই।

কখন যেন মিলিয়ে গেল ল্যাভেণ্ডারের ক্ষীণ গন্ধ।

তারপর দিনের পর দিন চার্লির ডাইনে বাঁয়ে উজান ভেসে গেছে ট্র্যাফিক আর জনতা। তেমনিতরো আলো, তেমনিতরো কোলাহল।

শুধু আর কোনোদিন শোনা যায় নি কোনো হাই-হীলের খুটখুট কাছে-এগিয়ে-আসা, আর কোনোদিন পাওয়া যায় নি ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ।

শুধু নিজের মনে টুং-টাং ব্যাঞ্জো বাজিয়ে গেছে চার্লি নেলসন।

কেউ বা ফিরে তাকিয়েছে, কেউ বা তাকায় নি

চৌরঙ্গির উপর যেই মস্তো বড়ো হোটেল, তারই একতলায় সামনের দিকে একটি দরজির দোকান। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছিলো অরুণ বোস আর তার বান্ধবী ঈভা বারওয়েল।

সামনেই ফুটপাথের একপাশে ব্যাগ খুলে পয়সা বার করে অন্ধ চার্লি নেলসনকে পয়সা দিচ্ছিলো একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে।

ঈভাকে দেখে একটু হেসে বললো, "হ্যালো—।"

ঈভা কোনো উত্তর দিলো না। শুধু একটুখানি নিরুপায় ভদ্রতার হাসি হেসে মাথাটা নেড়ে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল অরুণের সঙ্গে।

অরুণের মনে হোলো একে কোথায় যেন দেখেছে। তবে কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

রাত্তিরে ঈভাকে যখন বেগম বাহার লেনে তার হস্টেলে পৌছে দিতে যাচ্ছিলো, তখন পেণ্ডেলবারি ম্যানশানস্‌এর সামনাসামনি আসতেই দেখলো একজন দীর্ঘকায় বিদেশীর সঙ্গে বাহু অর্গলবদ্ধ করে বেরিয়ে আসছে একজন স্ত্রীলোক।

রাস্তার আলো তার মুখের উপর পড়তেই অরুণ চিনলো। চৌরঙ্গিতে দেখা সেই মেয়েটি।

সে হেসে ঈভাকে বললো, "হ্যালো—।"

ঈভাও একটু শুকনো 'হ্যালো' বলে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। মেয়েটিকে সুযোগ দিলো না আর কোনো কথা বলবার।

"এ পাড়াতেই থাকে বুঝি ?" অরুণ জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ। ওই পেণ্ডেলবারি ম্যানশানস্‌এ।"

"মেয়েটি কে ?"

"নিনা। নিনা ক্রিমসন্।"

"তোমার বন্ধু?"

"আমার বন্ধু! ওই মেয়েটা?" ঈভা ভুরু কপালে তুললো, "তুমি জানো অরুণ, আমার বন্ধু খুব বেশী নেই কিন্তু যারা আছে ওরা প্রত্যেকেই খুব ভালো।"

"এ মেয়েটি বুঝি খুব ভালো নয়?"

"আমি জানিনা। হয়তো মেয়েটি ভালো, কিন্তু ওর বন্ধুরা ভালো নয়। তাই আমি ওর সঙ্গে আলাপ জমাতে চাইনা। ও আমার সঙ্গে—শুধু আমার সঙ্গে কেন—এ পাড়ার অনেকের সঙ্গেই ভাব করবার চেষ্টা করে, কিন্তু সবাই ওকে এড়িয়ে চলে।"

ঈভা বারওয়েল অরুণকে নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

নিনা ক্রিমসন একটু হাসলো নিজের মনে।

"কিউট্ ডেম্। হু ইজ্ শী?" জিজ্ঞেস করলো নিনার সঙ্গী।

"ঈভা বারওয়েল। ওই ওয়াই-ডব্লিউ-সি-এ হস্টেল্এ থাকে।"

"আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারো নিশ্চয়ই।"

নিনা হেসে উত্তর দিলো, "আমার মনে হয় না আমি পারি। কারণ আমার সঙ্গেই ভালো আলাপ নেই।"

"আলাপ করে নাও।"

"তাতে কিছু লাভ হবে না। ওর একজন ইণ্ডিয়ান বয়-ফ্রেণ্ড আছে।"

"যাকে সঙ্গে দেখলাম?"

"হ্যাঁ।"

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখা হোলো অলগা আর ফ্রেডি নেসবিটের সঙ্গে।

"হ্যালো, গুড ঈভনিং—।"

"গুড ঈভনিং," বলে ওরাও পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

মলি মার্টিন ফিরছিলো অফিস থেকে। সেও একটু নড করে চলে গেল পাশ কাটিয়ে।

মধুরতর সম্ভাষণ করলো শুধু বুড়ো জ্যাসপার আর বুড়ি মড্। ওরা তখন হাত ধরাধরি করে রাস্তায় পায়চারি করছিলো।

"তুমি এ পাড়ায় খুব জনপ্রিয় বলে মনে হচ্ছে না," বললো নিনার সঙ্গী।

নিনা উত্তর দিলো, "আমি কারো সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা করি না।"

পেণ্ডেলবারি ম্যানশান্স্‌এ ঘর ভাড়া করে নিনা ক্রিমসন যেদিন বেগম-বাহার লেনে উঠে এলো সেদিন কিসের যেন ছুটি ছিলো।

মনে পড়লে এখনো নিনার ঠোঁটের কোণে হাসি ঝিলমিল করে ওঠে।

হ্যারি ক্যামেরন হিক্‌স্‌-কুইন্ কোম্পানির একটি ভ্যান দিয়েছিলো তাকে। নিজের সামান্য যা কিছু আসবাবপত্তর তাইতে চাপিয়ে সে এখানে উঠে এসেছিলো।

আসবাবপত্তর সামান্য—কিন্তু তাই দেখে যেন পেণ্ডেলবারি ম্যানশান্স্‌এর অন্যান্য ভাড়াটেদের চোখে কৌতূহল ফুটে উঠলো। সত্যিই তো, এবাড়িতে ক'জন মেয়ের নিজের ড্রেসিং টেবিল্ আছে, নিজের রেডিও সেট আছে? জুডির নয়, ন্যান্সির নয়, রোজমারীর নয়, জীনের নয়।...এ জানলায় তাদের মুখ দেখেই নিনা বুঝে নিলো ওরা ঠিক সেই শ্রেণীর মেয়ে যারা কেরোসিন কাঠের টেবিলের উপর কাঠের মাউণ্ট্ দাঁড় করিয়ে তা'তে চিনেবাজার থেকে কিনে আনা সস্তা আয়না চাপিয়ে, তার দুপাশে নিজের হাতে বোনা লেস্ ঝুলিয়ে, তারই সামনে টুল কিংবা মোড়ার উপর বসে প্রসাধন সারে। তারপর কালকের ব্লাউসটির উপর পরশুদিনের স্কার্ট্‌খানি সাজিয়ে, কাঁধে প্লাস্টিকের ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে যে যার নিজের কাজে। ওদের কেউ বা ডেলহাউসির কোনো মার্চেণ্ট অফিসের স্টেনো, আর কেউ বা চৌরঙ্গির জমকালো দোকানে শপ-এসিস্ট্যাণ্ট।

জীবন? এরা জীবনের কী দেখেছে?—নিনা নিজের মনে হেসেছিলো একটুখানি। জীবনের কিই বা জানে? বড় জোর বয়-ফ্রেণ্ডকে নিয়ে সিনেমায়, নয় তো বা কোনো ক্লাবে, আর মাসের প্রথম দিকে হাতে টাকা থাকলে—

বড়জোর একটি সন্ধ্যা কোনো এক আধা-বনেদী জমকালো রেস্তরাঁয়। কিছুক্ষণ নাচ, দু'এক বোতল বিয়ার, দু'একজনের সঙ্গে ঘরোয়া প্রেম—এই তো এদের জীবন! আর এতেই ওই রোগাটে চেহারা, তীক্ষ্ণ ক্ষুধার্ত চোখ, চোখের কোণে কালি।......যে ঝড় নিনার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, তার কিছুও যদি ওদের জীবনে আসতো, তা'হলে?

নিনাকে দেখে কে বলবে তার বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশ। তার টানা নীল চোখ, গমের শীষের মতো গায়ের রং, পাটের মতো চুল, আর শরীরের সুঠাম গঠনের সঙ্গে ভাঁজে ভাঁজে লেপ্টে যাওয়া সিল্কের গাউন দেখে কে বলবে সে—......যাক, সে কে এবং কি, এদের না জানাই ভালো, নিনা ভাবলো।

এ জানলায় ও জানলায় সেদিন অনেকের চোখই মেপে নিচ্ছিলো তাকে। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো ববি, স্যাম্, পীটার, অস্কার আর আরো দুএকজন। ছবিটা নিনার পরিষ্কার মনে আছে। স্যাম তার টুপিখানি আরো তির্যক করে সরিয়ে দিলো মাথার পেছন দিকে। ববি দাঁড়িয়েছিলো আমেরিকান ছায়াচিত্রের কাওবয়দের মতো উদ্ধত ভঙ্গীতে। অস্কারের নীল জিনের প্যাণ্টের ফোল্ড্ গুটিয়ে গুটিয়ে হাঁটু আর গোড়ালির মাঝামাঝি এনে প্রদর্শন করানো হচ্ছিলো লাল-নীল-হলদে রঙের কটকটে মোজা, তার হাওয়াইআন শার্টের হাতা বগলের কাছাকাছি উঠে এসেছে, জামার সামনে পেছনে নারকোল গাছ, সমুদ্র-সৈকত এবং টু-পীস সুইমিং কস্ট্যুম পরিশোভিতা ললনার চোখ ধাঁধাঁনো প্রিণ্ট্। হাতে উল্কি, নীল হৃদয়কে বিদ্ধ করে একটি নীল তীর। পীটারের সচল চোয়ালখানি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে ওর মুখের ভিতর চ্যুয়িং-গাম্ চর্বিত হচ্ছে।

আর ওপাশের কাদের বাড়ির দোতলার জানলা থেকে ভেসে আসছে গানের কলির শীস। গানটি নিনার জানা, বহুদিনের পুরোনো গান:

আই আই আই আই আই আই লাভ্'য়্ ভের্—রী মাচ্......।

সেদিন সারা দুপুর কেটে গেল ঘরদোর গোছাতে।

ওপরে নিচে সারা বাড়িময় তখন হৈ-হুল্লোড়, দাপাদাপি, ছুটির দিনের কোলাহল। এ ঘরে রেকর্ড, ও ঘরে হেঁড়ে গলায় গান, ওপরতলায় বুড়ো আর বুড়ি জ্যাসপারের কলহ। রাস্তায় বাচ্চা ছেলেদের টেনিস বল দিয়ে ফুটবল খেলা।

কে যেন একবার দরজায় কড়া নাড়লো।

দরজা খুলে নিনা দেখে একজন কাবলীওয়ালা।

"হাপ্‌কিন ? হাপ্‌কিন শাহাপ্‌······?"

নিনা বিরক্ত হোলো।

"কোইভি সাহাব্‌ ইটার্‌ নেই রেহ্‌ঠা হাই—।"

"মেম্‌ শাহাপ্‌··· ··?"

"নো মেম্‌সাব্‌। ইটার কোই নেই হাই—।"

দরজাটা কাবলীওয়ালার মুখের উপর বন্ধ করে দিলো।

একটু পরে আবার কড়া নাড়ার আওয়াজ।

আবার কে? নিনা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আবার এসে দরজা খুলে দিলো।

সামনে দাঁড়িয়ে একজন মাঝবয়েসী স্ত্রীলোক।

"য়েস ?"

অতি বিনীতভাবে হাসলো মেয়েটি। বললো, "আমি মিসেস গড্‌উইন, ওপাশে থাকি। স্যুইট নাম্বার ফিফ্‌টীন, ওই কাবলিওয়ালা চ্যাপ্‌ কি তোমায় কোনো ট্রাব্‌ল্‌ দিচ্ছিলো? যদি কোনো অসুবিধে হয় তো আমায় বোলো। আমার ছেলে যখন স্কুলে পড়তো তখন ফ্লাই-ওয়েট্‌এ রানার্স-আপ্‌ হয়েছিলো। এখনো ফোর্ট উইলিয়ামে মাঝে মাঝে বক্সিং করে। প্রায় প্রফেশান্যাল, য়্যু নো? কাগজে ওর নাম নিশ্চয়ই পড়েছো,——ওর এক বন্ধু এঘরে থাকতো, ওই কাবলীওয়ালার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলো কিছু। হপ্‌কিন্স্‌ ওর নাম। কী অন্যায়, যাওয়ার আগে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু কী করবে

বেচারি, ওর এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে না পড়ে উপায় ছিলো না। ওর যে গার্ল ফ্রেণ্ড ছিলো উপরতলার ওই মেয়ে রোজমারী, তার সঙ্গে বুঝলে—— তোমার একঘেয়ে লাগছে না তো? এসব অবশ্যি কাউকে বলা উচিত নয়, তবে এ বাড়িতে কিছুদিন থাকলে তুমিও অনেক কিছু জেনে যাবে,—তুমি নতুন এসেছো, তাই হয়তো কিছুই বুঝতে পারছো না। মে আই কাম্ ইন্, আমি কি ভেতরে আসতে পারি, মিস্…ম্…অ্যা…ম্…মিস্—।"

"প্লীজ্ এক্স্‌কিউজ্ মি, এক্ষুণি আমার একজন বন্ধু আসবে—।"

নিনা দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

বন্ধ দরজাটার ওপার থেকে কানে এলো বাইরে কাকে যেন মিসেস গড উইন বলছে, "মেয়েটি বড্ড দাম্ভিক।"

"হু ইজ্ শী? কে সে?" কে একজন জিজ্ঞেস করলো……।

এর পর তাকে নিয়ে কি আলোচনা হবে সে কথা নিনা জানে। এরকম বাড়ি সে অনেক দেখেছে।

সন্ধ্যের পর নিনা একবার রুটি মাংস কিনতে বেরুলো। ফেরার পথে দেখলো কয়েকজন মেয়ে আর দু'চারজন ছেলে নিচে সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। কি যেন খুব উৎসাহের সঙ্গে ওরা আলোচনা করছিলো, তাকে দেখে থেমে গেল। নিনার মনে হোলো ওরা যেন আলোচনা করছে তাকে নিয়েই। সে চুপচাপ পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ঘড়িতে যখন ন'টা বাজলো, আর নিস্তব্ধ হয়ে এলো বেগম বাহার লেন, পিয়ানোর স্বর ভেসে এলো সামনের বাড়ি থেকে আর রাস্তা দিয়ে মাউথ অর্গ্যান বাজিয়ে চলে গেল একটি নিষ্কর্মা ছেলে, নিনা এসে দাঁড়ালো ড্রেসিং টেবিলের সামনে। দেখলো চোখের কোণে ক্লান্তির কালো ছায়া নেমেছে। মনে পড়লো, এতক্ষণে হয়তো হল্লোড় সুরু হয়ে গেছে পেলিকান্ বার্‌এ। একটি নতুন বিদেশী জাহাজ এসেছে কলকাতা বন্দরে, সাদা ইউনিফর্ম পরা নাবিকেরা এসে হয়তো ভিড় জমিয়েছে সেখানে। গেলাসের পর গেলাস

রাম্, জিন্, হুইস্কি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এপাশে ওপাশের টেবিলে, বার্এর মেয়ে-অভ্যাগতদের সঙ্গে ওদের ভাব হয়ে গেছে এরই মধ্যে। তাদের রঙচঙে মুখ আর সস্তা প্রসাধনের সৌরভ হয়তো ঝড় তুলেছে অনেক নাবিকের মনে, ঘোর লেগেছে তাদের ঘোলাটে চোখে। পয়সার মমতা করে না বিদেশী নাবিকেরা——এক রাতে যে কোনো মেয়ের পোনেরো দিনের খরচা উঠে যায়।

নিনা ড্রয়ার টেনে ফাউণ্ডেশানের কৌটোটি বা'র করলো, একটু ভাবলো, তারপর আবার রেখে দিলো। বড্ডো ক্লান্ত লাগছে শরীরটা। আজ আর বেরুবো না, স্থির করলো সে।

আস্তে আস্তে জানলার কাছে এসে বসলো——আনমনে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখ পড়লো সামনের বাড়ির জানলায়।......

নিনা ক্রিমসনের জীবনে নতুন অধ্যায় স্বরু হোলো সেদিন থেকে।

ওদের নাম সে পরে জেনেছিলো। ছেলেটির নাম ড্যানি গ্রীন, ওর বৌয়ের নাম লিলি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা নিনা যখন জানলায় একা বসেছিলো, তখন ওদের বাইরের ঘরে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিলো ড্যানি। স্বরটি নিনার চেনা। যুদ্ধের সময়কার বিখ্যাত লিলি-মার্লিন গানটির স্বর। পাশে একটি ইজিচেয়ারে বসে ওর বৌ লিলি গ্রীন হাসিমুখে একটি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলো। মেঝেতে বসে একটি টেডি-বেয়ার নিয়ে খেলছিলো ড্যানির মেয়ে সিলীন।

এক পাশে জ্বলছিলো একটি টেবিল-ল্যাম্প্, অতি স্নিগ্ধ তার শেড্।

চারদিক তখন নিস্তব্ধ। দূরে কোথায় যেন রেডিও বাজছে। আকাশে এক ঝাঁক ঝিলমিল তারা, চাঁদ উঁকি মারছে ওদিকের তেতলা বাড়ির ছাতের ওপার থেকে।

একটু পরে বাজনা থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে ড্যানি কি যেন বললো।

লিলি উঠে সিলীনকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলো। পাশের ঘরটিও রাস্তার

উপরেই। সে ঘরের জানলায় টুক করে আলো জ্বলে উঠলো। নিনা দেখলো সিলীন বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে। সে বুকের উপর হাত দুটো জুড়ে বিড়বিড় করে কি যেন বললো, তারপর উঠে পড়লো খাটের উপর। লিলি তার গায়ের উপর চাদর টেনে দিয়ে, মুখ নামিয়ে তাকে চুমু খেলো, তারপর আলো নিভিয়ে ফিরে এলো বসবার ঘরে।

ড্যানি তখনো পিয়ানো বাজাচ্ছে। লিলি এসে ওর পিঠের উপর হাত রেখে দাঁড়ালো। জ্যাকি মুখ ফিরিয়ে হাসলো। লিলি হাত বাড়িয়ে টেবিল্ ল্যাম্পটি নিভিয়ে দিলো। অন্ধকার নামলো সে ঘরে।

পিয়ানোর সুরটা কি রকম যেন ক্ষীণ। শুধু বাঁ হাত দিয়েই বাজানো হচ্ছে যেন——তারপর আবার দু'হাতেরই কাজ সুরু হোলো।

পিয়ানো বেজে চললো অনেকক্ষণ……অনেকক্ষণ……অনেকক্ষণ……। তারপর থেমে গেল এক সময়।

নিনা ক্রিমসন অনেকক্ষণ বসে রইলো জানলায়। কি রকম যেন একটা বিষণ্ণতা নামলো তার মনে। মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার কথা… …তার মাও এমনি বসে পিয়ানো বাজাতো সন্ধ্যের পর, পাশে একটি কৌচে বসে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে খবরের কাগজ পড়তো তার বাবা। টেডি-বেয়ার তো তারও একটি ছিলো।

কতোদিন আগেরকার কথা!

—আজ সে মিস্ নিনা ক্রিমসন, সন্ধ্যের পর বসে থাকে পেলিকান বার্এ, নয়তো বা আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায় চৌরঙ্গিতে। কতো বন্ধু তার, কতো চেনা, কতো অচেনা।

টাকা? হ্যাঁ, টাকা আসে আর যায়। কিন্তু আর যেন ভালো লাগে না।

কতো সুখী ওই মেয়েটি, যে সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে মেয়েদের সাময়িকী পড়ে, যার পাশে বসে পিয়ানোতে 'লিলি-মার্লিন' বাজায় ওর নির্ঝঞ্ঝাট স্বামী।

নিনা ক্রিমসন তারপরদিন সন্ধ্যেবেলাও বেরুলো না, তারপরদিন না, তারপরদিনও না। সন্ধ্যের পর সন্ধ্যে কাটিয়ে দিলো জানলায় বসেই, ড্যানি আর লিলি গ্রীণের জানলার দিকে তাকিয়ে।

এমনিধারা একটি জীবন যদি তারও থাকতো!—ভাবতে সুরু করলো নিনা ক্রিমসন।

এমন সময় একদিন এসে উপস্থিত হোলো হ্যারি ক্যামেরন।

বেশ অবস্থাপন্ন লোক সে। হিক্‌স্ কুইন কোম্পানিতে এসিস্ট্যাণ্ট সেল্‌স্ ম্যানেজার। নিনা ক্রিমসনের অল্প কয়েকজন নিয়মিত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অন্যতম। মাস ছয়েক হোলো বৌ মারা গেছে। তখন থেকে অন্তরঙ্গতা আরো বেশী।

নিনাকে সে অনেকবার বলেছিলো,—অন্য সবার সঙ্গে মেলামেশা ছেড়ে দাও। আমি তো আছি। তোমার ভাবনা কি?

নিনা ওর কথা কানে তোলে নি কোনোদিন। পুরুষজাতটাকে তার ভালো করেই জানা আছে। দু'দিন পর যখন আকর্ষণ কেটে যাবে, তখন?

"কী ব্যাপার? তোমায় বারএ দেখছি না কেন কয়েকদিন?" হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

নিনা বললো, "ভালো লাগছে না।"

এর মধ্যে যেন বিপুল হাস্যরসের সন্ধান পেলো হ্যারি ক্যামেরন। হাসতে লাগলো খুব। হাতে ছিলো বাদামী কাগজে মোড়া হুইস্কির বোতল। সেটি খুলে টেবিলের উপর রাখলো।

এমন সময় পিয়ানো বাজতে সুরু করলো সামনের বাড়ি থেকে। নিনা সরে এলো জানলার কাছে। তারপর হ্যারিকেও ডাকলো।

হ্যারি আর নিনা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখলো অনেকক্ষণ।

"বাঃ, মেয়েটি তো বেশ সুন্দর দেখতে," হ্যারি বললো।

"কী মিষ্টি ওদের জীবন," বললো নিনা।

একটু চুপ করে থেকে হ্যারি বললো, "নিনা, এ রকম জীবন তো তোমারও হতে পারে—।"

"কি করে হতে পারে বলো ?"

"যদি আমায় এসে থাকতে দাও তোমার সঙ্গে—।"

নিনা অনেকক্ষণ ভাবলো। তারপর রাজী হয়ে গেল। দেখাই যাক না কিছুদিন, সে বোঝালো নিজেকে।

•

তারপরদিন একটি সুটকেসে পায়জামা, টুথ্‌ব্রাশ প্রভৃতি ভ'রে হ্যারি ক্যামেরন নিনার ঘরে উঠে এলো।

নিনা ক্রিমসন কয়েকদিন ধরে লিলি গ্রীনের গেরস্তালি লক্ষ্য করেছিলো। তারপর নিজের বেলা যেন আরো ভালো করে, আরো গুছিয়ে করতে লাগলো সে।

সকালবেলা উঠে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট তৈরি করা, হ্যারি অফিসে বেরুনোর আগে তার কপালে একটি হাল্কা চুমু খাওয়া, দুপুরবেলা ঘুম, ঘুম ভেঙে উঠে হীটারে চায়ের জল চাপিয়ে হ্যারির জন্যে অধীর প্রতীক্ষা, সন্ধ্যের পর চৌরঙ্গির দিকে বেড়াতে বেরুনো, শনিবার কোথাও নাচের আসর, রোববার সিনেমা, রাত্তিরে অনেকক্ষণ গল্প, তারপর ঘুম—জীবনের উপর হঠাৎ যেন কি রকম একটা নেশা লেগে গেল নিনা ক্রিমসনের।

আগের দিনগুলোর কথা যেন আর মনেই পড়ে না।

ইতিমধ্যে একদিন আলাপ হয়ে-গেল ড্যানি আর লিলির সঙ্গে।

সেদিন নিনা আর হ্যারি গিয়েছিলো সিনেমায়, শো ভাঙবার পর বাইরে এসে দেখে খুব বৃষ্টি। এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে ড্যানি আর লিলি।

হ্যারি বললো, "কী বিচ্ছিরী আবহাওয়া—!"

ড্যানি উত্তর দিলো, "বড্ডো।"

"আমি হ্যারি ক্যামেরন।"

ড্যানি করমর্দন করলো, "হাও ড্যু' ডু। আমি ড্যানি গ্রীন। মীট মাই ওয়াইফ্।"

তারপর হ্যারি নিনাকে দেখিয়ে বললো, "মিসেস ক্যামেরন।"

নিনা সর্বাঙ্গে একটি শিহরণ অনুভব করলো।

কারো স্ত্রী বলে পরিচিত হওয়ার এতটা আনন্দ, সে ভাবতেই পারে নি কোনোদিন।

ট্যাক্সিতে একসঙ্গে ফিরলো ওরা সবাই। ড্যানি ছাড়লো না। ওদের ধরে নিজেদের ফ্ল্যাটে নিয়ে তুললো চা খাওয়াতে।

সেখানে অনেকক্ষণ বসে গল্প, গান, ড্যানির পিয়ানো। হ্যারির গলা যে এত ভালো, সে যে এত সুন্দর গান গায় কে জানতো। ড্যানির পিয়ানোর সঙ্গে 'লিলি-মার্লিন' গানটি গাইলো ওরা সবাই মিলে।

হ্যারি লিলিকে বললো নিশ্চয়ই তোমার কথা ভেবেই লিলি মার্লিন গানটি লেখা হয়েছিলো।

হ্যারির কথা শুনে সব চাইতে বেশী খুশি হয়েছিলো লিলির বর ড্যানি গ্রীন।

সেদিন থেকে যাওয়া আসা সুরু হোলো।

একসঙ্গে সিনেমায় যাওয়া, রাত্তিরে বেরুনো, যদ্দিন হাউসি উঠে যায়নি তদ্দিন হাউসিতে যাওয়া।

ড্যানির অবস্থা খুব ভালো নয়, তবে তার নিজের একটি পিয়ানো সারানোর দোকান আছে। লিলির চাকরিটি ভালো, কোন এক বিলিতী ফার্মে জেনারেল ম্যানেজারের পার্সন্যাল এসিস্ট্যান্ট। দুজনে মিলে সংসার চালায় কোনো রকমে।

সুতরাং বেশীর ভাগ দিনই ওরা বেরুতো হ্যারির অতিথি হয়ে।

একদিন নিনা হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে লিলি তার সঙ্গে ঠিক আগের মতো

সহজ নেই। তার বাড়িতে সে আর আসেও না। লিলির ওখানে গেলে খুব ভালো করে কথা বলে না।

নিনা তখন ওদের বাড়ি যাওয়া কমিয়ে দিলো।

হ্যারিকে কিছু বললো না।

হ্যারি যাওয়া আসা করতে লাগলো আগের মতো।

তারপর একদিন লক্ষ্য করলো বেগম বাহার লেনে অন্যান্য যে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো ইতিমধ্যে, তারাও তাকে এড়িয়ে চলছে। তার সঙ্গে কেউ যেচে কথা বলে না। নিজের থেকে কথা বললে হ্যাঁ-না গোছের দু'একটা কথা বলে চলে যায়। নিনার চেনা বিদেশী বন্ধু দু'একজন এলে কি রকম যেন একটা অবজ্ঞাসূচক চাউনি দিয়ে তার দিকে তাকায়।

ঈভা বারওয়েল আর তার ইণ্ডিয়ান বয় ফ্রেণ্ড তো সেদিন তাকে একরকম তাচ্ছিল্য দেখিয়েই পাশ কাটিয়ে গেল। মলি মার্টিন কথাই বললো না তার সঙ্গে।

প্রথম দিকটা অতো গায়ে মাখতো না নিনা ক্রিমসন, ভাবতো হয়তো এ পাড়ার লোকগুলো বেশীর ভাগই 'স্নব্', একটু নাক-উঁচু সবাই।

কিন্তু কিছুদিন যেতে এসব তাচ্ছিল্য আস্তে আস্তে তার গায়ে বিঁধতে লাগলো।

সেদিন বিকেল বেলা রাস্তার মোড়ে ড্যানির সঙ্গে দেখা।

ড্যানি নিনাকে বললো, "কি ব্যাপার নিনা, আজকাল তোমার আর দেখা যায় না কেন ?"

নিনা একটি মামুলী উত্তর দিয়ে অন্য কথা পাড়ছিলো, এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হোলো লিলি গ্রীন। নিনাকে দেখে কিছু বললো না, ড্যানির হাত ধরে বললো, "ডালিং, চলো আমরা বাড়ি যাই।"

ড্যানি একটু অবাক হোলো, বললো, "নিনাও নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আসছে—।"

"আই ডোণ্ট্ থিংক্ সো," লিলি গম্ভীর ভাবে বললো। "আমার মনে হয়

তুমি নিশ্চয়ই জানো যে দিস্ উওম্যান্ ইজ্ নট্ কোয়াইট্ রেস্পেক্টেব্ল্। ওর নাম খুব খারাপ।"

লিলির নিষ্করুণ অভদ্রতায় ড্যানি স্তম্ভিত হোলো।

"কী বলছো লিলি!"

"হ্যাঁ। ওকে জিজ্ঞেস করো। আমি যদ্দুর জানি হ্যারি ক্যামেরন ওর কেউ নয়। আসল মিসেস ক্যামেরন মারা গেছে বেশ কিছুদিন আগে। এই মেয়েটি অমনি হ্যারির সঙ্গে থাকে। তুমি কি চাও আমাদের মতো রেস্পেক্টেব্ল্ মেয়েরা ওর সঙ্গে মেলামেশা করে? চলো আমরা বাড়ি যাই।"

লিলি আর ড্যানি চলে গেল।

নিনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তার এক পাশে। আর তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল অনেক পথিক, অনেক গাড়ি, ট্রাম বাস রিকশ।

অরুণ ঈভা বারওয়েলকে বললো, "দেখছো ওই নিনা মেয়েটি কি রকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে?"

"ওরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাই ওর অভ্যেস," ঈভা বললো। "তাড়াতাড়ি চলো। ছ'টা প্রায় বাজে।"

ওরা রাস্তার ওধার দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো নিনা ক্রিমসন।

হ্যারি বাড়ি ফিরলো সন্ধ্যের পর।

কিন্তু অন্যান্য দিনের মতো নিনা ছুটে এসে ওর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো না।

হ্যারি অবাক হয়ে দেখলো নিনা চুপচাপ এককোণে একটি ইজিচেয়ারে বসে আছে। মুখ তার শীতের গোধূলির মতো ম্লান, সরু সরু আঙুলের মাঝখানে একটি সিগারেট। আর সামনে অজস্র সিগারেটের টুকরো ছড়ানো।

সে চোখ তুলে একবার তাকালো, তারপর আবার সিগারেট টানতে লাগলো নিজের মনে।

"কী হয়েছে ডালিং," হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

নিনা উত্তর দিলো না।

"কেউ তোমায় কিছু বলেছে?"

নিনা চুপ করে রইলো।

হ্যারি আর কিছু না বলে কোটটা খুললো, টাই-এর গ্রন্থি শিথিল করে দিলো। তারপর চুপচাপ বসে পড়লো একটি চেয়ারে।

নিনা কথা বললো অনেকক্ষণ পর।

বললো, "হ্যারি, তুমি আর এখানে থেকো না। তুমি চলে যাও।"

"কেন?" হ্যারি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"তোমার উচিত নয় এখানে থাকা।"

"কেন? ডোণ্ট য়ু লাভ মী এনি মোর, ডার্লিং—তুমি কি আমায় আর ভালোবাসো না?"

নিনা একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো।

তারপর বললো, "তোমরা রেসপেকটেব্‌ল্‌. বড়ো বড়ো অফিসের বিগ্‌ শট্‌স্‌। আমি একটি খারাপ মেয়েছেলে—"

"কে বলে সে কথা?"

লিলি ড্যানিকে বলেছে আমার সঙ্গে না মিশতে—।"

"লিলি?"

"হ্যাঁ।"

"ওদের নিয়ে মাথা ঘামিও না নিনা," হ্যারি বললো, "ওরা নিশ্চয়ই তোমায় হিংসে করে।"

"আমায় হিংসে করে? কেন?" অবাক হোলো নিনা।

"কারণ আমি তোমায় এত ভালোবাসি, তুমি আমায় এত ভালোবাসো—।"

"তাতে ওদের হিংসে হওয়ার কী আছে?"

"ওদের মধ্যে তো এত ভালোবাসা নেই—"

"সে কি! ওরা যে স্বামী-স্ত্রী!" নিনা আরো অবাক হয়ে বললো।

"স্বামী-স্ত্রী হলেই কি ভালোবাসা হয়?"

"কিন্তু ওদের দেখে তো আমার মনে হয়েছিলো—"

"—বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না," হ্যারি উত্তর দিলো।

নিনার মনে পড়লো সেদিনকার সন্ধ্যেটি।

—ড্যানি বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে। পাশে বসে একটি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে লিলি। একপাশে একটি ল্যাম্প, তার শেড্‌খানি খুব স্নিগ্ধ।

মনে হয়েছিলো ওরা কতো সুখী, হিংসে হয়েছিলো ওদের দেখে, নিজের জীবন সম্বন্ধে আক্ষেপ এসেছিলো নিনার মনে, ভেবেছিলো যদি ওদের মতো হওয়া যেতো! আর সেজন্যেই তো হ্যারির সঙ্গে এই ঘরকন্না, ওদের অনুকরণ করে।—

"কিন্তু তুমি ওদের কথা জানলে কি করে?" নিনা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো হ্যারিকে।

"আমি? আমি—," একটু থেমে গেল হ্যারি, "আমি—আমি আঁচ করেছি! ওদের—ওদের দেখেশুনেই আমার একথা মনে হয়েছে।"

নিনা ফিরে দাঁড়ালো।

"আচ্ছা, হ্যারি, লিলি আমার কথা কি করে জানলো? তুমি লিলিকে কিছু বলোনি তো?"

"আমি? আমি বলতে যাবো তোমার কথা? লিলিকে?" হ্যারি উত্তর দিলো।

তারপর একটু চুপ করে থেকে হ্যারি বললো, "দেখ, একটা কথা তোমায় এদ্দিন বলিনি। হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, আমিও কিছুদিন ধরে ওদের ওখানে আর যাচ্ছি না। কারণ লিলি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো তোমার কথা।"

"আমার কথা?"

"হ্যাঁ। লিলি বলছিলো, সে নাকি আগে তোমায় দেখেছে ড়ু' একজন সেইলার্এর সঙ্গে।

"দ্যাট ওয়াজ নান্ অফ হার্ ব্লাডি বিজনেস্," বেরুলো নিনার মুখ থেকে।

লিলি চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর বললো, "হ্যারি— !"

"কি ?"

"আমার একটি কথা রাখবে ?"

"বলো।"

"এসো, আমরা বিয়েটা করে ফেলি।"

"কেন, এই তো বেশ আছি।"

"না, হ্যারি। আমি তোমার বিয়ে করা বৌ নই বলে লিলি আমায় যা খুশি তাই বলেছে। আমি যতোক্ষণ না ওদের দেখিয়ে দিতে পারি যে আমিও মিসেস ক্যামেরন, মিসেস লিলি গ্রীনের মতো নির্ভেজাল মিসেস নিনা ক্যামেরন, আর তোমার আমার সংসারের সুখ ওদের সংসারের সুখের চাইতে এক আউন্স্ও কম নয়, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।"

হ্যারি একটু ভাবলো।

তারপর বললো, "কিন্তু আমায় বিয়ে করলে কি আগের মতো স্বাধীন জীবন তোমার থাকবে ?"

"সে আমি চাই না হ্যারি— ।"

একটু চুপ করে থেকে হ্যারি বললো, "কিন্তু.... ."

"কিন্তু কি ? তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও না ?"

"না, না, নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু আরো কিছুদিন যাক।"

"কেন ?"

"আমার একটি ইনক্রিমেন্ট্ পাওয়ার কথা আছে বছরের শেষে। সেটি হয়ে যাক। তারপর।"

নিনা চোখ তুলে তাকালো।

বললো, "বেশ, তাই হবে।"

লিলিদের যাওয়া-আসা বন্ধ সেদিন থেকে। নিনা আর লিলি রাস্তায় দেখা হলে দুজনেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ড্যানির সঙ্গে নিনার দেখা হলে সে শুধু টুপি তুলে অভিবাদন করে নিঃশব্দে চলে যায় পাশ কাটিয়ে।

হ্যারি ক্যামেরন রাত করে বাড়ি ফেরে মাঝে মাঝে। নিনা রাগ করে, ঝগড়া করে, অনুযোগ করে। হ্যারি সয়ে যায় মুখ বুঁজে।

মাঝে মাঝে হ্যারি রাত্তিরে ফেরেই না।—অফিসের কাজে নাকি তাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয় অনেক সময়।

তখন নিনা চুপচাপ বসে থাকে জানলায়।

কিন্তু ড্যানি গ্রীনের জানলা অন্ধকার।

কিছুদিন ধরে পিয়ানো বাজাচ্ছে না সে।……

একদিন হ্যারি রাত্তিরে ফিরলো না। যাওয়ার আগে কিছু বলে যায় নি। তাই তারপরদিনও যখন তার দেখা নেই, নিনা ক্রিমসন ওর অফিসে টেলিফোন করলো। কিন্তু অফিসের অপারেটর লাইন দিলো না কিছুতেই। বললো, হ্যারি শহরের বাইরে।

"বাইরে যাওয়ার আগে আমায় নিশ্চয়ই বলে যেতো," নিনা বললো।

"ভেরি সরি মিস্," বলে অপারেটর লাইন কেটে দিলো।

নিনা সারাদিন জানলার কাছে গুম হয়ে বসে রইলো।

দুপুরবেলার সোনালী-নীল আকাশে উড়ে গেল বকের সারি। নিনা তাই দেখলো বসে বসে।

সিগারেট শেষ হয়ে গেল একটার পর একটা। পাহাড় গড়ে উঠলো প্লাস্টিকের ছাইদানে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হোলো। বাড়ির ছায়াগুলো দীর্ঘতর হোলো

সামনের রাস্তায়। স্কুল-বাস্ এসে নামিয়ে দিয়ে গেল এ বাড়ি ও বাড়ির ফুটফুটে ছেলেমেয়েদের।

অফিস থেকে ফিরলো এক এক জন করে চেনা সব্বাই, ওপর তলার অস্কার, তেতলার কোণের ঘরের ডোনাল্ড, একতলার রবিনসন্, দূরের ওই ফ্ল্যাটের ফ্রেডি আর অলগা নেসবিট, ডোনাল্ডের বোন রোজমারী, ও বাড়ির মলি মার্টিন, ওয়াই-ডব্লিউ সি-এ হস্টেলের ঈভা বারওয়েল—আর আরো অনেকে।

অলস বিকেল ফিকে হয়ে এলো গোধূলির বিষণ্ণ আবছায়ায়।

দরজায় কড়া নড়ে উঠলো।

নিনা কান পেতে শুনলো। কে হ্যারি?

কড়া নড়ে উঠলো আবার।

নিনা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

"হ্যারি—!!!"

হ্যারি নয়। সে ড্যানি।

ড্যানির এলোমেলো চুল। আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর এসে বসলো।

"কি ব্যাপার ড্যানি?" নিনা জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি জানো না বুঝি?" ড্যানি আস্তে আস্তে বললো।

নিনা তাকিয়ে রইলো ড্যানির দিকে। তার বড়ো বড়ো চোখ ছুটি জুড়ে বিস্ময় আর প্রশ্ন।

"লিলি চলে গেছে—।"

"লিলি? সে কি করে যেতে পারে? সে তোমার বৌ—!"

"সত্যি বলছি নিনা। সে আমায় ছেড়ে চলে গেছে।"

"শুনে খুব দুঃখিত হলাম ড্যানি! কিন্তু—"

"আর, চলে গেছে হ্যারির সঙ্গে।"

"কার সঙ্গে?" লিলি উঠে দাঁড়ালো।

"হ্যারির সঙ্গে।"

"হ্যারি ক্যামেরন?"

ড্যানি চুপ করে রইলো।

"হ্যারি! কিন্তু সে যে আমায় কথা দিয়েছিলো—!"

ড্যানি সবই খুলে বললো নিনাকে।

ড্যানির পিয়ানো সারানোর দোকানটির অবস্থা ভালো নয়, তার আয়ে সংসার চলে না। লিলির আয়ের প্রায় সবটাই চলে যেতো সংসার চালাতে। এই নিয়ে চাপা অসন্তোষ অনেকদিন থেকে।

ইতিমধ্যে হ্যারির সঙ্গে লিলির আলাপ হোলো, আলাপ থেকে বন্ধুতা, বন্ধুতা থেকে অন্তরঙ্গতা।

ড্যানি টের পাচ্ছিলো সবই, কিন্তু কিছু বলেনি। বলবার মুখ তার নেই।—বৌয়ের আয়ে সংসার চলে, কিছু বললে দু'কথা শুনিয়ে দেবে।

কিছুদিন পর লিলি এসে বললো,—ড্যানি, আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো।

ড্যানি আপত্তি করলো না।

লিলি বললো,—আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তারপর আদালতে ডিভোর্সের আবেদন পেশ কোরো।

ড্যানি উত্তর দিলো—তোমার যা ইচ্ছে।

"গতকাল রাত্তিরে লিলি চিঠি লিখে রেখে চলে গেছে। সে চিঠি আজ সকালে পেলাম," বলে ড্যানি থামলো।

"হ্যারি তা'ও লিখে রেখে যায় নি," বললো নিনা।

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো নিনা ক্রিম্‌সন। তারপর হাসতে সুরু করলো! বর্ষা-নিঝুম শেষ রাত্তিরের দমকা হাওয়ার মতো সেই হাসি। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লো চেয়ারের উপর।

"হাসছো কেন?" ড্যানি জিজ্ঞেস করলো।

নিনা হাসতে হাসতে বললো, "তোমায় আর লিলিকে দেখে এক এক সময় হিংসে হোতো। ভাবতাম, ওরকম জীবন যদি আমারও হয়। মনে

হোতো আদর্শ স্ত্রী তোমার বৌ লিলি। তাই আমিও কিছুদিন চেষ্টা করেছিলাম আদর্শ স্ত্রী হবার, যদিও হ্যারি আমার বিয়ে-করা স্বামী নয়। দেখছিলাম আদর্শ স্ত্রী হতে কি রকম লাগে। কিন্তু ড্যানি, এই সমস্যার উত্তর কি? সত্যি সত্যি কি করে সুখী হওয়া যায় বলো তো?"

ড্যানি চুপ করে রইলো।

নিনা বললো, "আমার আগের জীবন কি ছিলো জানো?"

ড্যানি আস্তে আস্তে বললো, "হ্যাঁ, জানি। লিলি বলছিলো।"

"কিন্তু লিলি কি করে জানলো বলো তো?"

"ওকে হ্যারি বলেছে।"

"হ্যারি।"

নিনা সোজা উঠে দাঁড়ালো। "হ্যারি? আমাদের হ্যারি ক্যামেরন?"

আবার বসে পড়লো সে। বসে রুমাল চাপা দিলো চোখের উপর। সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠলো ঝড়ের শেষ রাতের রজনীগন্ধার ঝাড়ের মতো।

ড্যানি বসে রইলো চুপটি করে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘিরে এলো চারদিকে। আলো জ্বললো না নিনার ঘরে।

চোখ থেকে রুমাল নামিয়ে সোজা হয়ে বসলো নিনা ক্রিমসন।

"এবার কি করবে?" ড্যানি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

"করতে তো হবে একটা কিছু," নিনা খুব সহজ ভাবে বললো, "ঘরের ভাড়াটা তো দিয়ে যেতে হবে মাসে মাসে, দুবেলার খাওয়াটাও যোগাড় করতে হবে। তবে কি আর করবো? হয় তো ফিরে যাবো আগের জীবনে। আমার কোনো ভাবনা নেই। আমার কতো বন্ধু! আমার মতো মেয়ের কতো কি করবার আছে—।"

"নিনা!"

"কি?"

একটুখানি নিস্তব্ধতা কাটিয়ে ড্যানি বললো, "আমি বলছিলাম কি, আমার

একটি পিয়ানো সারানোর দোকান আছে জানো তো? আমি একা দেখা-শোনা করতে পারিনে। যদি তুমিও আসো, তা'হলে—।"

নিনা অনেকক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, "আচ্ছা, আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক।"

"আমি বেশি কিছু দিতে পারবো না," ড্যানি টাই ঠিক করতে করতে বললো, "তবে তোমায় ছাড়িয়েও দেবো না কোনো দিন। বেশী মাইনে দিয়ে লোক রাখবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি বড্ড গরীব। পয়সাকড়ি আমার খুব বেশী নেই।"

"সে দেখা যাবে," নিনা বললো।

"নিনা।

"আমার পিয়ানো তোমার ভালো লাগে?"

নিনা হাসলো।

ড্যানি অন্ধকারে সে হাসি দেখতে পেলো না, অনুভব করলো শুধু।

একটু পরে ড্যানি চলে গেল।

নিনা জানলার কাছে গিয়ে বসলো। কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলো ড্যানির অন্ধকার জানলার ওধারে পিয়ানো বাজছে।

কয়েকমাস কেটে গেল। তারপর মার্চ এলো পাতা ঝিরঝির করে।

অরুণ বোস আর ঈভা বারওয়েল একদিন নিউমার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো টুকটাক এটা ওটা সেটা সওদা করে।

হঠাৎ দেখে একটি স্টল্ থেকে বেরুচ্ছে হ্যারি ক্যামেরণ আর আরেকটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক।

হ্যারির সঙ্গে এদের আলাপ ছিলো না। তাই সে লক্ষ্য করলো না এদের।

অরুণ বললো, "জানো ঈভা, তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। হ্যারিকে আমি এ মেয়েটির সঙ্গে আরো দু'এক জায়গায় দেখেছি। কী ব্যাপার বলো তো? লিলির সঙ্গে কি ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে নাকি?"

লিলি গ্রীণ যে ড্যানিকে ডিভোর্স চলে গিয়েছিলো হ্যারির সঙ্গে, একথা বেগম বাহার লেনে কারো জানাজানি হতে বাকি ছিলো না।

ঈভা বললো, "ও! তোমায় বলিনি বুঝি? হ্যারি তো লিলিকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েও বিয়ে করে নি শেষ পর্যন্ত। কারণ ড্যানিকে ছেড়ে আসবার কিছুদিন পরই লিলির চাকরি যায়, ওদের কোম্পানি ওদের কলকাতার ব্রাঞ্চ তুলে দিচ্ছে বলে। লিলির হাতে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ক'টা যদ্দিন ছিলো তদ্দিন ওর সঙ্গে মেলামেশা করেছে। এখন বিয়ে করেছে ওই মেয়েটিকে—যাকে তুমি হ্যারির সঙ্গে দেখলে।"

শুনে অরুণ একটু অবাক হোলো। জিজ্ঞেস করলো, "লিলি এখন কোথায়?"

"তা তো জানি না। ওকে দেখিনি অনেকদিন।"

"ওর মেয়েটি কোথায়?"

"লিলির সঙ্গেই আছে। যদ্দূর জানি ওর আর্থিক অবস্থা এখন খুব খারাপ। ও যাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে ওরাও খুব ভালো লোক নয়।"

একটু চুপ করে রইলো দুজনেই।

তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল অরুণ আর ঈভা। লিলি গ্রীনের কথা আর মনে রইলো না।

মার্চ কেটে গেল। এপ্রিল কেটে গেল। তারপর মে।......

মে মাসের মাঝামাঝি একদিন সন্ধ্যেবেলা ড্যানি আর নিনা বাড়ি ফিরছিলো সিনেমা দেখে। পথে নিউমার্কেট থেকে কিছু সওদা করে ওরা বাড়ির পথ ধরলো এ পথ ও পথ ঘুরে। পথে পড়লো পেলিকান-বার্।

নিনা হেসে বললো, "জানো ড্যানি, একসময় আমি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যের পর এখানে বসে থাকতাম।"

"ওসব দিনের কথা ভুলে যাও নিনা," ড্যানি বললো, "আমরা এখন বেশ সুখে আছি।"

"পুরোনো জায়গাটি দেখে হঠাৎ মনে পড়লো—।"

ড্যানি কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল।

পেলিকান-বার্ থেকে বেরিয়ে আসছে কে একজন। পড়ে গেল একেবারে সামনাসামনি।

খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ, লিলিই তো। চোখে মুখে তার বিদেশী সুরার ঘোর।

লিলি?

"হালো লিলি," খুব সহজ ভাবে বললো ড্যানি, বহুদিন দেখা-না-হওয়া পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে যে ভাবে বলে।

লিলি এক নজর দেখলো নিনাকে। তারপর তাকে অবহেলা করে ড্যানিকে বললো, "হালো ড্যানি? কি রকম আছো?"

ড্যানি নিনাকে দেখিয়ে বললো, "একে তুমি ভুলে গেছ? আমার বৌ নিনা।"

"তোমার ওয়াইফ্!" ভুরু উপর দিকে তুললো লিলি।

নিনা চুপ করে রইলো হাসিমুখে।

"হ্যাঁ, কিছুদিন হোলো আমাদের বিয়ে হয়েছে," ড্যানি আস্তে আস্তে বললো।

"ও, কন্‌গ্র্যাচুলেশানস্। —আচ্ছা, ড্যানি, আমায় যেতে হবে এখন। বাই বাই," বলে লিলি ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে গেল ফুটপাথ ধরে।

ড্যানি আর নিনাও উল্টো দিকে এগিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর ফিরে তাকিয়ে দেখলো।

দেখলো—লিলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একটি ল্যাম্প-পোস্টে হেলান দিয়ে। ঠিক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এমন সময় পেলিকান-বার্ থেকে বেরিয়ে এলো একজন বিদেশী নাবিক।

সে লিলির কাছে এলো। খুব জোরালো তার গলা। নিনা আর ড্যানি পরিষ্কার শুনতে পেলো।

শুনলো, "তুমি এখানে? কখন উঠে এলে?" লিলির হাত ধরলো সেই নাবিক, বললো, "কাম্‌ এলং, ডালিং, আমি তোমায় আরো একটি ভালো জায়গায় নিয়ে যাবো, যেখানে এত ভিড় নেই।"

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলো লিলি। তারপর চোখে রুমাল চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে।

নিনা ড্যানির হাত ধরে বললো, "চলো ড্যানি, আমরা বাড়ি যাই—।"

ওরা মিশে গেল পথ চলতি জনতায়।

লিলি দাঁড়িয়ে রইলো। ওর পাশ দিয়ে বয়ে গেল অনেক পথিক, অনেক গাড়ি, অনেক সাইকেল আর রিকশ। মে মাসের সন্ধ্যা আরো নিবিড় হয়ে নামলো কলকাতায়। ফুটপাথের পাশে দোকানে দোকানে নানা রঙের ইলেক্‌ট্রিক্‌ আলো আর নিয়ন্‌ সাইন্‌ ঝলমল করে উঠলো।

নানা রকম পোশাক পরা নানা জাতের পথিক যারা পেরিয়ে গেল লিলি নামে সেই মেয়েটিকে তাদের মধ্যে ছিলো অরুণ আর ঈভা বারওয়েল। নিজেদের গল্পে ওরা এত মশগুল যে লিলিকে ওরা লক্ষ্যই করলো না। হাঁটতে হাঁটতে ওরা এগিয়ে গেল। ডাইনে ঘুরে, বাঁয়ে ফিরে, ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে, রাস্তা পেরিয়ে, অন্য ফুটপাথে উঠে, ঢুকলো এসে একটি ছোটো রেস্তরাঁয়, যাদের আইসক্রীমের খুব নাম।

বেশ ভিড়। সিনেমা ফেরত অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসে আড্ডা দিচ্ছে সেখানে —বাঙালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, গুজরাতী, মারওয়াড়ি, চীনে, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর এক কোণে নিরিবিলি একটুখানি জায়গা পেয়ে গেল এরা দুজন।

সেখানে বসে, এক চামচে আইসক্রীম মুখে পুরে অরুণ বললো, "দেখ ঈভা, ওসব কথা আমি অনেকদিন শুনেছি, আর নয়। এ মাসেই আমরা বিয়ে করে ফেলছি।"

ঈভা বললো, "দেখ, বিয়ে করবো না এ কথাতো বলিনি, কিন্তু আরো কিছুদিন অপেক্ষা করো না। আমার টাকাটা তো মা-বাবার কাছে পাঠাতে হয়, আর তোমার যা রোজগার, তা দিয়ে যদি আমাদের একটি সংসার চালাতে হয় তো তোমার খুবই কষ্ট হবে।"

"হ'লে হবে, সে আমি বুঝবো'খন," অরুণ বললো, "কবে আমি হাজার খানেক টাকা মাসে রোজগার করবো, তখন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে মিসেস বোস হবে, সে অপেক্ষায় থাকলে সারাজীবন তোমাকেও বিয়ে না করে থাকতে হবে, আমাকেও বিয়ে না করে থাকতে হবে। তবে যদি তোমার কষ্ট হয়—"

"আমার কিছু কষ্ট হবে না অরুণ," ঈভা আস্তে আস্তে বললো, "তুমি আমি একসঙ্গে থাকলে আমার সব কষ্ট সইবে। কিন্তু তোমার অসুবিধে হবে যে!"

"কী অসুবিধে হবে শুনি?"

"এই ধরো, আজ তুমি আমায় এখানে এনে আইসক্রীম খাওয়াচ্ছো, আমিও বেশ আরাম করে খাচ্ছি। বিয়ের পর এসব হতে দেবো নাকি? তখন বলবো, আইসক্রীম খেয়ে পয়সা নষ্ট করে দরকার নেই, বাজার থেকে একটি বাঁধাকপি কিনে নিয়ে এসো।"

"বেশ। বাঁধাকপি তুমি যতো চাও কিনে এনে দেবো," অরুণ উত্তর দিলো।

ঈভা হাসতে সুরু করলো।

অরুণও হাসলো। তারপর বললো, "দেখ ঠাট্টা নয়। এখানে বা অন্য কোথাও গিয়ে বসি কেন জানো? প্রথমত, তোমার আর আমার কোথাও বসে গল্প করা দরকার, যতোক্ষণ খুশি। তোমার হস্‌টেলে সেটা সম্ভব নয়। আমার ঘরেও সম্ভব নয়। যখন আমি আর তুমি একসঙ্গে থাকবো, তখন বেরুবোই না ঘর থেকে। কী আসে যায় যদি সামনে আইসক্রীম না থাকে। তা ছাড়া, হপ্তার সাড়ে পাঁচটা দিন খাটি, সাড়ে পাঁচটা রাত বাড়িতে কাটাই।

মাঝে মাঝে কয়েকটি সন্ধ্যা বাইরে না কাটালে কাজের উৎসাহ নষ্ট হয়ে যাবে। জীবনটাকেই আর ভালো লাগবে না।"

"তোমার আত্মীয়স্বজন কিছু মনে করবে না, অরুণ?"

"আমার মা-বাবা-খুড়ো কেউ নেই। সুতরাং সেদিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। আর অন্য আত্মীয়স্বজন কে কি মনে করলো কে তোয়াক্কা করে।"

"তোমাদের ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান্দের মধ্যে অনেক ভালো ভালো মেয়ে আছে অরুণ।"

"থাকুক গে। তোমাদের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও ভালো ছেলে আছে। কিন্তু বিয়েটা কি এ্যালজেব্রার ইকোয়েশান নাকি যে ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ানের বিয়ে হবে, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে বিয়ে হবে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের. বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে হবে বাঙালী হিন্দুর? যার যাকে ভালো লাগবে, সেই তাকে বিয়ে করবে—সোজা কথা।"

"কিন্তু তা'তো হয় না।"

"না, হয় না। কারণ এখনো আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থা যে রকম, একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেকটির যোগাযোগ নেই বললেই হয়। তাই প্রত্যেকের মনে বিরূপতা আছে অন্যান্য প্রত্যেকের সম্বন্ধে। প্রত্যেক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে তাদের চাইতে নিচু মনে করে। সুতরাং ভালো-লাগার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ নেই। অতএব বিয়ের সম্পর্ক যা কিছু সব যার যার নিজের সম্প্রদায়ের ভিতর, তাও একটি বাঁধাধরা গণ্ডিতে। ওসব কিছু নয়। মেলামেশা যতো বাড়বে, ওসব পাঁচিল ধ্বসে পড়বে। কোনো না কোনোরকম বর্ণবিভাগ সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। এবং সে হিসেবে অসবর্ণ বিয়েও আজকাল সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই হচ্ছে। বিশুদ্ধ জাত বলে কিছু আছে বলে তো আমি জানি না। কয়েক শো বছর আগে কয়েকজন এদেশী মেয়ের ভালো লাগলো কয়েকজন বিদেশী ছেলেকে। সুতরাং এলো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ। অনার্য, আর্য, দ্রাবিড়, মঙ্গোল—কার রক্ত নেই

বাঙালীর মধ্যে ? শক, কুশান, হূণ—কার রক্ত মেশেনি উত্তর ভারতীয়দের রক্তে ? নর্ম্যান, স্যাক্সন—ইংরেজ বলতে এদের কাকে বোঝায় ? আশ্চর্য ! পঁচিশটি রক্ত মিশে একটি নতুন জাত হবো, তারপর গোঁ ধরে বসে থাকবো যে আমাদের রক্ত বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে অন্য রক্তের সঙ্গে মিশবো না—এসব আমার নিতান্ত বর্বরজনোচিত ধারণা বলে মনে হয়,"—বলে অরুণ একসঙ্গে অনেকখানি আইসক্রীম মুখে পুরলো।

ঈভা বারওয়েল হাসতে হাসতে বললো, "অতো উত্তেজিত হোচ্ছো কেন, অরুণ। আমি তো তোমার আমার কথা ভেবে কিছু বলিনি।"

"দেখ, ঈভা," অরুণ বললো, "জীবনে সুখী হওয়াটাই বড়ো কথা। আমাদের সমস্ত কিছু,—কাজকর্ম, স্বপ্ন, কামনা, উচ্চাভিলাষ—সব কিছুর মূলে ওই সুখের খোঁজ করে বেড়ানো। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে আমি হয়তো কোনো দিশী খৃষ্টান মেয়েকেই বিয়ে করতাম। কিম্বা কোনো বাঙালী হিন্দু মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলে, অন্তরঙ্গতা হলে, হয়তো তাকে বিয়ে করে সুখী হওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর যখন মনে হয়েছে, সুখী হবো তোমায় বিয়ে করলেই, তখন সেটাই শেষ কথা। এর পর তোমার গায়ের রং সবুজ না আমার গায়ের রং নীল, তোমার বাবার বাবা ফিটনে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন না আমার বাবার বাবা পাঁচ মাইল হেঁটে এসে কলকাতায় অফিস করতেন—এসব প্রশ্ন অবান্তর।"

ঈভা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো।

অরুণ বললে, "ঈভা, তুমি আমায় ভালোবাসো ?"

ঈভা হেসে বললো, "আমার তো তাই ধারণা।"

"তা হলে বিয়ের কথা দেওয়ার আগে এত ভাবছো কেন ?"

"তোমায় ভালোবাসি বলে", ঈভা উত্তর দিলো।

"বেশ, ভাবো—। যতো খুশি ভাবো।" রাগ করে অরুণ আর দুটো আইসক্রীমের অর্ডার দিলো।

ঈভা আইসক্রীম খেলো চুপচাপ। অনেকক্ষণ।

তারপর বললো, "অরুণ, আমায় বিয়ে করে তুমি সুখী হবে?"

"হ্যাঁ—।"

"তোমার কোনো কষ্ট হবে না?"

"না।"

"বেশ, তা'হলে এমাসের মধ্যেই হয়ে যাক—।"

"ঈভা!" অরুণ লাফিয়ে উঠলো।

"অতো উত্তেজিত হয়ো না," ঈভা বললে, "কয়েকটি খুব বৈষয়িক কথা শোনো। আমার রোজগার আমি মা-বাবার কাছে পাঠাবো। আমি ছাড়া ওঁদের দেখবার তো কেউ আর নেই।"

"নিশ্চয়ই!" অরুণ বললো, "আর আমার রোজগারে সংসারে চলবে—।"

"না, তাও হবে না," ঈভা হাত নেড়ে থামালো অরুণকে, "আমারও একটা খরচা আছে। হস্টেলে আমি থাকা-খাওয়ার জন্যে যে টাকাটা দিই, সেটা দিয়ে দেবো তোমার হাতে।"

"সে কি করে হয়—!"

"রাত হয়ে এলো। চলো এবার উঠি," বললো ঈভা বারওয়েল।

তারপরদিন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে অরুণ এলো ঈভা বারওয়েলের হস্টেলে। ওকে নিয়ে সিনেমায় যাওয়ার কথা।

ঈভা এলো। গেল সিনেমায়।

কিন্তু কি রকম যেন একটু বিষণ্ণ মুখ ঈভার।

সিনেমার হলের অন্ধকারে ঈভা বললো।

আজ তার চাকরি গেছে।

বাজার খারাপ। অফিস ছোটো হয়ে যাচ্ছে। তাকে আজ হঠাৎ নোটিসের বদলে এক মাসের মাইনে দিয়ে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

"তাতে কি? অরুণ সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলো। "আমি তো আছি।

"না, অরুণ। আরেকটি কাজ পাওয়ার আগে আমি বিয়ে করতে

পারবো না। মা-বাবাকে খাওয়াতে হবে তো! তোমার টাকা আমি নিতে পারি, কিন্তু তোমার টাকা আমি মা-বাবার কাছে পাঠাতে পারবো না।"

সেদিন থেকে স্থুরু হোলো ঈভা বারওয়েলের চাকরি খোঁজা।

কিন্তু আগের সুদিন আর নেই। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের চাকরি পাওয়া খুব শক্ত। স্টেনো, টেলিফোন অপারেটার, রিসেপশানিস্ট, নার্স—সব চাকরিতেই আজ দলে দলে বাঙালী মেয়ে এসে ভিড় করছে। তাদের কলেজী শিক্ষার ছাপ আছে, তার উপর চাকরির প্রয়োজনের তাগিদে বসন-ভূষণ-প্রসাধনেও তারা পাল্লা দিচ্ছে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে। তারাও স্মার্ট, তার উপর তাদের মাইনের প্রত্যাশাটা কম।

এদিক ওদিক আবেদন করলো ঈভা বারওয়েল,—কোনো কাজ হোলো না। কয়েক জায়গায় দেখা করলো, তারা নিবেদন করলো তাদের অক্ষমতা। অরুণ নিজেও উঠে পড়ে লাগলো ঈভাকে চাকরি যোগাড় করে দিতে। চেনাজানা যতো অফিস আছে, সব অফিসে খোঁজ করতে লাগলো। কিন্তু বাজার খারাপ। সবারই একই হাল।

কেটে গেল মে, জুন, জুলাই—কেটে গেল অগাস্ট।

অগাস্ট পেরিয়ে সেপ্টেম্বর এলো—কিন্তু বর্ষাটা কেটে যায়নি তখনো। মাঝখানে কয়েকদিন রোদ্দুর, তারপর আবার বৃষ্টি। আর কী বৃষ্টি! ঝিরঝির করে পড়ছে তো পড়ছেই। একবার আরম্ভ হলে আর থামতেই চায় না।

এমন সময় একদিন এলো একটি ইণ্টারভিউএর চিঠি।

তখন সেপ্টেম্বর প্রায় শেষ হয়ে আসছে।—আর খুব জোর বৃষ্টি কলকাতায়।

তিনদিন ধরে অঝোর সেই বৃষ্টি——পড়ছে তো পড়ছে তো পড়ছেই। কখনো বা পাহাড়ী প্রপাতের মতো অদম্য উচ্ছ্বাসে তীক্ষ্ণস্বর মুষলধার

বর্ষণ, গাইয়ে মেয়ের তৈরী গলায় খাদ থেকে চড়ায় দ্রুত উঠে যাওয়া অলস তানের মতো, মিউজিক্-হল্এর অনুপ্রাণিত সোপ্রানোর উচ্চতম স্বরগ্রামে ফুসফুস-বিদীর্ণ ট্রেমলোর মতো। এধারে গাছের পাতার তরঙ্গে উদ্দাম সেতারিয়া হাওয়ার অবিরাম ঝঙ্কার দিয়ে যাওয়া, দূরের গাছগুলোর পত্রঘন শাখায় শাখায় উত্তাল ঝড়ের ভ্যাম্পিং।

কখনো বা অসংখ্য তীরের অবিশ্রাম ধারা, রূপালী-ধূসর জলের তীর, বেগম বাহার লেন্এর বাঁধানো পথে যেখানেই পড়ছে, সেখানেই সৃষ্টি করছে অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে ফোয়ারা। দমকা হাওয়ায় ঝনঝন করে ওঠে জানলার সাশি আর উন্মনা মন। দুরন্ত মেঘের কোলে দুরন্ততম মেঘ, আকাশের এপার থেকে ওপার। অসতর্ক মুহূর্তে চোখ ধাঁধিয়ে ঝলসে-ওঠা বিদ্যুতের নির্দয় চাবুক, ক্রন্দসীর এই দিগন্ত থেকে ওই দিগন্তে ছড়িয়ে। শ্রুতিবিদীর্ণ বাজ পড়ার প্রতিধ্বনির রেশ তাকের-উপর-তুলে-রাখা চায়ের কাপে, পিরিচে আর কাচের গেলাসে।

তারপর কখনো বা ক্রমশ মন্থর হয়ে এসে, মুদারা-সপ্তকের সুরের মতো নরম, বাংলা গানের সঞ্চারীর মতো নিঝুম, ব্যারিটোন্ রিমঝিম বৃষ্টি। এপাশে ওপাশে ক্লান্ত হাওয়ার হাত বুলিয়ে যাওয়া, বিপর্যস্ত গাছের উপর দিয়ে। তখন আস্তে আস্তে জানলা খুলে হয়তো চোখ দুটো মেলে দেওয়া যায় ইস্পাত-ধূসর আকাশে। একান্ত নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। যতোই ভাবনাগুলো মেঘে চাপিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া যায়, ততোই যেন আরো ঘন হয়ে আরো বেশী ভাবনা আসে সংবর্ত হয়ে—আর সঙ্গে করে নিয়ে আসে আরো বেশী অন্ধকার, আরো বেশী বৃষ্টি, আরো বেশী জাগর-ত্রিযামার প্রত্যাশা।

দুঃসহ ভাদরের অসহ্য গরম কয়েকটি গুমোট দিনের পর যেন প্রাণভরে শেষবর্ষণ নামলো।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সবাই।

কিন্তু বিমর্ষ হয়ে পড়লো ঈভা বারওয়েল।

হঠাৎ এ সময়ে বৃষ্টি সে চায়নি। উপস্থিত গরমটা একটু কমে গেলে আর বৃষ্টিটা আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করলেই সে খুশি হোতো।

কারণ চিঠি এসেছে এক মস্তো বড়ো মার্চেন্ট অফিস থেকে। অরুণের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঈভা বারওয়েল দরখাস্ত করেছিলো সেখানে। ওরা তাকে ইন্টারভিউএর জন্যে ডেকেছে।

আর এমন বৃষ্টি স্বরু হোলো যে বাড়ি থেকে বেরুনো যায় না।

তিনদিন আগে চিঠিটা যখন এলো তখন সকাল বেলা। বেশ ঠাণ্ডা আর সোনালী। রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠায় সে পড়ে ফেললো চিঠিখানি। তারপর জানলা দিয়ে তাকালো বাইরের দিকে, অনুভব করতে চাইলো গাছে গাছে সকালবেলার পাখীগুলি সত্যি সত্যি ডাকছে কিনা। তখন সবে ন'টা বেজেছে। বেগম বাহার লেন্‌এ তখন অফিসের বেলা। মোড়ের ট্রামস্টপের দিকে হনহনিয়ে চলেছে শুভ্র ট্রাউজারে স্মার্ট-দেখানো ছেলেরা আর রঙিন ছিটে আকর্ষণময় মেয়েরা।

তাহলে হয়তো আবার এদের মধ্যে ফিরে যাবো একদিন, এমনি করে ছুটবো অফিসের বেলা হলে, ভাবলো ঈভা বারওয়েল।

চার পাঁচ মাস ঈভার চাকরি নেই। হাতের জমানো টাকা সব ফুরিয়ে গেছে। মনে মোচড় দেওয়া চিঠির পর চিঠি আসছে খড়গপুরে ওর মা-বাবার কাছ থেকে। বছর চারেক আগে ওর ভাই যক্ষায় মারা যাওয়ার পর ঈভাই ওদের একমাত্র ভরসা। এ চাকরিটা যেমন করেই হোক তাকে পেতে হবে।

মে-মাসের সেই দিনটির কথা ঈভার মনে পড়লো, যেদিন তার চাকরি গেল। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা অরুণ তাকে জিজ্ঞেস করছিলো সে ওকে বিয়ে করবে কিনা। চোখ ছলছলিয়ে রাজী হয়েছিলো সে। ঘুম আসেনি সেদিন রাত্তিরে। আকাশে ঝিলমিল করছিলো তারাগুলো আর ঈভা ভাবছিলো একটি ছোট্টো সুখের সংসারের কথা যেটি সে আর অরুণ মিলে

পাভবে পার্কসার্কাসের এক গলির ভিতর এক পুরোনো বাড়ির দোতলায় অরুণের একখানি ঘরের সেই ফ্ল্যাটে।

তারপরদিন অফিসে গিয়েই পেলো চাকরি যাওয়ার চিঠি।

আজো মনে পড়লে ঈভার গলায় কি যেন আটকে আসে, মনে পড়ে অরুণের ফ্যাকাশে হাসি। যে আশার স্বপ্ন ভাঙলো, সেটা তাদের তুজনেরই। অরুণের একলার আয়ে তাদের বিয়ে করা অসম্ভব।

দিনের উপর দিন জমে উঠলো, মাসের পেছনে মাস গড়িয়ে গেল, টাকা চেয়ে আর অভাব জানিয়ে চিঠির পর চিঠি এলো খড়গপুর থেকে, আর সব সময় নানারকম অপ্রীতিকর কথা শোনাতে লাগলো হস্‌টেলের পরিচালিকা। মনে হোলো, চলতি জীবনের যতো রং সবই যেন একচেটিয়া করে নিয়েছে হস্‌টেলের অন্যান্য মেয়েরা, যাদের চাকরি আছে কিংবা যাদের চাকরি করবার প্রয়োজন নেই। নিজের বন্ধুমহল থেকে ঈভা বারওয়েল খসে পড়লো আর দিন কাটাতে লাগলো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে পাঠানো আবেদনগুলির উত্তরের ব্যর্থ প্রতীক্ষায়।

চারমাস কেটে গেল।

তারপর হঠাৎ ডাক এলো এই অফিস থেকে। অরুণ চাকরি করে সেখানে, ওর কাছেই কাজ খালি হওয়ার খবরটা ঈভা পেয়েছিলো। অরুণ বলেও রেখেছিলো অফিসের পারসোন্নেল ম্যানেজারকে। মনে হচ্ছে যেন হয়ে যাবে চাকরিটা।

মোটে তিনদিন পরে ইণ্টারভিউ।

•

প্রথমদিন বেশ গরম পড়েছিলো অন্যান্য দিনের মতো। কিন্তু বিকেল না হতেই জমজমিয়ে মনসুনের মেঘ করলো আকাশে। বৃষ্টি যখন সুরু হোলো তখন বিকেলটা অন্ধকার ঝোড়ো সন্ধ্যায় গড়িয়ে গেছে। রাস্তার আলোগুলো মিট মিট করছে ঝাপসা বৃষ্টির ভেতর দিয়ে। ভেজা রাস্তায় তু'পাশে জল ছিটিয়ে চলে যাওয়া ট্র্যাফিকের অস্ফুট আওয়াজ এলো দূর

ওয়েলেস্‌লি থেকে, আর ভেসে এলো নেস্‌বিট্‌দের বাড়ির রেডিওর মৃদু যন্ত্রসঙ্গীতের সুর। খোলা জানলা দিয়ে জলের ঝাপটা এলো ঘরের ভিতর।

ঈভা জানলা বন্ধ করলো না। তার মন তখন খুশিতে ভরে আছে। অনেক দিনের দুঃসহ গরমের পর বৃষ্টি নেমেছে, আর এদ্দিন পর আবার স্বপ্ন দেখবার অবকাশ এসেছে তার জীবনে। এমন দিনে কে বন্ধ করে ঘরের জানলা!

সেদিনের রাত খুব ঝোড়ো রাত। ঈভার ঘুম ভেঙে গেল বার বার। নিঃসহায় রাত্রির বুকে বাজ পড়লো ঘন ঘন, আর যতো বারই ঘুম ভাঙলো ততোবারই মনে পড়লো অরুণের কথা। আজ রাতে সেও কি জেগে আছে? সে বলছিলো তার ঘরে ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে। বেচারা! এখন হয়তো বিছানাটি টেনে নিচ্ছে ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণে। আমি ওর সঙ্গে থাকলে ওকে নিশ্চয়ই সব কিছু একা করতে দিতাম না, ডলি ভাবলো।

তারপরদিন সকালেও বৃষ্টি থামলো না।

ঈভার তখনো খুব খুশী খুশী মন। বৃষ্টি কার না ভালো লাগে——নেহাত অফিসে যেতে না হলে। বৃষ্টি এমন ভালো লাগার সুযোগ চাকরি পাওয়ার পর তো আর আসবে না। সারাদিন সে তার ময়লা জামা, বিছানার চাদর বালিসের ওয়াড়গুলো ধুয়ে, ঘর সাফ করে, এটা ওটা সেটা গুছিয়ে কাটিয়ে দিলো।

কিন্তু সন্ধ্যের দিকেও যখন বৃষ্টি কমবার লক্ষণ দেখা গেল না, ঈভা মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো।——যদি কালও এমনি ধারা ঝড় বৃষ্টি হয়? না, না, সে যেন না হয়, ঈভা ভাবলো, কাল যে ইণ্টারভিউ!

রাত বাড়তে বাড়তে ঝড়ের পাগলামি বেড়ে উঠলো। অশান্ত তুফান বয়ে গেল গাছের উপর দিয়ে। রাস্তার ওপারে মার্টিনডেল্‌দের ছোট্টো মেয়েটি তার দৈনন্দিন রেওয়াজ করে গেল পিয়ানোয়। হস্টেলের দারোয়ান নিউমার্কেটের ওদিক থেকে পরটা কাবাব নিয়ে এলো পাশের রুমের মিস্ পেরিনের জন্যে। হস্টেলের অন্য মেয়েরা এসে জড়ো হোলো তার ঘরে আর

তাদের সোরগোল ছাপিয়ে উঠলো হস্‌টেলের পাশের গ্যারাজের টিনের চালের উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দকে।

ঈভা তার ঘরে একা বসে রইলো আলো না জ্বালিয়ে। অন্ধকারে বসে বসে ভাবলো আগামী কালের ইণ্টারভিউএর কথা, খড়গপুরে তার মা-বাবার কথা, ছেলেবেলায় স্কুলের দিনগুলোর ছুটোছুটি দাপাদাপির কথা,—— আর অরুণের কথা।

তারপরদিন সকাল হোলো পরিষ্কার দিনের আভাস নিয়ে। বেগম বাহার লেনের মোড়ে তখনো এক হাঁটু জল। কিন্তু হাল্কা রোদ্দুরের রুপালী আলো উঁকি মারলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। হয়তো রাস্তার জল শুকিয়ে যাবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। বেলা বাড়তে না বাড়তে চায়ের পাট চুকিয়ে সার্টিফিকেট টেস্‌টিমোনিয়্যালগুলো খুঁজে পেতে বা'র করে রাখলো, আর মনে মনে ইণ্টারভিউএর রিহার্স্যাল দিয়ে নিলো।

কিন্তু সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই আবার আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, আবার সুরু হোলো বৃষ্টি। কন্‌ভেণ্টের বাস্‌ এসে গলিতে ঢুকতে পারলো না জলের জন্যে। মোড় থেকে হর্নের সাড়া দিলো। এ বাড়ি ও বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে খুকীরা তাদের জুতো হাতে করে পাতিহাঁসের বাচ্চার মতো সপসপিয়ে চলে গেল জলের ভেতর দিয়ে, সোরগোল করে উঠে পড়লো স্কুলের বাসে, যার জানলায় আরো অনেক কচি কচি মুখ উঁকি দিচ্ছে। হস্‌টেলের দারোয়ান বার বার গিয়ে রিকশ আর ট্যাক্সি ডেকে আনলো হস্‌টেলের যে সব মেয়ের অফিস আছে তাদের জন্যে।

আর ঈভা অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগলো ঘরের ভিতর। যদি বৃষ্টি না থামে? তার রেন্‌-কোট নেই। গত বর্ষার পর পুরোনোটা এক গরীব স্ত্রীলোককে দান করেছে এ বছর নতুন কিনবে বলে। বর্ষার মুখে চাকরি চলে যাওয়ায় আর কেনা হয়নি। ছাতাটা হারিয়ে গেছে দিন পোনেরো আগে। তা'ও আর কেনা হয়ে ওঠে নি। ভেবেছিলো বর্ষা চলে

যাচ্ছে, এ ক'টা দিন এমনিই কাটিয়ে দেওয়া যাবে। এখন এই বৃষ্টির দিনে কে তাকে ছাতা ধার দেবে! হস্টেলের প্রায় সব মেয়েকেই যেতে হবে নানা জায়গায়। আর ঈভার ট্যাক্সি করবার ক্ষমতা নেই। ব্যাগে মোটে এক টাকার কিছু কম খুচরো তার সম্বল। অরুণের কাছ থেকে কিছু ধার করে নিলেই হোতো—কিন্তু তারও দেখা নেই এ দুদিন। এখানে আর কে-ই বা ধার দেবে তাকে? যেহেতু তার চাকরি নেই, কেউ ধার দেবে না। জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈভা নিষ্ফল আক্রোশে ঘরের মেঝেতে পা' ঠুকলো।

বেলা দুটোর পর ইণ্টারভিউ।

বারোটা বাজতে না বাজতেই বৃষ্টি আরো প্রবল হয়ে নামলো। সময়মতো বৃষ্টি থামবার আশা ছেড়ে দিলো, ব্যাকুল হয়ে উঠলো ঈভা বারওয়েল। ট্যাক্সির পয়সা যোগাড় করতেই হবে যেমন করেই হোক।

হস্টেলে দু'চারজন কলেজের ছাত্রী থাকতো যারা সেদিন বেরোয় নি। তাদের একজন সীমা বোনার, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মা আর বাঙালী বাঁড়ুজ্যে বাপের মেয়ে। ঈভা তার কাছে গিয়ে ধার চাইলো তিন টাকা।

"তিন টাকা? আজ সকালে বলোনি কেন," সীমা বললো, "আমার কাছে সকালবেলা গোটা পঁচিশেক টাকা ছিলো। সব সরোজিনী মেননকে দিয়ে ফেলেছি। ও বেরোচ্ছে ওর বন্ধু সেই খোশলা ছেলেটির সঙ্গে। সে নাকি রোববার বিলেত চলে যাচ্ছে। বেচারী সরোর সঙ্গে পয়সাকড়ি কিছুই ছিলো না।"

ঈভা গেল সরোজিনী মেননের কাছে। সে মেয়েটি তাকে বাধিত করবার চেষ্টা করলো, যদিও টাকাগুলো সবই নাকি তার দরকার। খোশলা বিলেত চলে যাবে। আজ আসছে তাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে এবং চা খাওয়াতে। কবে ফিরবে তার ঠিক নেই, সুতরাং ওকে তো একটা কিছু উপহার কিনে দিতে হবে। সরো একটি দশ টাকার নোট বার করলো।

ঈভার মুখ ঝলমল করে উঠলো।

"এটা ভাঙিয়ে এনে দাও," বললো সরো, "তিন টাকা তুমি রেখে বাকিটা আমায় এখনই এনে দাও। খোশলা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।"

ঈভার মুখ ম্লান হয়ে গেল।

টাকাটা সে ভাঙাতে পারলো না কিছুতেই। হস্‌টেলের কারো কাছেই দশ টাকার ভাঙতি নেই। দারোয়ান এই বৃষ্টিতে কিছুতেই টাকা ভাঙানোর জন্যে বাইরে যেতে চাইলো না। ঈভা ওকে টিপ্‌স্‌ বখশীশ কিছুই দেয়নি কয়েক মাস।

যেই কজন মেয়ে হস্‌টলে তখন ছিলো, ঈভা তাদের প্রত্যেকের কাছেই গেল, কিন্তু কারো কাছেই ধার দেওয়ার মতো টাকা নেই। মিনি বারুচা 'অন্‌ প্রিন্সিপ্‌ল্‌' কাউকে টাকা ধার দেয় না। বাব্‌লি জামানের কাছে আছে শুধু একখানি একশো টাকার নোট। ঊষা চালিহা মনে করিয়ে দিলো যে তার আগের ধার এখনে মিটিয়ে দেওয়া হয়নি। কিটি সিং রীতিমতো বিরক্তই হোলো তার ঘুম পেয়ে যাওয়ার মাঝখানে ঈভা এসে ঘরের দরজায় টোকা দেওয়ায়—এবং সেই বিরক্তি একটু রূঢ় ভাবেই প্রকাশ করলো। কেউ একটি ছাতা বা একটি রেন্‌-কোটও দিতে পারলো না। হয়তো বা কেউ আগেই চেয়ে নিয়ে গেছে, কিংবা হয়তো কাউকে বিকেলে বেরুতে হবে, দেওয়া চলবে না।

আরো বিমর্ষ হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো ঈভা বারওয়েল। ঘড়িতে তখন একটা বেজে পোনেরো।

জানলাটা খুলে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো, চুপচাপ দেখলো বাইরের বর্ষণ। বেগম বাহার লেন তখন নিস্তব্ধ, নিথর। আর আকাশ থেকে জরির ঝালরের মত বৃষ্টি। আকাশ ঘন গুমোট, আবহাওয়া অত্যন্ত বিচ্ছিরি, বাতাস বড়ো উদ্দাম, রাস্তায় কাদা আর জল, ডাস্টবিনের পাশে প্রচুর ভেজা আবর্জনা জড়ো। একটি বাড়ির সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে এক ভিখারী মেয়ে এক হাতে তার বাচ্চাকে চেপে ধরে অন্য হাতে ছেঁড়া কাপড় থেকে জল নিংড়োচ্ছে। একটি গ্যারাজের ভিতর একটি নিরুপায় অবোধ ভালোমানুষ

বেড়াল আটকে গেছে বৃষ্টিতে, নেস্‌বিটদের ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে তাদের কুকুরটা ভীষণ চ্যাঁচাচ্ছে তাকে দেখে। এক আলুকাবলিওয়ালা এসে আশ্রয় নিয়েছে হস্‌টেলের গাড়ি-বারান্দায়। চার পাঁচজন মেয়ের ভিড়ে তার ব্যবসা খুব জমে উঠেছে এমন ঘনঘোর বর্ষায়।

একটি মস্তো বড়ো গাড়ি এসে থামলো হস্‌টেলের সামনে। গাড়ি থেকে নামলো একটি ফিটফাট ছেলে।

ঈভা ছুটে গেল সরোজিনী মেননের ঘরে।

"সরো," ঈভা জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বন্ধু খোশলাকে আমায় একটু ডেলহাউসি স্কোয়ারে পৌঁছে দিতে বললে কি কিছু মনে করবে?"

"আমরা তো ও পথে যাচ্ছি না." সরোজিনী মেনন ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষতে ঘষতে বললো, "অবশ্যি তা'হলেও না হয় পৌঁছে তোমায় দিতাম, কিন্তু কে যেন বলছিলো ওদিকে খুব জল।"

ঈভা তার ঘরে ফিরে এলো। জল এলো চোখ ফেটে, নিজেকে সামলে নিলো কোনো রকমে। যাক, তা' হলে আর যাওয়া গেল না আজকের ইন্টারভিউতে, সে ভাবলো, আর চাকরিও আর হোলো না।

ঘড়িতে দেড়টা প্রায় বাজে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলো সে। ভাবতে চাইলো না তার বুড়ো মা-বাপের কথা. যাদের চিঠি এখনো খোলা পড়ে আছে সামনের টেবিলে। কখন বৃষ্টি ঝিমিয়ে এলো সে শুনতে পেলো না।——মিনিট পাঁচ-সাত পর একবার মুখ তুলে দেখে, একি, বৃষ্টি যে থেমে গেছে! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে লাফিয়ে উঠলো, স্কার্টখানি তুলে নিলো বিছানার উপর থেকে।

তারপর মিনিট দশেকের মধ্যেই রাস্তায়। স্টপে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ট্রাম পেয়ে গেল।

সারাটা পথ সে ট্রামে বসে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে।

বৃষ্টি নেই,——কিন্তু ভ্রূকুটি-কুটিল মেঘে মেঘে আকাশ আস্তে আস্তে আরো অন্ধকার হয়ে আসছে। ঈভার স্নায়ুগুলো টান্ হয়ে উঠলো। সীটের

উপর ছটফট করতে লাগলো সে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে গন্তব্যস্থলে।

এক যুগ দীর্ঘ মনে হোলো এস্‌প্লানেডের ট্র্যাফিক সিগ্‌ন্যাল। ট্রামখানি আস্তে আস্তে বাঁক ফিরলো গভর্নমেণ্ট প্লেসে। আরো দুটো স্টপ্‌। বৃষ্টি নামেনি এখনো। শেষ স্টপ্‌। ঈভা ট্রাম থেকে লাফিয়ে নামলো। একটা ট্যাক্সি ছুটে এলো। ঈভা সরে দাঁড়ালো তার পথ ছেড়ে। তারপর রাস্তা পার হতে এক পা বাড়ালো।

আর তক্ষুনি চারদিক কাঁপিয়ে কানে তালা ধরিয়ে বাজ পড়লো কোথায় যেন। একটা দমকা ঝড় ছুটে এলো পথ বেয়ে আর প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো ঈভা বারওয়েলকে। ঈভার স্কার্ট অসংযত হয়ে উঠতেই, তাড়াতাড়ি সামলে নিতে গেল সে। তারপর এগুতে গিয়েই আচমকা বৃষ্টিতে আটকে গেল। দু'সেকেণ্ড দুটোতিনটে বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা, আর তারপরই দিগন্তব্যাপ্ত উন্মত্ত জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি।

ঈভা ছুটে ফিরে গেল পেছনদিকের ফুটপাথে একটি গাড়িবারান্দার নিচে। তার জামা স্কার্ট সব ভিজে গেছে এরই মধ্যে।

সেখানে সে দাঁড়িয়ে রইলো পাথর হয়ে। কাছেই একটি দোকানের সামনের বড়ো ঘড়িতে দুটো বাজলো। রাস্তা জুড়ে অঝোর ঝাপসা বৃষ্টি। রাস্তার ওপারের একটি বিল্ডিংএ সেই অফিস, যেখানে তার ইণ্টারভিউ,— আর যেখানে চাকরি করে অরুণ বোস।

ঈভা নিঃসহায় দৃষ্টি সম্পাত করলো চারদিকে। পথে রিকশ নেই, ট্যাক্সি নেই, কিচ্ছু নেই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত ট্র্যাফিক, সমস্ত যানবাহন চলাচল, অন্তর্ধান করেছে প্রশস্ত রাজপথ থেকে। চারদিক শুধু ঝাপসা, নিথর শীতের কুয়াশার মতো, আর জল ঝড় বিদ্যুত মেঘগর্জনে মিলে উন্মত্ত তাণ্ডব ঐকতান।

ঈভা বারওয়েল নিথর সহায়হারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তার এপারে গাড়িবারান্দার নিচে। রাস্তার ওপারে তার ভবিষ্যত——মাঝখানে জল ঝড় তুফান।

......"এদিকে সরে এসো। তুমি ভিজে যাচ্ছো," কে যেন বললো পেছন থেকে।

ঈভা আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। বেশ ফিটফাট স্যুট-পরা মাথার চুল প্রায় সাদা হয়ে আসা একজন বয়স্ক ইংরেজ ভদ্রলোক।

"তুমি ভিজে যাচ্ছো," সে বললো।

"ভিজে গেলামই বা, কী আসে যায় তাতে," ঈভা হতাশ গলায় বললো। বললো নিজের মনেই, ভেজা ভেজা গলায় বললো, "আর লাভ নেই।"

একটু কৌতূহল নিয়ে ইংরেজ ভদ্রলোকটি তাকালো তার দিকে। "কিসে লাভ নেই," সে জিজ্ঞেস করলো।

"জলে না ভিজে আর কী লাভ," বললো ঈভা বারওয়েল। তখন তার চোখ সেদিনের আকাশের মতো মেঘলা।

"সে কথা কেন ভাবছো?"

"পথটা এখন আর পেরোতে পারছি না।"

"সে তো আমিও পারছি না।"

"কিন্তু পেরোনো আমার খুবই দরকার ছিলো।"

কেন, জিজ্ঞেস করেনা কোনো মার্জিত ইংরেজ। তবে প্রশ্নটা চোখে ফুটিয়ে দেয়।

সে শুধু বললো, "সে জন্যে ভেবো না। মিনিট পোনেরোর মধ্যেই বৃষ্টি থেমে যাবে। অফিসের দেরী হবে বুঝি? এমন বৃষ্টি, আমার মনে হয় না যে তোমার কেউ কিছু বলবে। তোমার অফিস কি খুব কাছেই?"

অন্য সময় হলে ঈভা শুধু বলতো, "না।" কিন্তু এখন মন তার খুব অবশ। বললো, "না, আমার অফিস কাছে দূরে কোথাও নয়। আমি কাজ করি না কোথাও। ওই যে অফিসটি দেখছো, আজ ওখানে আমায় ইণ্টারভিউতে ডেকেছে। দুটোয় ইণ্টারভিউ ছিলো।"

"জীবনটা এরকমই," সেই বয়স্ক ভদ্রলোকটি একটুখানি সহানুভূতির হাসি হেসে বললো, "অনেক বছর আগে আমি যখন প্রথম কাজের জন্যে এক

জায়গায় দেখা করতে যাচ্ছিলাম, তখন অফিসের লিফ্‌ট মাঝপথে আটকে গেল। সে কাজ আমার হয় নি। তখন খুব মনে লেগেছিলো। তবে আজ এত বছর পর আমার আক্ষেপ করার কিছু নেই।"

ঈভা তাকিয়ে দেখলো সেই ভদ্রলোকের দিকে। নিজের বাবার কথা মনে পড়লো। নিজেকে খুব দুর্বল, খুব নিরুপায় মনে হোলো। ছেলেবেলায় হলে বাবা হয়তো কোলে তুলে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বলতো,—না, না, লক্ষ্মী মেয়ে, এটুকুতেই কাঁদে না।

প্রকৃতির দুর্যোগময় প্রকাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষে মানুষে সহজ হয়ে ওঠে সহজেই। ঈভা আর সেই অপরিচিত প্রবীণ ইংরেজ ভদ্রলোকটি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলো সেই গাড়ি বারান্দার নিচে, যখন তুফান বয়ে চললো নির্জন রাজপথের উপর দিয়ে, আর তারই মধ্যে সেই ভদ্রলোকটি একটু একটু করে জেনে গেল ঈভার কথা, তার নাম, আর জেনে গেল যে সেই অফিসে চাকরি করে একটি 'ইণ্ডিয়ান্' ছেলে, অরুণ, ঈভার ফ্রেণ্ড্।

বৃষ্টি যখন থামলো তখন তিনটে বেজে দশ। ঈভা বললো, এখন আর ওখানে গিয়ে কোনো লাভ নেই, আমি হস্টেলেই ফিরবো। তখন ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। ট্রামগুলো সার বেঁধে খড়খড়ি বন্ধ করে রাস্তায় জলের মধ্যে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাসে অসম্ভব ভিড়। ইংরেজ ভদ্রলোকটি একটি ট্যাক্সি ডেকে ঈভাকে সঙ্গে করে বেগম বাহার লেনে তার হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে এলো।

ও চলে যাওয়ার সময় সামান্য দু'একটি সৌজন্যের কথা ছাড়া আর কিছুই বললো না। চলে যাওয়ার পর ঈভার মন একটু বিষণ্ণ হোলো তার ক্ষণিকের এই বন্ধুর জন্যে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে এত দুর্বল এত পরিশ্রান্ত বোধ করলো তার ব্যর্থতার হতাশায় যে আর কাপড় ছাড়লো না, সোজা লম্বা হয়ে জুতো শুদ্ধ শুয়ে পড়লো বিছানার উপর।

বাইরে তখন আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে।

কতক্ষণ কেটে গেল তার খেয়াল নেই। হুঁস হোলো যখন দারোয়ান এসে দরজায় টোকা দিলো। ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে ঘড়িতে সাতটা—আর নিকষ অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক।

অরুণ অপেক্ষা করছিলো নিচে অভ্যাগতদের ঘরে।

"অরুণ," ঈভা সহজ ভাবেই বললো, "আমি যেতে পারলাম না।"

"হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছিলো," অরুণ বললো তার নিজের হতাশা চাপবার চেষ্টা করে, বললো আরো সহজ ভাবেই যেন এমন কিছু ক্ষতি হয়নি, জানতে দিতে চাইলো না যে তার নিজের হতাশা ঈভার হতাশার চাইতে কম নয়, হয়তো বা কিছু বেশীই। বললো, "এমন নাস্‌টি ওয়েদার! যাক্, তার জন্যে আর ভেবো না, ডালিং, আবার একটা না একটা সুযোগ এসে পড়বেই।"

"অন্য মেয়েরা গিয়েছিলো?" ঈভা জিজ্ঞেস করলো।

"প্রায় প্রত্যেকেই এসেছিলো, শুধু দু'তিনজন বাদে। তবে তুমি এলেও এমন কিছু লাভ হোতো না, কারণ দেখলাম ওদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আর কোয়ালিফিকেশানই তোমার চাইতে বেশী। বেশীর ভাগ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, কয়েকজন গ্র্যাজুয়েট বাঙালী মেয়েও ছিলো। তাদের মধ্যে একজন আবার ইংরেজিতে এম-এ। কে জানে এরাও কেন স্টেনো হতে চায়। একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের স্পীড একশো পঁচাত্তর আর পঁয়ষট্টি। তোমার চান্স পাওয়া মুশকিল হতো। না গিয়ে ভালোই করেছো।"

ওদের মধ্যে কয়েকজনকে ঈভা চিনতো। জিজ্ঞেস করলো, "কে পেলো চাকরিটা?"

"ওদের মধ্যে কেউই পায়নি," অরুণ উত্তর দিলো। "ইণ্টারভিউ আজ হয়নি।"

"কেন," ঈভা জিজ্ঞেস করলো। দ্রুত হয়ে উঠলো তার বুকের স্পন্দন। আবার ইণ্টারভিউ হলে তাকে কি ফিরে ডাকবে না?

অরুণ বলে চললো,, "যে ডিরেক্টার ইণ্টারভিউ নিতো, সে লাঞ্চের পর

অফিসে ফিরতে পারেনি। গভর্নমেন্ট হাউসের কাছে ওর গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। সেটি ওখানে ড্রাইভারের জিম্মায় রেখে ওইটুকু পথ হেঁটে আসতে গিয়ে বৃষ্টিতে আটকে পড়লো। অফিসে ওরা বলাবলি করছিলো যে অফিসের সামনে রাস্তার ওপাশে একটি গাড়ি বারান্দার নিচে সে আটকে গিয়েছিলো। সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলো আরেকটি মেয়ে, সেও ইণ্টারভিউ দিতে আসছিলো এই অফিসে। ডিরেক্টার সেই মেয়েটির ইণ্টারভিউ সেই গাড়ি বারান্দার নিচেই নিলো, আর তাকে ওর এত ভালো লাগলো যে বৃষ্টি থামলে পরে তাকে নিজে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলো। অফিসে ফিরে এসেই সঙ্গে সঙ্গে এপইণ্টমেণ্টলেটার টাইপ করিয়ে নিয়ে সেটা সই করে তক্ষুনি ডাকে পাঠিয়ে দিলো।——যাক, এ নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই ঈভা, অন্য কোথাও একটা না একটা কিছু হয়ে যাবেই।"

ঈভা তখন ওদিকে ফিরে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলো। নিঝুম বেগম বাহার লেনে তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, খুব মিষ্টি বাজনার মতো বৃষ্টি। গাছের পাতার ভেতর দিয়ে ঝিরঝিরিয়ে-আসা বাদলা হাওয়া তখন খেলা করছে জানলার পর্দা নিয়ে, ঈভার অলকগুচ্ছ নিয়ে। পেণ্ডেলবারি ম্যানশান্স্‌এর ছাদের ওপারে দূরান্ত আকাশের বুকে ম্লান বিজলী উঁকি মেরে এদের দেখে যাচ্ছে বার বার। বাইরে নরম, মিষ্টি, সুরেলা বৃষ্টি, যার ঝাপসা পর্দার আড়ালে বড়ো মধুর, বড়ো আপন মনে হলো পথের আলো-ঝিলমিল বাদলা সন্ধ্যার কলকাতা।

ঈভা অরুণের দিকে ফিরে তাকালো। তার দুষ্টু কাজল চোখ দুটো হাসি হাসি। মুখে বৃষ্টির ছাট পড়ছে।

বাইরে বেগম বাহার লেনের রোমাঞ্চ-মধুর অন্ধকারে তখন রিমঝিম বৃষ্টি,—পড়ছে তো পড়ছে তো পড়ছেই।

—o—